নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কিরীটী অমনিবাস

13

কিরীটী অমনিবাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

ত্রয়োদশ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

ভূমিকা	সুবোধকুমার মজুমদার	[১]
আলোকে আঁধারে		১
নগরনটী		৯৯
রক্তের দাগ		১৭৭
ব্লু-প্রিন্ট		২১৯
রেশমী ফাঁস		২৫৫
পদ্মদহের পিশাচ		২৭১
পঞ্চমুখী হীরা		২৮২

আলোকে আঁধারে

॥ এক ॥

প্রস্তাবটা তুলেছিল সজলই প্রথমে যে, একটা দিন সকলে মিলে বটানিকসে গিয়ে হৈ চৈ করে কাটানো যাক।

এবং প্রস্তাবটা তুলেছিল সে মিত্রানীর কাছে এসে তার বাড়িতে এক সকালে। বেলা তখন নয়টা সোয়া নয়টা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারই সেই আনন্দ উৎসবে যোগ দেওয়া হয়ে ওঠেনি। ছুটি না শেষ হতেই তাকে চলে যেতে হয়েছিল। বৎসর তিনেক হবে প্রায় সজল কলকাতায় ছিল না। সেকেন্ড ডিভিশনে হায়ার সেকেন্ডারি পাস, তারপর বি. কম.-এ কোনমতে পাস করে যখন সে নিজেও স্থির করতে পারছে না অতঃ কিম্, কোন্ লাইনে, কোন্ পথে পা বাড়াবে, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব নানা জনে নানা পরামর্শ দিচ্ছে, সজল সকলের অজ্ঞাতেই এবং নেহাতই একটা খেয়ালের বশে কমপিটিটিভ পরীক্ষায় বসে গিয়েছিল—পাস সে করবেই না জানত।

সাধারণ মিডিওকার ছাত্র সে—কিন্তু রেজাল্ট বেরুলে আশ্চর্য, দেখা গেল প্রতিযোগিতার পরীক্ষাতে প্লেস একটা সে নীচের দিক হলেও পেয়ে গিয়েছে। এবং তারই জোরে একটা চাকরি তার আজকালকার দিনে লোভনীয়ই বলতে হবে পেয়ে গেল। বন্ধু-বান্ধবেরা তো বটেই, আত্মীয় ও পরিচিতজনেরা ওর এই হঠাৎ সাকসেসে বেশ একটু যেন আশ্চর্যই হয়েছিল। প্রথমে দিল্লীতে ট্রেনিং, তারপর বৎসরখানেক এদিক ওদিক হাতেকলমে ট্রেনিং শেষ করে একদিন সে নর্থ বেঙ্গলে পোস্টেড হলো বোধ হয় কিছুদিনের জন্যই। এবং ঐ পোস্টিংয়ের খবরটা তার পরিচিত বন্ধুমহলে সকলেই পেয়েছিল।

মিত্রানী সেদিন সকালে কলেজে বেরুবে বলে উঠি-উঠি করছে—হঠাৎ সজল এসে ঘরে ঢুকল। পরনে দামী সুট্, বড়লোক বা অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে না হলেও পোশাকে-আশাকে বরাবরই সে কিছুটা শৌখীন ও ফিটফাট ছিল। কিন্তু আজকের বেশভূষা ও শৌখীনতার মধ্যে একটু বিশেষত্বই ছিল বুঝি সজলের। দেখতে সজল কালোর উপর মোটামুটি মন্দ নয়, সুগঠিত পৌরুষোচিত দেহ। বেশ লম্বা।

হ্যালো মিত্রানী—

আরে আরে কী আশ্চর্য, সজল তুমি। উচ্ছল আনন্দে মিত্রানী বলে ওঠে।

হাসতে হাসতে আরো দু'পা এগিয়ে এসে সজল বললে, হ্যাঁ, সজলের প্রেত নয়—সজল চক্রবর্তীই—

হাসতে হাসতেই মিত্রানী জবাব দেয়, সে তো দেখতেই পাচ্ছি—শুনেছিলাম নর্থ বেঙ্গলের কোথায় কি একটা একজিকিউটিভ পোস্ট নিয়ে গিয়েছো—।

সজল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলে, আর বলো না—ঐ নামেই বড় পোস্ট—দিবারাত্র এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। তোমরা তো ভাবো কি জানি কি একটা হয়ে গিয়েছি, কিন্তু আসলে—

বোসো সজল, চা করে আনি। কতকটা যেন সজলকে থামিয়ে দিয়েই কথাটা বললে

মিত্রানী। কারণ মিত্রানী জানত, একবার শুরু করলে সজল থামবে না।

না না—সজল বললে।

সে কি—যখন-তখন আগের মত চা খাও না বুঝি আজকাল আর!

না।

তাহলে তোমার সেই থিওরি, সব সময়ই টি'র সময়—

জান না তো, সর্বক্ষণ কাজ নিয়ে কি ব্যস্ত থাকতে হয় আমায়—তাছাড়া বানিয়ে দেবে কে?

কেন, বানাবার কেউ নেই!

শ্রীমান বাহাদুর আছে বটে, তবে সে যা চা বা কফি বানায়—

তা এবার জীবনে যখন থিতু হয়ে বসেছো—তোমার কথায় চা-কফি বানাবার জন্য কাউকে একজনকে ঘরে নিয়ে এসো না। হাসতে হাসতে বললে মিত্রানী।

তার মানে বিয়ে তো। সজল বললে।

হ্যাঁ—তা ছাড়া আর কি?

কি জান, বিয়ে তখনি করা যায় মিত্রানী, যখন মনের মত কাউকে পাওয়া যায়। তাছাড়া তুমি তো জানো মিত্রানী, ওয়াইফ এবং কম্প্যানিয়ন আমি একই সঙ্গে চাই।

ওয়াইফই একদিন কম্প্যানিয়ন হয়ে ওঠে সজল। মিত্রানী হাসতে হাসতে বললে।

না। ওটা তোমার ভুল। সব সময় ঠিক তা হয় না। আর তখন নিজের হাত নিজে কামড়ানো ছাড়া আর উপায় থাকে না।

তা বাংলাদেশে কি মেয়ের অভাব আছে নাকি! খুঁজলে তুমি যেমনটি চাইছো তেমনি—

অত সময় বা ধৈর্য কোনটাই আমার নেই।

ঘড়িতে ঐ সময় নয়টা বাজতেই মিত্রানী চমকে ওঠে, উঃ বাবা, ন'টা—তুমি বোসো সজল, আমি চট্ করে স্নান করে তৈরী হয়ে নিই—

কেন? এত তাড়াহুড়ো কিসের?

আমি যে একটা কলেজে প্রফেসারী করছি কিছুদিন হলো—

সত্যি?

হ্যাঁ—এম. এ. পাস করে ডক্টরেটের জন্য তৈরী হতে হতে একটা পেয়ে গেলাম—তবে মাইনে সামান্যই—

আজকাল আর সে কথা বলো না মিত্রা, আজকাল শিক্ষক, অধ্যাপকদের মাইনে তো ভালই দেয় শুনেছি আমাদের দেশে—

তা অবিশ্যি দেয় তবে সেই সঙ্গে জীবনযাত্রার মানটাও মার্কারি কলমের মতো প্রত্যহ উর্ধ্বগতির দিকেই চলেছে—বোসো আমি আসছি—

না, না—আজকের দিনটা ড্রপ কর—নাই বা কলেজে গেলে আজ অধ্যাপিকা।

তা কি হয়, মেয়েরা ক্লাসে আমার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকবে—

একটা দিন না হয় বসেই রইলো, ডুব মেরে দাও আজকের দিনটা—কতদিন পরে এলাম! কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো বল তো, আমার অনারেই আজ না হয়

amarboi.net

কাজে ডুব দিলে—

তা হয় না সজল।

অথচ আমি শুধু তোমারই জন্য—

আমারই জন্য?

তাই, তোমারই জন্য এসেছি।

সত্যি বলছো?

বিশ্বাস তুমি যে করবে না তা আমি জানি মিত্রা, নচেৎ এতগুলো চিঠি লিখেছি অথচ একটারও জবাব দাওনি—

ডোন্ট টেল লাই সজল, তোমার প্রত্যেকটা চিঠিরই জবাব আমি দিয়েছি।

হ্যাঁ দিয়েছো, তবে আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি। যে জবাবটি পাওয়ার জন্য প্রতিদিন তোমার চিঠির প্রত্যাশায় থেকেছি—

মিত্রানী মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

আচ্ছা, তুমি কি সত্যিই আমার চিঠির অর্থ বুঝতে পারোনি?

পারবো না কেন! মিত্রানী মৃদু মৃদু হাসে মুখের দিকে চেয়ে।

তবে?

কি তবে?

জবাব দিলে না কেন আমার প্রশ্নের?

ওসব কথা থাক সজল।

না। মুখোমুখি প্রশ্নটা যখন উঠলোই—জবাব আমি চাই—

নাই বা দিলাম জবাব!

না, বল—

আচ্ছা সজল, আমরা কি পরস্পর পরস্পরের কাছে বরাবর বন্ধুর মতই থাকতে পারি না, যেমন আমরা অনেকেই অনেকের সঙ্গে আছি আজো—

আচ্ছা মিত্রা!

বল?

তুমি অন্য কাউকে—মানে অন্য কারোর বাগদত্তা?

না—সে রকম কিছু নয়, তবে—মানে ঐ পর্যায়ে এখনো পৌঁছায়নি ব্যাপারটা—

অর্থাৎ?

অর্থাৎ মন জানাজানির পালা এখনো চলছে। যাক গে ওসব কথা। তুমি একটু বোসো লক্ষ্মীটি, আমি স্নান সেরে তৈরী হয়ে নিই চট্ করে—

মিত্রানী লঘুপদে ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সজল একাকী ঘরের মধ্যে চেয়ারটার উপর বসে রইলো। মিত্রানীর শেষের কথাগুলো যেন অকস্মাৎ একটা ফুৎকারের মত ঘরের একটি মাত্র আলো নিভিয়ে দিয়ে গেল।

সব কিছুই যেন সজলের অকস্মাৎ শূন্য মিথ্যা মনে হয়, মিত্রানী ঘর থেকে বাথরুমে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। যে সন্দেহটা গত তিন বৎসর ধরে একটা ধোঁয়ার মতই তার মনের মধ্যে জমা হচ্ছিল, সেটা যেন গাঢ় কালো একটা মেঘের মত তার সমস্ত মনের মধ্যে

ছড়িয়ে পড়েছে এই মুহূর্তে।

সমস্ত সংশয় ও সন্দেহের যেন শেষ নিষ্পত্তি করে দিয়ে গেল মিত্রানী আর কত সহজেই না সেটা করে দিয়ে গেল।

আর কোন প্রশ্নেরই অবকাশ রইলো না কোথাও।

এত বছর ধরে যে আশাটা মনের মধ্যে সযত্নে সে লালন করেছে, নিজের মনে নিজেই স্বপ্ন দেখেছে, সব কিছুর উপর যেন একটা পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে গেল মিত্রানী সেই মুহূর্তে।

ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে স্নান করছে মিত্রানী, শাওয়ারের ঝিরঝির বারিপতনের সঙ্গে সঙ্গে একটা গানের সুর মিশে যাচ্ছে।

বহু পরিচিত গানটা সজলের। বহুবার সজল গানটা শুনেছে মিত্রানীর কণ্ঠে। প্রথম শুনেছিল তাদের কলেজেরই একটা ফাংশানে। মিত্রানী যে গান গাইতে জানে জানা ছিল না কথাটা সজলের। সেই প্রথম ফাংশানে শুনেছিল তার গান।

একা মোর গানের তরী
ভাসিয়েছিলাম নয়নজলে,
সহসা কে এলো গো
এ তরী বাইবে বলে।

ঐ গানের মধ্যে দিয়ে যেন সেদিন সজলের মিত্রানীর সঙ্গে নতুন করে পরিচয় ঘটে। তারপর কতবার অনুরোধ করে মিত্রানীকে দিয়ে গানটা ও গাইয়েছে।

কেন মোর প্রভাত বেলায়
এলে না গানের ভেলায়,
হলে না সুখের সাথী
এ জীবনের প্রথম খেলায়।

সজল বসেই থাকে। শাওয়ারের বারিপতনের ঝিরঝির শব্দ—তার সঙ্গে সুরের গুঞ্জন। যা জানবার ছিল—যা জানবার জন্য এত বছর ধরে সে প্রতীক্ষা করেছে তা তো তার জানা হয়ে গিয়েছে, তবে কেন এখনো সে বসে আছে!

কেন মিত্রানীর ঘরের দরজার সামনে ভিক্ষুকের মত হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে এখনো, অপেক্ষায়—

কিসের অপেক্ষা! আর কেনই বা এ অপেক্ষা!

এবারে তো তার চলে যাওয়াই উচিত।

মনে মনে চলে যাবার কথা ভাবলেও, কেন জানি সজল উঠতে পারল না।

ঐ সময় স্নান সেরে ভিজে চুলের রাশ পিঠের উপর এলিয়ে দিয়ে মিত্রানী বাথরুম থেকে বের হয়ে এলো।

প্রসন্ন স্নিগ্ধ-স্নানের পর মিত্রানীর দিক থেকে যেন চোখ ফেরাতে পারে না সজল, চেয়েই থাকে।

মিত্রানী মৃদু হেসে বললে, কি দেখছো সজল অমন করে আমার দিকে চেয়ে! মনে হচ্ছে যেন কখনো এর আগে তুমি আমাকে দেখনি—বলতে বলতে মৃদু হাসে মিত্রানী।

তেরচাভাবে টুলটার উপরে বসে মিত্রানী—সামনের ড্রেসিং টেবিলটার আয়নার দিকে

BanglaBook.org

তাকিয়ে চুলে চিরুনি চালাচ্ছে মিত্রানী।

মিত্রানীর গলাটা কি সুন্দর মনে হয় সজলের! কখনো ঐ গ্রীবা মিত্রানীর স্পর্শ করেনি বটে সজল কিন্তু মনে হচ্ছে পাখীর গ্রীবার মতই যেন নরম তুলতুলে ও কোমল।

তারপর চিরুনি চালাতে চালাতেই প্রশ্ন করল মিত্রানী, ক'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছো সজল?

এসেছিলাম তো দিন কুড়ি ছুটি নিয়ে—তবে ভাবছি দু'চার দিনের মধ্যে ফিরে যাবো।

কেন? সে কি—এত তাড়াতাড়ি ছুটি না শেষ করেই ফিরে যাবে কেন? না, না, এসেছো যখন, আমরা পুরানো বন্ধু-বান্ধবরা মিলে বেশ ক'টা দিন হৈ হৈ করে কাটানো যাবে। তা অন্যান্য সকলের সঙ্গে দেখা হয়েছে, ক্ষিতীশ অমিয় মণি বিদ্যুৎ সুহাস সতীন্দ্র পাপিয়া কাজল—

না—

দেখা হয়নি কারো সঙ্গে? কারো সঙ্গে দেখা করোনি?

না—আচ্ছা মিত্রানী, আমি উঠি আজ—

আরে বোসো বোসো—একসঙ্গেই যাবো—তুমি যাবে শ্যামবাজারের দিকে—আমারও তো কলেজ ঐদিকেই—

না—আমার একটু কাজ আছে সেক্রেটারিয়েটে। আচ্ছা চলি, বলেই উঠে দাঁড়াল সজল এবং মিত্রানীকে আর কোন কথার সুযোগ না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঐ দশজনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল—সেই কলেজ-জীবনের ফার্স্ট ইয়ার থেকেই। ডিগ্রী কোর্সে সকলে এসে একসঙ্গে একই কলেজে ভর্তি হয়েছিল। এবং কলেজ-জীবনের দীর্ঘ তিন বৎসরের পরিচয়ে ও ঘনিষ্ঠতায় ওদের পরস্পরের মধ্যে একটা মধুর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল স্বভাবতই।

সজল কিছুদিন ওদের সঙ্গে আর্টস পড়েছিল, তারপর হঠাৎ আর্টস ছেড়ে দিয়ে কমার্স নিয়েছিল। তার ক্লাস হতো সন্ধ্যার দিকে, কিন্তু তাতে করে মেলামেশার কোন অসুবিধা হয়নি। ওদের মধ্যে বিদ্যুতের বাবার অবস্থাই ছিল সবচাইতে ভাল। বনেদী ধনী বংশের ছেলে তো ছিলেনই—নিজেও ওকালতী করে সমরবাবু—বিদ্যুতের বাবা—প্রচুর উপার্জন করতেন।

শ্যামবাজার অঞ্চলে বিরাট সেকেলে বাড়ি। তিন-চার শরিক—এক এক শরিকের এক এক মহল—একতলায় একটা বিরাট হলঘর ছিল—প্রতি রবিবার সন্ধ্যার দিকে ঐ দশজন বিদ্যুৎদের ঐ হলঘরে জমায়েত হয়ে আড্ডা জমাতো। প্রতি রবিবারের সেটা ছিল ওদের একটা বাঁধা রুটিন।

শুধু আড্ডাই নয়—গান-আবৃত্তিও চলতো মধ্যে মধ্যে। বিদ্যুতের মা শৈলবালা প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা করতেন সবার জন্য!

এক বিদ্যুৎ ছাড়া অন্য সবাই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে। ওদের—মানে, ছেলেদের মধ্যে সুহাসই ছিল লেখাপড়ায় সবার সেরা এবং মেয়েদের মধ্যে ছিল মিত্রানী।

॥ দুই ॥

সজলের কিন্তু একটা কমপ্লেক্স বরাবরই ছিল। সেই কমপ্লেক্সের জন্যই বোধ হয় সে অন্যান্যদের সঙ্গে ঠিক মন খুলে মিশতে পারত না। শুধু তাই নয়, জীবনটাকে বরাবরই সে একটু সিরিয়াস ভাবে নিয়েছে—ভাল চাকরি করবে—জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে—জীবনে সাচ্ছল্য আসবে এটাই ছিল তার স্বপ্ন বরাবরের। সজল চলে যেতে মিত্রানীর মনে হলো, সজল আজো তেমনি আছে—তিন বছরে কোন পরিবর্তনই হয়নি তার। জীবন সম্পর্কে আজো সে তেমনি সিরিয়াস।

মিথ্যা বলেনি সজল মিত্রানীকে, কমপিটিটিভ পরীক্ষায় পাস করে চাকরি নিয়ে কলকাতা ছাড়বার পর, বিশেষ করে গত দুই বৎসরে যে-সব চিঠি সজল তাকে লিখেছে তার মধ্যে প্রায় শেষের দিকের সবগুলো চিঠিতেই একটি কথা যেন বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখেছে সজল তাকে। এবং তার সহজ অর্থই হচ্ছে, সজল তাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পেতে চায়—অবশ্য মিত্রানীর যদি আপত্তি না থাকে।

মিত্রানী সজলের সব চিঠিরই জবাব দিয়েছে কিন্তু কেন না-জানি কোন চিঠির মধ্যেই সে লিখতে পারেনি সজল যা চায় তা হতে পারে না, তার পক্ষে সজলের অনুরোধ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়—বরং কিছুটা কৌশলেই যেন সজলের প্রশ্নের জবাবটা এড়িয়েই গিয়েছে এবং এও ভেবেছে মিত্রানী, সজল হয়ত নিজে থেকেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে এবং একসময় ঐভাবেই হয়ত ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

কিন্তু এখন বোঝা গেল তা হয়নি।

সেদিনকার মিত্রানীর মনের ঐ কথাগুলো পরে মিত্রানীর ডাইরীর পাতায় আরো অনেক কথার সঙ্গে একেবারে শেষের দিকে জানতে পারা গিয়েছিল।

প্রায় নিয়মিতই বলতে গেলে প্রতি রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে মিত্রানী ডাইরী লিখতো, কিন্তু যাক—সে তো আরো পরের কথা।

নীচের কথাগুলো মিত্রানীর ডাইরীর পাতা থেকেই জানা যায়।

বেচারী সজল। সত্যিই ওর জন্য আমি দুঃখিত। হয়ত আজ স্পষ্ট করে ওকে আমার জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল কথাটা ঃ সজল, মনে মনে আমি সুহাসের কাছে অনেকদিন থেকেই বাগদত্তা। আমি শুধু অপেক্ষা করে আছি কবে সুহাস এসে আমায় বলবে, মিতা, তোমাকে আমি ভালবাসি—তোমাকেই আমি চাই।

কি জানি—পারলাম না বলতে কিছুতেই যেন কথাটা সজলকে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা যেন কিছুতেই অমন স্পষ্ট করে ওকে জানিয়ে দিতে পারলাম না।

বুঝতে পারছি অনেকখানি আশা নিয়েই সজল আজ আমার কাছে এসেছিল।

কিন্তু কি করবো—আমি কি করবো—কি আমি করতে পারি?

আচ্ছা আমি যেমন সুহাসকে ভালবাসি, সেও কি তেমনি আমায় ভালবাসে?

কি জানি বুঝতে পারি না। ও এত চাপা যে কিছুই বোঝা যায় না ওর ভিতরের কথা।

কেন যেন মিত্রানীর চোখে সেরাত্রে একেবারে ঘুম ছিল না।

পরের দিন সকালে উঠে সবে চায়ের কাপটা নিয়ে বসেছে, বাবার ঘরে টেলিফোনটা বেজে উঠলো এবং একটু পরেই বাবার গলা শোনা গেল, মিতান মা, তোমার ফোন—

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখেই মিত্রানী বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। মিত্রানীর বাবা অবিনাশ ঘোষাল ঐদিনকার সংবাদপত্রটা পড়ছিলেন। মেয়েকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন, তোমাকে এত করে বলি মিতান মা ফোনটা তোমার ঘরে নিয়ে নাও—যখন-তখন এত বিরক্ত করে—

বাড়িতে ফোন আসার কিছুদিন পর থেকেই অবিনাশ ঘোষাল এ কথা বলে আসছেন। নিজে বরাবর স্কুল-মাস্টারি করেছেন—এখনো করছেন—রিটায়ার করবার প্রায় সময় হয়ে এলো, তাঁর এক ছেলে এক মেয়ে—ছেলে বড়, ডাক্তার-ছেলে প্রণবেশই তার নামে ফোনটা এনেছিল বছরখানেক আগে বাড়িতে—সরকারের কাছে বিশেষ আবেদন জানিয়ে। কিন্তু ফোন বাড়িতে আসার মাস তিনেকের মধ্যেই সে বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে।

অবিনাশ ঘোষাল কখনো কারো কাছে ফোন করেন না—তাঁকেও বড় একটা কেউ ফোন করে না। ফোন আসে মিত্রানীর কাছেই।

এবং মিত্রানীই ফোন করে কখনো-সখনো।

মিত্রানী রিসিভারটা তুলে নিল, হ্যালো!

মিত্রানী নাকি? আমি সুহাস।

কেন জানি সুহাসের নামটা শুনেই ধক্ করে ওঠে মিত্রানীর বুকের ভিতরটা। তাকে বন্ধু-বান্ধবরা ফোন করে, সুহাস কখনো আজ পর্যন্ত তাকে ফোন করেনি।

সুহাস অবিশ্যি সময়ই পায় না বড় একটা। এম. এ. পড়তে পড়তেই, তার বরাবর অত ভাল পরীক্ষায় রেজাল্ট হওয়া সত্ত্বেও পড়া ছেড়ে দিয়ে কোন একটা মার্চেন্ট অফিসে চাকরি নিয়েছে।

মাইনে এমন বিশেষ কিছুই নয়।

মিত্রানী চাকরির সংবাদটায় তেমন নয়, যতটা পড়া ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে বিস্মিত হয়ে শুধিয়েছিল, তা তুমি পড়া ছেড়ে দেবে কেন?

সুহাস বলেছিল, দুটো তো একসঙ্গে ম্যানেজ করা যাবে না মিত্রানী—

কিন্তু পাসটা করেই না হয় চাকরিতে ঢুকতে—অনেক ভাল চান্স হয়ত পেতে।

ঠিক, তা হয়ত পেতাম, কিন্তু সময় তো দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে না। আজকের অভাবটা হয়তো আরো তখন দুঃসহ হয়ে উঠবে।

কিন্তু এম. এ.-তে তুমি নির্ঘাত ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতে, তখন অনেক ভাল চাকরি হয়ত তোমার জুটতো।

হয়ত নাও জুটতে পারতো, তাছাড়া—

কি?

তুমি যা বলছো—এম. এ.-র রেজাল্টটা ভাল হলে এবং সেরকম চাকরি না পেলে ব্যর্থতাটা হয়ত আরো বেশী পীড়া দিত মিত্রানী, এই বরং ভাল করেছি—

তোমার এত ভাল কেরিয়ার, মিত্রানী তবু যেন বোঝাবার চেষ্টা করেছে সুহাসকে।

সুহাস বলেছে, মাইনেটা কিন্তু নেহাৎ কম নয়—ডি. এ. নিয়ে প্রায় তিনশ'র মতো পাবো—তারপর উন্নতি করতে পারলে—

কি জানি, মিত্রানী বলেছে, আমার যেন মনে হচ্ছে তুমি বোধ হয় ভুল করলে সুহাস।

আরে আমরা তো জন্ম-মুহূর্তেই ভুল করে বসে আছি—

মানে?

এই প্রচণ্ড স্ট্রাগলের জমানায় মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মানোটাই তো একটা ভুল—পথ সীল্‌ড, সব পথে কাঁটা—দু'পা এগুতে গেলেই হোঁচট খেতে হবে।

সুহাস আর সজল যেন একে অন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত! মিথ্যে নয়, মিত্রানীর কত সময় পরবর্তীকালে মনে হয়েছে সজলের মতো সুহাস কেন মনের মধ্যে সাহস পেল না! মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে তো দুজনাই—অথচ সুহাস লেখাপড়ায় কত ভাল ছেলে!

এম. এ.-টা পাস করতে পারলে সে অনায়াসেই একটা ভাল কলেজে কাজ পেয়ে যেতো—তা না একটা সামান্য কেরানীগিরিতে ঢুকে গেল, যার কোন ভবিষ্যৎ নেই—যে চাকরি-জীবনে কোন উত্তরণ নেই! বস্তুত বন্ধুদের মধ্যে সুহাসই প্রথমে চাকরিতে ঢুকেছিল।

তারপর কমপিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে সজল চাকরিতে ঢুকলো, সুহাস চাকরিতে ঢোকার পর যেন অন্য সকলের কাছ থেকে কেমন একটু দূরেই চলে গিয়েছিল। ডিগ্রী কোর্স শেষ হবার পর থেকেই ওদের বিদ্যুতের বাড়ির আড্ডায় সমাপ্তি ঘটেছিল। তাহলেও মধ্যে মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হতো। তবে ঐ দেখাসাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্তই, আগের মতো আড্ডা দেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। প্রত্যেকে প্রত্যেকের খোঁজখবর অবিশ্যি পেতো এ ওর কাছ থেকে মধ্যে মধ্যে।

সকলেই যে যার ধান্ধায় ব্যস্ত। সকলেই চাকরি করে, একমাত্র বিদ্যুৎ ছাড়া।

যাদের বাড়িতে ফোন আছে, যেমন বিদ্যুৎ, কাজল, মণি এবং মিত্রানী—তারা পরস্পর পরস্পরকে মধ্যে মধ্যে ফোন করতো।

সুহাস কখনো তাকে ফোন করেনি। আর মিত্রানীও কখনো আজ পর্যন্ত সুহাসকে ফোন করেনি—বিশেষ করে তাই মিত্রানী একটু যেন বিস্মিতই হয়েছিল সুহাসের ফোন পেয়ে।

সুহাস ফোনের অপর প্রান্ত থেকে আবার বললে, আমি সুহাস!

কি খবর সুহাস—হঠাৎ ফোন করছো?

সজল কলকাতায় এসেছে জানো? সুহাস মিত্রানীর প্রশ্নের জবাবে বললো।

জানি। পরশু সে আমার এখানে এসেছিল।

কয়েকটা মুহূর্ত অতঃপর স্তব্ধতা, তারপর সুহাসের গলা শোনা গেল, মিত্রানী!

বল।

বলছিলাম—মানে, সজল তোমাকে কিছু বলেছে?

মিত্রানী ভেবে পায় না সুহাসের প্রশ্নের কি জবাব দেবে। সজল সেদিন তাকে যে কথাটা বলেছিল সেটা কি কাউকে বলা ঠিক হবে! বিশেষ করে সুহাসকে!

চুপ করে আছো কেন মিত্রানী, সজল তোমাকে কিছু বলেছিল?

না—মানে বলছিলাম, হঠাৎ ঐ প্রশ্ন কেন?

সুহাস আবারও তার প্রশ্নটায় পুনরাবৃত্তি করলো, বল না, সজল তোমাকে কিছু বলেছিল?

না তো—সেরকম কিছু তো আমার মনে পড়ছে না সুহাস—তবে কি তুমি ঠিক জানতে চাও যদি বলতে—

আচ্ছা মিত্রানী, সজল কি তোমাকে বলেছিল যে সে তোমাকে ভালবাসে—সে তোমাকে বিয়ে করতে চায়? আর জবাবে তাকে তুমি বলেছিলে, তা সম্ভব নয়—কারণ তুমি অন্য একজনকে ভালবাসো?

তোমাকে—মানে সজল তোমাকে ঐ কথা বলেছে? মিত্রানীর কণ্ঠস্বরে খানিকটা বিস্ময় যেন ফুটে ওঠে।

সুহাস তখন আবার বললে, নচেৎ আমি জানবো কি করে, বল! সজলের কাছে অবিশ্যি তুমি তার নামটা বলোনি—তাকে এড়িয়ে গিয়েছো, কিন্তু আমাকে তো তুমি বলতে পার—কে সে? আমাদের বন্ধুদের মধ্যেই কেউ কি?

কি হবে নামটা জেনে তোমার?

বস্তুত মিত্রানীর যেন কিছুটা অভিমানই হয়। সবার মধ্য থেকে শেষ পর্যন্ত সুহাসই কিনা তাকে আজ নামটা জিজ্ঞাসা করছে! আজও কি সে তাহলে বুঝতে পারেনি মিত্রানীর মনটা কোথায় বাঁধা পড়েছে!

কি হলো মিত্রানী, বলো?

মিত্রানী আর কোন কথা বলেনি ফোনে—নিঃশব্দে সে ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছিল। ঐ তারিখের মিত্রানীর ডাইরীর পাতায়—ঐ ঘটনার কথাটা লিখবার পর সে লিখেছে ঃ আজ বুঝতে পারলাম, এতদিন যা ভেবে এসেছি তা মিথ্যা। সেই সঙ্গে বুঝতে পারলাম, সুহাসের মনের মধ্যে কোথাও আমি নেই।

॥ তিন ॥

ঐ ঘটনারই পরের দিন সজল আবার হঠাৎ এলো বিকেলের দিকে মিত্রানীদের ওখানে। শেষের ক্লাস দুটো মিত্রানীকে নিতে হয়নি বলে একটু আগেই কলেজ থেকে চলে এসেছিল ও। গতকালের ঘটনার পর থেকেই মনটা তার ভাল ছিল না, টেলিফোনে সুহাসের কথাগুলোই যেন কেবল তার মনে পড়ছিল। মুখে কোনদিন কথাটা সে প্রকাশ না করলেও —সুহাস কেন বুঝতে পারলো না মনটা তার এত বছর ধরে কোথায় বাঁধা পড়েছে।

নিজের ঘরে ক্যামবিশের আরাম-কেদারাটার উপরে গা ঢেলে দিয়ে চোখ বুজে পড়ে ছিল মিত্রানী—সজলের জুতোর শব্দটা পর্যন্ত তার কানে প্রবেশ করেনি সজলের কণ্ঠস্বরে সে চোখ মেলে তাকাল।

মিত্রানী!

কে? ও সজল, এসো.—মিত্রানী উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু সজল তাকে বাধা

দিয়ে বললে, আর ব্যস্ত হতে হবে না তোমাকে, বসো বসো—বলতে বলতে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সজল ওর মুখোমুখি বসে পড়ল।

মিত্রানী ভেবেছিল সেদিনকার তার ঐ স্পষ্ট কথার পর সজল বোধ হয় জীবনে আর তার সামনে এসে দাঁড়াবে না। কথাটা ভেবে তার একটু কষ্টও হয়েছিল, এখন সজলকে আসতে দেখে সে যেন একটু খুশিই হয়। শুধু তাই নয়, ঐ মুহূর্তে সজলের চোখমুখের ভাব দেখে মিত্রানীর মনেও হলো না, তার সেদিনকার সেই কথায় সজল এতটুকু অসন্তুষ্ট হয়েছে বা সে কথাগুলো তার মনে আছে!

কখন ফিরলে কলেজ থেকে? সজল শুধালো।

এই কিছুক্ষণ আগে—মিত্রানী বললে।

তোমাকে যেন একটু কেমন ক্লান্ত মনে হচ্ছে, মিত্রানী!

মিত্রানী মৃদু হেসে বলল, না। সে সব কিছু নয়—আচ্ছা সজল—

বল?

সুহাসের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল বুঝি?

শুধু সুহাস কেন, সকলের সঙ্গেই তো দেখা করেছি—কেন বল তো, হঠাৎ সুহাসের কথা কেন?

না, এমনি—

তা কই, আজ যে চায়ের কথা বললে না?

চা খাবে?

খাবো না মানে—এনি টাইম ইজ টি-টাইম।

বোসো—আমি আসছি—

মিত্রানী ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সজল বসে বসে একা একা মিত্রানীর টেবিলের উপর রাখা বই ও খাতাপত্রগুলো ঘাঁটতে লাগল। একটু পরেই মিত্রানী ঘরে ফিরে এলো।

জানো মিত্রানী, একটা প্ল্যান করেছি,—সজল বললে।

প্ল্যান!

হ্যাঁ, কে কবে কোথায় কখন থাকি—বিশেষ করে আমি তো আজ এখানে কাল সেখানে, তাই ঠিক করেছি একদিন সকলে মিলে সারাটা দিন কোথাও হৈ-চৈ করা যাবে।

বেশ তো। মন্দ কি—নট এ ব্যাড আইডিয়া!

পরশু শনিবার কি যেন একটা ছুটি আছে—তাই বিদ্যুৎকে আজ সকালেই বলেছি—আমরা সকলে শনিবারের দিনটা বটানিকস-এ গিয়ে হৈ-চৈ করে কাটাবো! কেন, বিদ্যুৎ তোমাকে ফোনে কথাটা বলেনি? সে তো বলেছিল, সে-ই তোমাকে ফোনে আমাদের প্ল্যানটা জানিয়ে দেবে—

না, এখনো বলেনি। হয়ত আজ সন্ধ্যেবেলা বলবে। তা সবাইকে কথাটা জানানো হয়েছে?

বিদ্যুৎ সকলকে জানাবার ভার নিয়েছে—তার গাড়ি আছে, ফোনও আছে, তার পক্ষেই সুবিধা।

প্রৌঢ়া গোপালের মা, মিত্রানীদের বাড়ির দাসী ঐ সময় ট্রেতে করে দু'কাপ চা ও

pathagar.net

একটা প্লেটে কিছু খাবার নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

মিত্রানী একটু নীচু টুল এনে সামনে রেখে বলল, এটার উপরে রাখ গোপালের মা!

গোপালের মা ট্রে-টা নামিয়ে রেখে চলে গেল।

সজল বললে, এ কি, এক প্লেট খাবার কেন—তুমি কিছু খাবে না মিত্রানী?

না। এ সময় আমি এক কাপ চা ছাড়া কিছু খাই না।

রাত্রি প্রায় আটটা পর্যন্ত মিত্রানীর সঙ্গে সজল এটা-ওটা নানা গল্প করে এক সময় মিত্রানীকে গান গাইবার জন্য অনুরোধ করল।

মিত্রানী প্রথমটায় গান গাইতে চায়নি কিন্তু সজলের পীড়াপীড়িতে গাইতেই হলো। সজল বললে, সেই গানটা গাও মিত্রানী!

কোন্ গানটা?

সেই যে অতুলপ্রসাদের সেই গানটা—

অতুলপ্রসাদের তো অনেক গান আছে, কোন্‌টা শুনতে চাও তাই বলো না।

সেই যে 'একা মোর গানের তরী—'

মিত্রানী গেয়ে শোনায় গানটা। তারপর এক সময় সজল বিদায় নেয় মিত্রানীর কাছ থেকে। সজলকে দুদিন আগে স্পষ্ট করে তার প্রস্তাবে না বলার পর থেকেই মিত্রানীর মনের মধ্যে স্বভাবতই যে সংকোচটা দেখা দিয়েছিল তার যেন বিন্দুমাত্রও আর অবশিষ্ট থাকে না। যাক্, শেষ পর্যন্ত তাহলে সজল ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নেয়নি। মনটা মিত্রানীর হালকা হয়ে যায়।

বিদ্যুৎ মিত্রানীকে ফোন করেছিল পরের দিন সকালে।

সজল কলকাতায় এসেছে কয়েক দিনের ছুটিতে তুমি তো জান মিত্রানী—বলেছিল বিদ্যুৎ।

জানি, মিত্রানী বললে।

সে বলেছিল, কাল শনিবার আমরা পুরানো দিনের বন্ধুরা একটা দিন বটানিক্স্-এ হৈ-চৈ করে কাটাবো—

হ্যাঁ, সে কাল আমার এখানে এসেছিল—বলছিল তোমাকে নাকি কথাটা বলেছে—তুমি সকলকে জানাবে।

জানিয়েছি। সবাই রাজী।

সুহাস কি বললো?

সেও রাজী বৈকি। তাহলে তুমি আসছো তো মিত্রানী?

হ্যাঁ—যাবো। তা খাওয়াদাওয়ার কি হবে?

সে ব্যবস্থা আমিই করবো বলেছি সকলকে। তা কি মেনু করা যায় বল তো? কাজল বলছিল—

কি বলছিল?

একে এই বৈশাখের প্রচণ্ড গরম—কোন কিছু হেভী নয়—লাইট রিফ্রেশমেন্ট-এর মত কিছু—

BanglaBook.org

তা সত্যি—সময়টা আউটিং-এর পক্ষে আদৌ ভাল নয়—যা প্রচণ্ড গরম চলছে—

তা অবিশ্যি ঠিক। তবে আজ ক'দিন থেকে প্রত্যেক দিনই তো সন্ধ্যায় কালবৈশাখী হচ্ছে—মেঘ করে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে—সন্ধ্যার দিকটা বেশ ঠাণ্ডাই মনে হয়।

আচ্ছা বিদ্যুৎ, কোল্ড ড্রিংক্স-এর কিছু বন্দোবস্ত করলে হয় না?

বিদ্যুৎ বললে, সে ব্যবস্থা আমি করেছি—একটা আইস-বক্স নেবো—তার মধ্যে কোল্ড ড্রিংক্স থাকবে। আর থাকবে—কি বল তো?

বরফ।

না—আইসক্রীম—

ওঃ, হাউ লাভলি! তবে একটু বেশি করে নিও কিন্তু—

নেবো।

হ্যাঁ বাবা, আমার দুটো-একটায় হবে না। যত খুশি যেন পাই—

এসময়ে আউটিং-এর ব্যবস্থা হলেও সজলের পরিকল্পনাটা কিন্তু সকলেই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। বহুদিন সকলে একত্রে মিলে আড্ডা দেয়নি।

কলেজ-জীবনের সেই আনন্দময় দিনগুলো যেন হারিয়েই গিয়েছিল প্রত্যেকের জীবন থেকে।

কথা ছিল যে যার মত বটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে পৌঁছবে এবং সেই প্রাচীন বটবৃক্ষের তলে গিয়ে একত্রে মিলিত হয়ে জায়গা একটা বেছে নেওয়া হবে। তবে সকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই সকলকে পৌঁছতে হবে।

মিত্রানীর পৌঁছতেই মিনিট পনেরো দেরি হয়ে গিয়েছিল। মিত্রানীকে দেখে সকলে হৈ হৈ করে উঠলো। মিত্রানী সকলের দিকে তাকাল।

সবাই এসেছে—বিদ্যুৎ, ক্ষিতীশ, অমিয়, মণি, সতীন্দ্র, সুহাস, পাপিয়া, কাজল—কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে মিত্রানী বললে, ব্যাপার কি, বিদ্যুৎ—আমাদের আজকের আউটিং-এর পরিকল্পনাকারী সজলকে দেখছি না যে—সজল আসেনি?

বিদ্যুৎ বললে, ভেরী স্যাড!

স্যাড! কি ব্যাপার? সজলের কিছু হয়েছে নাকি?

না—

তবে?

হঠাৎ একটা জরুরী ট্রাংক কল পেয়ে তাকে তার কর্মস্থলে আজকেই সকালের প্লেনে চলে যেতে হচ্ছে।

এতক্ষণে হয়ত এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছে—বলছিল সকাল সাড়ে দশটায় বাগডোগরার প্লেন। বিদ্যুৎ বললে।

বেচারী—তারই উৎসাহে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হলো—অথচ সে-ই আসতে পারল না!

হ্যাঁ, খুব ভোরে আজ আমার ওখানে এসেছিল সজল, বললে, আমাকে হঠাৎ চলে যেতে হচ্ছে ভাই। জানই তো, পরের চাকরি—রেসপনসিবল পোস্টে আছি—সকালের প্লেনেই ফিরে যেতে হচ্ছে। তাতে আমি বলেছিলাম, প্রোগ্রামটা তাহলে ক্যানসেল করে

দিই। সজল বললে, না, তা করো না—নাই বা থাকলাম আমি তোমাদের মধ্যে—তোমরা সকলে এন্‌জয় কর—বেটার লাক নেক্সট টাইম! তাই আর কাউকে কথাটা জানাইনি—তা ছাড়া সব অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গিয়েছে।

বেচারী সজল!

॥ চার ॥

সকলেই সজলের অনুপস্থিতিটা সেদিন যেন সর্বক্ষণ অনুভব করেছে। তবু সকলে অনেক দিন পর একত্রে মিলিত হওয়ায় প্রচুর হৈ-চৈ করতে লাগল।

বৈশাখের ঐ প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও যেন কারো এতটুকু কোন ক্লান্তিবোধ হয়নি। ক্রমে ক্রমে বেলা পাঁচটা বাজে—কারোর ফেরার কথা মনেই হয়নি। বরং সবাই স্থির করে, চাঁদনী রাত আছে—সন্ধ্যার পর সকলে ফিরবে।

সুহাস ঐ সময় বললে, কাগজে আজ লিখেছে কিন্তু বজ্রবিদ্যুৎসহ সন্ধ্যার দিকে এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে—

অমিয় বললে, তাহলে আজ অন্তত নিশ্চিন্ত থাকতে পার বন্ধু—আমাদের ঐ আবহাওয়া অফিসের ফোরকাস্ট কোনদিনই ঠিক হয় না। যে দিনটি তাঁরা বলেন, ঠিক তার উল্টোটিই হয়—

সকলে অমিয়র কথায় হেসে ওঠে। সুহাস বললে, কিন্তু ক'দিন ধরেই আবহাওয়া অফিসের ফোরকাস্ট মিলে যাচ্ছে কিন্তু।

অমিয় বললে, আজ আর মিলবে না দেখে নিও, তাছাড়া—ছন্দপতন তো শুরুতেই ঘটে গিয়েছে—

কাজল শুধায়, কিসের আবার ছন্দপতন ঘটলো?

উদ্যোক্তাই শেষ পর্যন্ত অনুপস্থিত—আসা হলো না তার।

মিত্রানী সুহাসের মুখের দিকে তাকাল। একবার ইচ্ছা হয়েছিল তার সুহাসকে জিজ্ঞাসা করে, সজল তাকে আর কি বলেছিল! কিন্তু পারে না— কেমন যেন একটা সংকোচ বোধ করে।

কাজল ঐ সময় হঠাৎ বলে ওঠে, তোকে আজ যা নীল রংয়ের সিল্কের শাড়িটায় দেখাচ্ছে না—

সুহাস মৃদু হেসে বললে, মিত্রানীর প্রেমে যেন আবার পড়ে যেও না কাজল, দেখো—

সুহাসের কথায় যেন একটু চমকেই তাকাল মিত্রানী তার মুখের দিকে।

কাজল হাসতে হাসতে জবাব দেয়, যাই বলো সুহাস, আমাদের ছেলে-বন্ধুগুলো একেবারে গবেট—দলে মিত্রানীর মতো একটা মেয়ে থাকতে এত বছরে এখনো কেউ ওর প্রেমে পড়তে পারল না।!

সুহাস বললে, কি করে জানলে কাজল যে আমাদের মধ্যে কেউ এখনো ওর প্রেমে পড়েনি?

মশাই, অত রেখে ঢেকে কেন? কাজল বললে, কেউ কিছু মনে করবে না—বলে

ফেলো, বলে ফেলো—আফটার অল উই আর ফ্রেন্ডস হিয়ার!

মিত্রানী বলে ওঠে, আঃ, কি হচ্ছে কাজল—

দেখ্ বাবা—তোরা যে যাই বলিস, কাজল বললে, প্রেমের ব্যাপারটা কিন্তু সত্যিই আমার বড় ভাল লাগে—প্রেমে পড়াটাও যেমন আনন্দ—প্রেমে কেউ কারোর পড়েছে শুনেও আনন্দ—

বিদ্যুৎ হাসতে হাসতে ঐ সময় বলে ওঠে, অমিয়-ক্ষিতীশ-সুহাস, তোরা কেউ কোন কাজের নোস—মেয়েটা প্রেমের জন্য এত হেদিয়ে উঠেছে, অথচ তোরা—এতগুলো পুরুষমানুষ—

সুহাস বললে, একেবারে নীরব—পাষাণ—সব পাষাণ বুঝলে কাজল—

কাজল বলে ওঠে, থাক্ বাবা থাক্—আমি না হয় কালোকুচ্ছিত আছি—

সতীন্দ্র তাড়াতাড়ি বলে, ছিঃ, কাজল—ডোন্ট বি সিরিয়াস! সতীন্দ্র ব্যাপারটা হালকা করে দেবার চেষ্টা করে।

মিত্রানী ঐ সময় বললে, আচ্ছা, তোমরা কেউ আর কি কোন কথা খুঁজে পাচ্ছো না যে, প্রেম নিয়ে সকলে বাক্‌যুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছো?

সতীন্দ্র বললে, ঠিক,—অন্য কথা বলো, অন্য কথা।—বরং একটা গান হোক, মিত্রানী একটা গান গাও—

অবশেষে মিত্রানীর গানের ভিতর দিয়েই সমস্ত ব্যাপারটা যেন হালকা হয়ে গেল।

খাওয়াদাওয়ার পর্ব চুকতে চুকতেই বেলা প্রায় তিনটে হয়ে গেল। সকলে হাঁটতে হাঁটতে অতঃপর গঙ্গার ধারে যায়। এবং গঙ্গার ধারে অনেকক্ষণ বসে ছিল ওরা—ইতিমধ্যে অপরাহ্নের আকাশে কখন কালো একখণ্ড মেঘ জমতে শুরু করেছে ওদের খেয়ালও হয়নি কারো, হঠাৎ খেয়াল হলো আচম্বিতে একটা ধুলোর ঘূর্ণি এলোমেলোভাবে ছুটে আসায়। পরিদৃশ্যমান জগৎটা যেন মুহূর্তে সেই ধুলো আর রাশীকৃত ছেঁড়া পাতায় একেবারে মুছে একাকার হয়ে গেল।

আঁধি!

মেয়েদের শাড়ির আঁচল আর চুলের রাশ এলোমেলো এবং কেউ কিছু ভাল করে বুঝবার আগেই দলের ন'জন কে যে কোথায় কেমন করে ছিটকে পড়লো ওরা যেন বুঝতেই পারল না। অবশ্য ঐ প্রচণ্ড ধুলোর ঝড়ের মধ্যে কারো দিকে কারো নজর দেবার মত বুঝি কোন সুযোগও ছিল না।

মিনিট পনেরো কি কুড়ি হবে—ধুলোর ঝড় যখন থেমেছে—কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি—তারই মধ্যে বিদ্যুৎ লক্ষ্য করলো, সে দলছাড়া হয়ে একটা ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে। এদিক ওদিক তাকাল বিদ্যুৎ, কিন্তু আশেপাশে দলের আর কাউকেই সে দেখতে পেল না।

বিদ্যুৎ অন্যান্য সবাইকে খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে চলল।

পরে জানা গিয়েছিল, একা বিদ্যুৎই নয়—সতীন্দ্র, অমিয়, মণি (মণিময়), ক্ষিতীশ, কাজল, পাপিয়া সাতজনই ওরা একে অন্যকে বেশ কিছুটা সময় খুঁজে বেড়িয়েছে। অবশেষে সকলে যখন একত্রিত হয়েছে, কাজলই বললে, সুহাস মিত্রানী, তাদের দেখছি না—তারা দুজন কই?

মিত্রানী—সুহাস। তাই তো, সবাই যেন ঐ মুহূর্তে কাজলের কথায়, মিত্রানী ও সুহাস যে তাদের মধ্যে নেই—ব্যাপারটা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠলো।

মিত্রানী সুহাস কোথায় গেল!

সকলেই সুহাস আর মিত্রানীর নাম ধরে ডাকে আর ওদের খোঁজে।

মিত্রানী—সুহাস! কোথায় তোমরা! মিত্রানী সু—হা—স—

বিদ্যুৎই ওদের মধ্যে শেষ ঝাপসা আলোয় প্রথমটায় সুহাসকে আবিষ্কার করেছিল—সর্বপ্রথম। অর্থাৎ ওর দৃষ্টিই সকলের আগে সুহাসের উপরে গিয়ে পড়ে।

সুহাস উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে—একটা ভাঙা পত্রবহুল গাছের ডাল, তারই নীচে সুহাসের দেহের নিম্নাংশ চাপা পড়েছে।

বিদ্যুৎ আর অমিয় তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ভাঙা ডালটা টেনে সরায়—অন্যরা সুহাসের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে। কাজল ডাকে, সুহাস!

সবাই তার গলায় যেন একটা কান্নার সুর শুনছিল।

মিত্রানীর কথা ঐ মুহূর্তে আর কারো মনে ছিল না। মনেও পড়েনি কথাটা কারো যে একা সুহাসই নয়, মিত্রানীকেও পাওয়া যাচ্ছে না—সুহাসকে নিয়েই সকলে তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কাজল বসে পড়েছিল একেবারে সুহাসের মাথার সামনে। তার মাথাটা নিজের কোলের উপর তুলে নিয়ে ডাকে, সুহাস—সুহাস—

সুহাস যেন অতি কষ্টে চোখ মেলে তাকাল।

সুহাস—কাজল আরো ঝুঁকে পড়ে সুহাসের মুখের কাছে।

কে?

আ—আমি কাজল।

বিদ্যুৎ এগিয়ে এলো। সে বললে, লেগেছে কোথাও তোর সুহাস?

হ্যাঁ—মাথায়—

সত্যিই সুহাসের মাথায় আঘাতের চিহ্ন ও রক্ত।

সুহাস উঠে বসতে বসতে বললে, উঃ, ভীষণ চোট লেগেছে মাথায়। এখনো মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করছে, ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে সুহাস বললে। তারপরই একটু থেমে বললে, মিত্রানী—মিত্রানী কোথায়?

বিদ্যুৎ বললে, মিত্রানীকে দেখছি না। তুই দেখেছিস তাকে?

না তো—তবে—

কি তবে? অমিয় সাগ্রহে শুধায়।

ধুলোয় ঘূর্ণির অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না, সুহাস পূর্ববৎ ক্লান্ত গলায় বলতে থাকে থেমে থেমে, হঠাৎ আমার মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলাম পিছন থেকে—মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো—সব অন্ধকার হয়ে গেল—

তারপর? বিদ্যুৎ শুধালো।

জানি না। তারপর আর কিছু জানি না।

॥ পাঁচ ॥

মিত্রানীকে বেশী খুঁজতে হয়নি—

সুহাস যেখানে পড়ে ছিল—সেই ঝোপটারই অন্য দিকে একটা গাছের নীচে, মিত্রানীকে পাওয়া গেল—চিত হয়ে পড়ে আছে মিত্রানী। হাত দুটো ছড়ানো। বিদ্যুৎই প্রথমে দেখতে পায়।

তার পরনের নীল মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়িটার আঁচল বুকের উপর থেকে সরে গিয়েছে আর—শাড়ির প্রান্তভাগটা প্রসারিত হাঁটুর অনেকটা উপরে উঠে এসেছে। বাঁ দিককার জঙ্ঘা অনেকটা—

গায়ের ব্লাউজের বোতামগুলো মনে হয় কেউ যেন হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলেছে। তলার ব্রেসিয়ারটারও একই অবস্থা।

চোখ দুটো যেন মিত্রানীর ঠেলে বের হয়ে আসছে। যেন এক অসহ্য যন্ত্রণার স্পষ্ট চিহ্ন ওর সারা মুখে তখনো। মুখটা সামান্য হাঁ করা, উপরের পাটির দাঁতের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। বোবা—সবাই যেন বোবা হয়ে গিয়েছে।

বিদ্যুৎই সামনে মিত্রানীর মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে অর্ধস্ফুট একটা চিৎকার করে ওঠে।

মিত্রানী—মিত্রানী মরে গেছে—

হ্যাঁ—সত্যিই—মিত্রানী মৃত।

ঘটনার আকস্মিকতায় সকলেই যেন কেমন বোবা—বিমূঢ়।

সবাই একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কেমন যেন বোবা অসহায় দৃষ্টিতে।

সুহাস-বিদ্যুৎ-অমিয়-সতীন্দ্র-কাজল-পাপিয়া-মণি-ক্ষিতীশ—

ইতিমধ্যে আসন্ন সন্ধ্যায় ঝাপসা অন্ধকার কখন যেন আরো ঘন, আরো জমাট বেঁধে উঠেছে।

কেউ কাউকে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না, ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে কেবল আটটি মানুষের উপস্থিতি।

সামান্য কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তেই বাতাসে একটা আলগা ঠাণ্ডার আমেজ তখন।

মিত্রানী মৃত।

ন'জন এসেছিল—তাদের মধ্যে একজন থেকেও নেই—পড়ে আছে ওদের সকলের চোখের সামনেই তার প্রাণহীন দেহটা মাত্র। মিত্রানী আর কোন দিনই কথা বলবে না—হাসবে না, সুললিত মধুর গলায় রবীন্দ্র বা অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে উঠবে না।

ভারী জমাট প্রাণান্তকর স্তব্ধতাটা যেন বিদ্যুতের কণ্ঠস্বরে হঠাৎ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠলো। সকলকেই যেন সে প্রশ্ন করলো, এখন কি করি আমরা?

বিদ্যুতের প্রশ্নে সকলেই নিঃশব্দে এ ওর মুখের দিকে তাকাল। তাই তো, কি এখন করবে ওরা—কি করতে পারে ওরা?

সুহাস জবাবটা যেন দিল, মিত্রানীকে তো এইভাবে এখানে ফেলে যেতে পারি না—

বিদ্যুৎ বললে, তবে—কি করবো?

ওর মৃতদেহটা চল তোমার গাড়িতে করেই—

বিদ্যুৎ বললে—নিয়ে যাবো?

হ্যাঁ—

কোথায়? কোথায় নিয়ে যাবো। বললে আবার বিদ্যুৎ।

ক্ষিতীশ বললে, আচ্ছা বিদ্যুৎ, এমনও তো হতে পারে এখনো ও মরে যায়নি—বেঁচে আছে। আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না, হয়ত ঝড়ের মধ্যে আচমকা পড়ে গিয়ে খুব বেশী আঘাত পেয়ে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

তাহলে? কাজল বললে।

পাপিয়া বললে, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয় না—

ক্ষিতীশ বললে, হ্যাঁ সেই ভাল। চল্, আমরা ওকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলি—

বিদ্যুৎ মাথার দিকে ধরলো, ক্ষিতীশ আর অমিয় দুজন পায়ের দিকে। মিত্রানীর দেহটা তুলতে গিয়েই বিদ্যুৎ যেন হাতে কিসের স্পর্শ পেয়ে তাড়াতাড়ি বললে, এই, কারো টর্চ আছে—টর্চের আলোটা ফেল তো।

টর্চের আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ বললে, নামাও—

ওরা আবার একটু যেন থতমত খেয়েই বিদ্যুতের কথায় মিত্রানীর মৃতদেহটা মাটির উপরে নামাল।

দেখি সতীন্দ্র, টর্চটা—

বিদ্যুৎ সতীন্দ্রের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে মিত্রানীর গলার কাছে ফেলতেই সর্বপ্রথম ব্যাপারটা তার নজরে পড়লো, মিত্রানীর গলায় একটা সাদা সিল্কের রুমাল পেঁচিয়ে—গলার পিছন দিকে শক্ত গিঁট দিয়ে বাঁধা। অন্যান্য সকলেরও ইতিমধ্যে ঐ দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে।

কি—কি ওটা মিত্রানীর গলায়! কাজল চেঁচিয়ে উঠল চাপা কণ্ঠে। তবে—তবে কি ওকে কেউ গলায় রুমালের ফাঁস দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে—

অমিয় তখনো তাকিয়ে ছিল, মিত্রানীর গলার দিকে। সে-ই বললে, হ্যাঁ—ওকে রুমালের ফাঁস দিয়ে শ্বাসরোধ করেই মেরেছে—

চিৎকার করে ওঠে কাজল, খুন!

অমিয় আবার বললে, হ্যাঁ—আমার তো তাই মনে হচ্ছে কাজল। সাম ওয়ান কিল্ড হার। শি হ্যাজ বীন ব্রুটালি মার্ডার্ড।

সুহাস বললে, কিন্তু কে? কে হত্যা করলে মিত্রানীকে ঐভাবে—

ক্ষিতীশ বললে, কে হত্যা করেছে—এখনো জানি না বটে, তবে ওকে যে হত্যা করা হয়েছে—তাতে কোন ভুল নেই—

মিত্রানীকে হত্যা করা হয়েছে!

কথাটা যেন প্রচণ্ড একটা শব্দ তুলে সকলের কর্ণপটাহের উপর আছড়ে পড়লো একই সঙ্গে।

তাহলে এখন কি করবো? ক্ষিতীশের প্রশ্ন। তার গলার স্বরটা যেন কেঁপে গেল। মনে হলো সে যেন বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যায় অন্ধকার আরো ঘন—আরো গাঢ় হয়েছে।

অস্বাভাবিক একটা স্তব্ধতা যেন চারিদিকে।

আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলো সুহাসই। বললে, এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই তো চলবে না। একটা কিছু তো আমাদের করতেই হবে মণি।

দলের মধ্যে মণিময়ই সব চাইতে বেশী প্র্যাকটিক্যাল। ভেবেচিন্তে কাজ করে—এবং বরাবরই দলের সংকট-মুহূর্তে যা পরামর্শ দেবার সে-ই দেয়। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলেনি—চুপচাপ এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, সুহাসের প্রশ্নে এতক্ষণে সে কথা বললো, আমার মনে হয় সুহাস এক্ষেত্রে আমাদের একটি মাত্রই কর্তব্য—

মিনমিনে গলায় জবাব দিল অমিয়, কি?

আমাদের মধ্যে যে হোক একজন এখুনি শিবপুর থানায় চলে গিয়ে ব্যাপারটা তাদের বলুক—

থানায়—থানায় কেন? সুহাস কাঁপা গলায় প্রশ্ন করে অন্ধকারেই মণিময়ের মুখের দিকে তাকাল।

বুঝতে পারছো না সুহাস, মিত্রানীর মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয় যখন, তখন থানায় খবর একটা আমাদের দিতেই হবে। ধীরে ধীরে কথাগুলো বললে মণিময়।

কিন্তু থানায় খবর দিলে—

সুহাসকে থামিয়ে দিয়ে মণিময় বললে, তাছাড়া আমরা আর কি করতে পারি সুহাস? মৃতদেহটা এখান থেকে নিয়ে গেলে বা ফেলে রেখে গেলে এখানেই, আমরা সকলেই বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়বো—

বিপদ! বিপদে পড়বো কেন? সুহাস আবার বললো।

কি বলছো সুহাস! আমাদের সকলকে আজ এখানে সেই সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কতজনায় হয়ত হৈ চৈ করতে দেখেছে—তাদের মধ্যে কেউ যদি আমাদের কারোর পাড়ার লোক হয়, আমাদের কাউকে চিনে থাকে—ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে পুলিস যখন খোঁজখবর শুরু করবে—সেই সময় যদি—

মণিময়কে থামিয়ে দিয়ে সতীন্দ্র এতক্ষণে কথা বললো, য়্যু আর রাইট মণিময়, সঙ্গে করে নিয়ে গেলে ডেথ্ সার্টিফিকেট-এর হাঙ্গামা, তাছাড়া শুধু ডেথ্ সার্টিফিকেট হলেই হবে না—মিত্রানীর বাবা আছেন —ডাক্তার দাদা আছেন, তাঁদেরই বা কি বলবো? আর তাঁদের অজ্ঞাতে ডেড বডি সৎকারই বা করবো কি করে—আর যদি এখানে ফেলে যাই, একটু আগে মণিময় যা বললো—আরো জটিলতার সৃষ্টি হবে। তার চাইতে আমিই না হয় যাচ্ছি থানায়—সেখানে থেকে ডেকে নিয়ে আসি সব কথা বলে—তোমরা ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা করো।

কথাগুলো বলে সতীন্দ্র অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ওরা সাতজন অন্ধকারে ভূতের মত যেন দাঁড়িয়ে রইলো।

কেউ কারো মুখ ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। আবছা—ঝাপসা অথচ অন্ধকার

pathagar.net

থাকার কথা নয়—চাঁদনী রাত—কিন্তু একটা হালকা মেঘের তলায় চাঁদ ঢাকা পড়ায় চাঁদের আলো প্রকাশ পায়নি।

ক্ষিতীশ, বিদ্যুৎ, অমিয়, সুহাস, মণিময়, কাজল, পাপিয়া অল্প অল্প ব্যবধানে সব দাঁড়িয়ে।

অমিয় ওদের মধ্যে চেইন স্মোকার। এতক্ষণ সে একটিও সিগারেট ধরায়নি। ক্ষিতীশ ঘন ঘন নস্য নেয়—সেও যেন নস্য নিতে ভুলে গিয়েছে।

আরো কিছুক্ষণ পরে চারিদিকে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়লো। অন্ধকার সরে গিয়ে সব যেন স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সকলেই সকলকে এখন দেখতে পাচ্ছে। সকলেই দেখতে পাচ্ছে তাদের সামনে পড়ে আছে মিত্রানীর প্রাণহীন দেহটা।

ঘড়ির কাঁটা যেন আর ঘুরছেই না। থেমে গিয়েছে—সময় যেন হঠাৎ থমকে থেমে গিয়েছে। নিস্তব্ধতা যেন আরো কষ্টকর—আরো দুঃসহ।

অত বড় গার্ডেনটা একেবারে জনপ্রাণীহীন—একটা স্টীমারের ভোঁ শোনা গেল। শব্দটা কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল।

আরো—আরো অনেক পরে—দূর থেকে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল—ঐ দিকেই আসছে আলোটা। দুটো প্রোজ্জ্বল অনুসন্ধানী চোখের মত একেবারে এগিয়ে আসে আর সেই সঙ্গে শোনা যায় দূরাগত একটা গাড়ির ইন্‌জিনের শব্দ। শব্দটা স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়।

একটা জীপ গাড়ি এসে থামল ওদের সামনে।

প্রথমে থানা-অফিসার সুশীল নন্দী—দুজন কনস্টেবল—আর নামলো সতীন্দ্র।

কোথায় ডেডবডি? সুশীল নন্দী জিজ্ঞাসা করলেন।

ঐ যে, সতীন্দ্র দেখিয়ে দিল।

হাতে নন্দীর জোরালো টর্চ ছিল, সেই আলো ফেলে নন্দী মিত্রানীর মৃতদেহের সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন। নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করলেন মৃতদেহটা—গলার ফাঁসটা দেখলেন, তারপর উঠে দাঁড়ালেন। সকলের মুখের দিকে তাকালেন।

সুশীল নন্দী আগেই থানায় বসে সতীন্দ্রর কাছ থেকে ব্যাপারটা শুনেছিলেন—তাই বোধ হয় ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে আর গেলেন না। সোজাসুজিই একেবারে প্রশ্ন শুরু করলেন—আপনারা তা হলে কেউই কিছু জানেন না বা দেখেনও নি—কে ওর গলায় ফাঁস দিয়ে ওকে খুন করলো?

সবাই চুপ। কারো মুখে কোন কথা নেই।

হুঁ। আচ্ছা ভদ্রমহিলার কোন শত্রু বা ঐ ধরনের কিছু ছিল?

শত্রু! প্রশ্ন করলো সতীন্দ্র।

হ্যাঁ—শত্রু, বললেন নন্দী, যে হয়ত সুযোগের অপেক্ষায় ছিল—আজ সুযোগ পেয়ে—থাক সে কথা, আচ্ছা একটা কথা বলুন তো—আজ সারাটা দিন আপনাদের আশেপাশে কাউকে ঘুর ঘুর করতে দেখেছেন—

মণিময় বললে, না—তাছাড়া আমরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। কোন দিকে তাকাবার আমরা ফুরসৎ পাইনি—

কোয়াইট ন্যাচারাল—তবু—

না—অফিসার, মণিময় আবার বললে—সে-রকম কিছুই আমাদের কারো চোখে পড়েনি—

আপনারা কাউকে সন্দেহ করেন এ ব্যাপারে? আবার নন্দীর প্রশ্ন।

না—এবার সুহাস মণিময় একত্রেই জবাব দিল।

আপনাদের সঙ্গে তো গাড়ি আছে?

হ্যাঁ, বিদ্যুতের গাড়ি আছে, মণিময় বললে।

বিদ্যুৎবাবু কে?

বিদ্যুৎ এগিয়ে এলো। বললে—আমিই বিদ্যুৎ সরকার।

আপনিই একা তাহলে গাড়িতে এসেছিলেন আজ? আর বাকী সব—

মণিময় জবাব দিল—ট্রামে বাসে।

বিদ্যুৎবাবু—

বলুন—

আপনাদের সকলকে একবার থানায় যেতে হবে—সুশীল নন্দী বললেন।

থানায় কেন? সুহাস বলল।

আপনাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা করে এক-একটা জবানবন্দি—আই মীন স্টেটমেন্ট চাই—

মণিময় বললে, বেশ, যাবো আমরা—

এক কাজ করুন, বিদ্যুৎবাবুর গাড়িতে যাঁরা পারেন যান, বাদ বাকি সব জীপে উঠুন।

॥ ছয় ॥

সে রাত্রে ছাড়া পেতে পেতে প্রায় রাত সোয়া এগারোটা বেজে গিয়েছিল সকলের। শ্রান্ত—অবসন্ন হয়ে ফিরেছিল যে যার গৃহে। ফিরতে ওরা সকলে পারত না হয়ত, যদি থানার একজন সেপাই কলকাতার দিকে ফিরতি একটা খালি ট্যাক্সি থামিয়ে ওদের ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে না দিত।

থানা-অফিসার সুশীল নন্দী একটা কথা বিশেষ করে ওদের বলে দিয়েছিলেন, কলকাতা থেকে কেউ যেন অন্যত্র কোথাও না যায়—তাঁকে না জানিয়ে।

মিত্রানীর প্রৌঢ় বাপ অবিনাশ ঘোষালকে তাঁর কন্যার মৃত্যু-সংবাদটা ওরা কেউই দিতে সম্মত হয়নি—তাই অগত্যা সুশীল নন্দী স্থির করেছিলেন পরের দিন সকালে তিনিই অবিনাশ ঘোষালকে সংবাদটা দেবেন। কিন্তু তা আর তাঁকে দিতে হয়নি—তার আগেই অর্থাৎ সেই রাত্রেই—

রাত একটা নাগাদ বিদ্যুতের কাছ থেকেই সংবাদটা পেয়েছিল মিত্রানীর দাদা ডাঃ প্রণবেশ ঘোষাল।

কি একটা সরকারী কাজে প্রণবেশ কলকাতায় একদিনের জন্য এসেছিল।

রাত্রি নয়টা নাগাদও যখন মিত্রানী ফিরে এলো না—অবিনাশ ঘোষাল ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন, প্রণব, খুকী তো এখনো ফিরল না—বলেছিল

pathagar.net

সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসবে—

প্রণবেশ বলেছিল, বন্ধুবান্ধবরা মিলে বটানিকসে হৈ চৈ করতে গিয়েছে—একা তো নয়—ভাবছেন কেন?

রাত ন'টা বাজে, তুমি বরং এক কাজ করো—বিদ্যুতের বাড়িতে একটা ফোন কর—

প্রণবেশ ফোন করে জানলো, তখনও বিদ্যুৎ ফেরেনি—

তারপর রাত সাড়ে নয়টা, পৌনে দশটা—পৌনে এগারোটা—পনেরো মিনিট অন্তর-অন্তর ফোন করে গিয়েছে প্রণবেশ।

কিন্তু ঐ একই জবাব—বিদ্যুৎ এখনো ফেরেনি—

শেষটায় কিন্তু প্রণবেশ নিজেও বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। এত রাত হয়ে গেল, এখনো না ফেরার কারণটা কি? পথে কোন দুর্ঘটনা কিছু ঘটেনি তো? ঘটাটা এমন কিছু আশ্চর্যও নয়। সে একবার ঘর একবার বাইরে করতে থাকে।

সাড়ে এগারোটা—বারোটা—সাড়ে বারোটা—না তখনো ফেরেনি বিদ্যুৎ। অবশেষে প্রণবেশই লালবাজারে ফোন করে—তারা কোন সংবাদ জানে না—তারা বলে শিবপুর থানায় ফোন করতে।

রাত তখন একটা প্রায়।

হঠাৎ ঐসময় ফোন ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠলো।

হ্যালো—ডাঃ প্রণবেশ ঘোষাল—

প্রণবেশবাবু—আপনি তো মিত্রানীর দাদা?

হ্যাঁ—

শুনুন—একটা স্যাড নিউজ আছে।

স্যাড নিউজ—কি?

মিত্রানী ইজ ডেড্।

কি—কি বললেন—চিৎকার করে ওঠে প্রণবেশ—প্রৌঢ় অবিনাশ ঘোষাল ঐ সময় পুত্রের পাশেই দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ—মিত্রানীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে—

না, না—এ আপনি কি বলছেন—মিতু—মিতু। কিন্তু কে—কে আপনি! কি আপনার নাম?

বিদ্যুৎ সরকার—

তারপরই অপর প্রান্তে একটা ঠং করে শব্দ ও ফোনটা ডিসকানেকটেড হয়ে গেল।

হ্যালো—হ্যালো—অধীরভাবে ট্যাপ করে প্রণবেশ—কিন্তু না, অন্য প্রান্ত ফোন ছেড়ে দিয়েছে ততক্ষণে।

কি! কি হয়েছে প্রণব! অবিনাশ ঘোষাল আশঙ্কায় যেন একেবারে ভেঙে পড়ল।

বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎ সরকার কে বাবা? প্রণবেশ বলে উঠল।

মিতুর ক্লাস-ফ্রেণ্ড—

প্রণবেশ তখুনি আবার ফোন করল! কিছুক্ষণ রিং হবার পর অপর প্রান্ত থেকে সাড়া এলো—কে!

BANGLADARPAN.net

বিদ্যুৎ সরকার আছেন?

কথা বলছি—

আমি মিত্রানীর দাদা কথা বলছি—একটু আগে আপনি ফোন করেছিলেন—

ফোন করেছিলাম, আমি!—বিস্ময় বিদ্যুতের কণ্ঠে।

হ্যাঁ—একটু আগে আপনিই তো আমাদের বাড়িতে ফোন করে বললেন—

আমি তো এইমাত্র—নট্ ইভ্‌ন্ টু মিনিটস—ফিরছি—

আপনি আমাকে ফোন করেননি?

না—

মিত্রানী—মিত্রানীর মানে আমার বোন মিত্রানীর কোন খবর কিছু জানেন? আপনারা তো একসঙ্গে আজ সকালে বটানিকসে গিয়েছিলেন?

কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে কোন সাড়া এলো না।

বিদ্যুৎবাবু—শুনছেন—বিদ্যুৎবাবু—হ্যালো—হ্যালো—

কোনো সাড়া নেই—অথচ প্রণবেশ বুঝতে পারছে অপর প্রান্ত তখনো ফোন ছেড়ে দেয়নি!

কি হলো প্রণবেশ? অবিনাশ ঘোষাল আবার প্রশ্ন করেন অধৈর্য কণ্ঠে।

প্রণবেশ ফোনটা নামিয়ে আবার ডায়েল করে—রিং হয়ে যাচ্ছে—কেউ ধরছে না।

প্রণবেশ শেষ পর্যন্ত ফোনটা নামিয়ে রাখল।

একটু আগে কে ফোন করেছিল প্রণব?

বিদ্যুৎ সরকার—অথচ বিদ্যুৎ সরকার এইমাত্র বললে সে ফোন করেনি—এই নাকি ফিরছে—

মিতুর খবর—

সে কিছু বলল না—অথচ—আমি আসছি বাবা—প্রণবেশ কোনমতে শার্টটা গায়ে চাপিয়ে যেন ঝড়ের মত বের হয়ে গেল।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন অবিনাশ ঘোষাল।

কালীঘাট থেকে শ্যামবাজার অনেকটা পথ—প্রণবেশ রাস্তায় বের হয়ে দেখলো—জনহীন রাস্তা খাঁ খাঁ করছে—কোনরকম যানবাহনের চিহ্নমাত্রও নেই—যতদূর দৃষ্টি চলে রাস্তার এ-প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। এত রাত্রে যে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না তা জানত প্রণবেশ। একটু এগিয়ে গেলেই হালদার-পাড়ায় একটা ট্যাক্সির আড্ডা আছে—অনেক বছর পাঞ্জাবীদের ঐ পাড়ায় বসবাস করার জন্য প্রণবেশের সেটা জানা ছিল, আর বুড়ো ট্যাক্সি ড্রাইভার কর্তার সিংকে চিনতো প্রণবেশ—প্রণবেশ হাঁটতে লাগলো।

প্রণবেশের ভাগ্য ভাল, কর্তার সিং দূরপাল্লার এক সওয়ারীকে মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে পৌঁছে দিয়ে আস্তানায় ফিরে খাটিয়া পেতে শয়নের উদ্যোগ করছিল।

প্রণবেশ এসে সামনে দাঁড়াল। সর্দারজী!

প্রণববাবু—ইতনি রাত মে কেয়া বাৎ হ্যায়—

বড্ড বিপদে পড়েছি সর্দারজী, একবার এখুনি শ্যামবাজার যেতে হবে—অথচ কোন ট্যাক্সি এত রাত্রে পাচ্ছি না—

ঠিক হ্যায়, চলিয়ে—

শ্যামবাজারে অ্যাডভোকেট সমর সরকারের বাড়িটা খুঁজে বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি প্রণবেশের। বিদ্যুৎ তখনো জেগেই ছিল।

ফোনে প্রণবেশের প্রশ্নের জবাবে সে কোন কথা বলতে পারেনি। কেমন করে দেবে সে অত বড় দুঃসংবাদটা—

গলা যেন কেউ তার চেপে ধরেছিল। দোতলায় নিজের ঘরের মধ্যে একটা ইজি-চেয়ারের উপরে বিদ্যুৎ জেগে বসে ছিল। গাড়ির শব্দে জানলায় উঁকি দিয়ে দেখতে পেল তাদের বাড়ির সামনে ট্যাক্সিটা থেমেছে—

কে একজন তাদের সদরে দাঁড়িয়ে।

দুর্ঘটনার সংবাদটা ছোট্ট করে সংবাদপত্রে তৃতীয় পৃষ্ঠায় নীচের দিকে প্রকাশিত হয়েছিল ঘটনার পরের পরের দিন।

বটানিক্যাল গার্ডেনে গত পরশু পিকনিক করতে গিয়ে দলের মধ্যে একটি তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যু! মৃত্যু ঘটেছে রুমালের ফাঁসে। উক্ত তরুণীর নাম মিত্রানী ঘোষাল। পরে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

কিরীটী সকালবেলা তৃতীয় কাপ চায়ের সঙ্গে ঐ দিনকার সংবাদপত্রের পাতা ওলটাচ্ছিল—অন্যমনস্কভাবে—তরুণীর বাড়ি যে কালীঘাট অঞ্চলেই কিরীটা বুঝতে পারেনি এবং শুধু তাই নয়—তারই পরিচিত মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে ঐ মিত্রানী তাও বুঝতে পারেনি। পারবার কথাও নয়—সংবাদটার মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল না, যেটা তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। যেমন প্রত্যহ সংবাদটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে তেমনি পড়তে থাকে কিরীটী।

ঘণ্টাখানেক বাদে কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢুকলো,—শুনছো, তোমার মাস্টারমশাই—

কার কথা বলছো? কিরীটী স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল।

কালীঘাটে তোমার সেই পুরনো মাস্টারমশাই থাকেন না!

অবিনাশবাবু—

হ্যাঁ—তাঁর মেয়ে নাকি গত পরশু বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বটানিক্যাল গার্ডেনে পিকনিক করতে গিয়েছিল—

সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী সজাগ হয়ে বসে, কি হয়েছে তার?

গলায় রুমালের ফাঁস দিয়ে কে যেন তাকে হত্যা করেছে—

তুমি—তুমি কার কাছে শুনলে?

এই তো একটু আগে আমাদের পাশের বাড়ির যশোদাবাবু বলছিলেন—যশোদাবাবু আর অবিনাশবাবু তো শালা-ভগ্নীপতি।

কিরীটী তাড়াতাড়ি আবার সংবাদপত্রের পাতা উল্টে সংবাদটা খুঁজে বের করে—বার দুই ভাল করে সংবাদটা পড়লো, তারপর উঠে দাঁড়াল।

একটু বেরুচ্ছি কৃষ্ণা—

এই সকালে আবার কোথায় বেরুবে! সকালে তো হেঁটে এসেছো—

একবার মাস্টারমশাইয়ের ওখানে যাবো।

অবিনাশবাবুর ওখানে?

হ্যাঁ—ব্যাপারটা আমাকে একটু জানতে হচ্ছে—

অবিনাশ ঘোষালের সঙ্গে কিরীটীর পরিচয় সেই যখন সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে—ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র—অবিনাশবাবু সেই সময়েই স্কুলে সেকেন্ড টীচার হয়ে আসেন—অঙ্ক করাতেন ক্লাসে—পরে, বৎসর চারেক পরে, ঐ স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক হন।

সবে তখন এম. এস-সি. পাস করে অবিনাশ ঘোষাল স্কুলের শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে এসেছিলেন—

কতই বা বয়স তখন তাঁর, বছর আটাশ-ঊনত্রিশ হবে।

মাত্র মাস আষ্টেক পড়েছিল কিরীটী অবিনাশবাবুর কাছে—গণিতশাস্ত্রের প্রতি তিনিই কিরীটীর মনের মধ্যে একটা আকর্ষণ ও প্রীতি জাগিয়ে তোলেন।

যার ফলে শিক্ষা সমাপ্ত করেছিল কিরীটী পরবর্তীকালে রসায়ন-শাস্ত্রে শেষ ডিগ্রী নিয়ে এবং যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক সেদিন শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে গড়ে উঠেছিল সেটা সেদিন পর্যন্তও অক্ষুণ্ণ ছিল। সময় পেলেই কিরীটী যেতো অবিনাশবাবুর ওখানে। সহজ সরল আত্মভোলা মানুষটিকে ওর বড় ভাল লাগে।

অবিনাশবাবু খুব খুশি হতেন কিরীটীকে দেখলে।

এসো—এসো, কিরীটী রায় যে—

পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে কিরীটী বলেছে, ভাল আছেন তো মাস্টারমশাই?

হ্যাঁ—বাবা, ভালই তো আছি। তার পরই বলতেন, তোমার নতুন রহস্য উদ্‌ঘাটনের কাহিনী কিছু শোনাও।

কিরীটী হাসতে হাসতে বলতো, আমার চাইতে সুব্রতই ভাল বলতে পারে মাস্টারমশাই—একদিন তাকে নিয়ে আসবো, শুনবেন।

মধ্যে মধ্যে সুব্রতও কিরীটীর সঙ্গে আসতো—সে তখন বেশ জমিয়ে বসে কিরীটীকাহিনী শোনাত।

কি শ্রদ্ধা—কি আগ্রহ নিয়েই যে শুনতেন অবিনাশ ঘোষাল সেসব কাহিনী—শোনা নয় যেন গিলতেন।

একদিন বলেছিলেন সুব্রতকে অবিনাশ ঘোষাল—বুঝলে সুব্রত, প্রবলেম সলভ্ করবার অদ্ভুত এক ন্যাক ছিল কিরীটীর—কঠিন কঠিন প্রবলেম ও অনায়াসেই সলভ্ করে দিত—রহস্য উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারেও তার সেই প্রতিভার স্ফুরণ—

কিরীটীর প্রশংসায় যেন একেবারে শিশুর মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন।

মিত্রানীকে কিরীটী কয়েকবার দেখেছে, বেশ স্থির বুদ্ধিমতী মেয়েটি, মনে হয়েছে।

কিরীটী যখন অবিনাশ ঘোষালের ওখানে পৌঁছাল বেলা তখন প্রায় সাড়ে আটটা হবে। ইতিমধ্যে রৌদ্রের তাপ বেড়েছে—আর একটা রৌদ্রতাপ-দগ্ধ দিন।

প্রথমেই প্রণবেশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আকস্মিক বিপর্যয়ে প্রণবেশ আর কর্মস্থলে ফিরে যায়নি—ক'টা দিন ছুটি নিয়েছে।

কিরীটীর সঙ্গে প্রণবেশেরও পরিচয় ছিল।

এই যে কিরীটীবাবু, আপনার কথাই ভাবছিলাম, প্রণবেশ বললে।

মাস্টারমশাই কোথায় প্রণবেশবাবু? কিরীটী শুধাল।

বাবা উপরের ঘরে—আমাদের বাড়িতে গত পরশু একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে কিরীটীবাবু—আমার বোন মিতু—

আমি জানি—

জানেন! কার কাছে শুনলেন—

সংবাদটা আজকের সংবাদপত্রেও ছাপা হয়েছে, তাছাড়া আমার স্ত্রীকে আপনার মামা যশোদাবাবু—

কি করে যে হলো এখনো যেন কিছুই মাথায় আসছে না। কিরীটীবাবু, মিতুর মত মেয়েকে—কথাটা আর শেষ করতে পারে না প্রণবেশ—তার গলার স্বর যেন বুজে আসে —চোখের কোণ দুটো জলে ভরে ওঠে।

সমস্ত ব্যাপারটা আপনি বোধ হয় জানেন?

হ্যাঁ—মোটামুটি শুনেছি ওর বন্ধু বিদ্যুৎ সরকারের মুখে আর বাকিটা শিবপুর থানার ও. সি. সুশীল নন্দীর মুখ থেকে গতকাল দ্বিপ্রহরে। বাবার সঙ্গে দেখা করবেন?

হ্যাঁ—

কেমন যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন বাবা। বড্ড ভালবাসতেন মিতুকে—

চলুন মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।

দুজনে দোতলায় এলো।

বাড়িতে সর্বক্ষণ লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকেন অবিনাশ ঘোষাল—একটা চৌকির উপরে মাদুর বিছানো—একটা বালিশ শিয়রের দিকে—গ্রীষ্মকালে ঐ মাদুর আর বালিশটিই তাঁর শয্যা—আর শীতকালে একটি চাদর।

চারিদিকে ছোট বড় আলমারীতে একেবারে ঠাসা—গণিতশাস্ত্রের বইতে—চৌকির অর্ধেকটায়ও খাতাপত্র বই সব ছড়ানো—

ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন অবিনাশ ঘোষাল। পরনে একখানি মোটা খদ্দরের ধুতি—বক্ষে মোটা উপবীত।

মাথাভর্তি কাঁচাপাকা চুল অবিন্যস্ত। একমুখ কাঁচাপাকা দাড়িও।

চোখে মোটা কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমে পুরু লেন্সের চশমা। পায়চারি করতে করতে মধ্যে মধ্যে অবিনাশ ঘোষাল বাঁ হাতে আঙুলগুলো দিয়ে অবিন্যস্ত চুলগুলো যেন টানছেন।

ওরা যে দুজন ঘরে ঢুকেছে সেটা টেরও পান না অবিনাশ ঘোষাল। একমাত্র আদরিণী কন্যার আকস্মিক মৃত্যু যেন প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে মানুষটার ওপরে।

মাস্টারমশাই।

পায়চারি থামিয়ে ফিরে তাকালেন অবিনাশ ঘোষাল। কে?

মাস্টারমশাই আমি কিরীটী।

ওঃ কিরীটী—ও, তুমি এসেছো। জানো, জানো কিরীটী, আমার মিতু মা—

সব শুনেছি মাস্টারমশাই—

BanglaBook.org

কিন্তু কেন এমন হলো বল তো! আমার মিতু মাকে কে এমন করে খুন করলো! তুমি তো জানো, তুমি তো দেখেছো আমার মিতু মাকে—এত নিরীহ, এত সরল, এত পবিত্র—আচ্ছা কিরীটী, তুমি তো অনেক কঠিন রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছো—তুমি—তুমি পারবে না কিরীটী তাকে খুঁজে বের করতে, যে আমার মিতু মাকে—

পারবো মাস্টারমশাই—

পারবে!

হ্যাঁ—আপনার আশীর্বাদে নিশ্চয়ই পারবো।

জানি, জানি, তুমি পারবে—কেউ যদি তাকে খুঁজে বের করতে পারে সে একমাত্র তুমিই পারবে—আমি, তাকে শুধু একটা প্রশ্ন করবো—কেন, কি জন্য সে আমার মিতু মাকে এমন করে খুন করলো। একবারও কি হাত দুটো তার কাঁপলো না! অমন করে শ্বাসরোধ করে—না জানি মা আমার কত কষ্ট পেয়েছে। উঃ, কি নৃশংস! আমার কি মনে হয় জানো কিরীটী—

বলুন—

সেদিন যারা গার্ডেনে পিকনিকে উপস্থিত ছিল সেই বন্ধুদের মধ্যেই কেউ একজন—

বাধা দিল প্রণবেশ। বললে, না, না—এ আপনি কি বলছেন বাবা, ওদের পরস্পরের মধ্যে কত দিনের বন্ধুত্ব—সেই কলেজ লাইফ থেকে। তা ছাড়া ওদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা—

প্রণবেশবাবু—কিরীটী বলে, মাস্টারমশাইয়ের কথাটা হয়তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একজনকে দেখে বা কিছু সময়ের জন্য মিশে তার ভিতরের কতটুকুই বা আমরা জানতে পারি, তার সত্যিকারের বা আসল চেহারার কতটুকুই ব', আমাদের চোখের সামনে ধরা দেয়। তাছাড়া একটা কথা ভুলে যাবেন না, ওদের সকলেরই বয়স অল্প—ঐ বয়সে সাধারণত মানুষ যতটা সেন্টিমেন্টাল—স্পর্শকাতর ও ভাবপ্রবণ হয়—বয়েসটা একটু বেশী হলে ততটা হয়ত হয় না। ইমোশান বা ঝোঁকের মাথায় কোন বিশেষ এক মুহূর্তে এমন অনেক কিছুই হয়ত তারা করে বা করতে পারে যেটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ থিতিয়ে আসে।

কিরীটী—

বলুন মাস্টারমশাই। অবিনাশ ঘোষালের ডাকে ফিরে তাকিয়ে কিরীটী সাড়া দিল।

দোষ হয়ত আমারও আছে, সন্তানের প্রতি বাপের কর্তব্য পালনের ত্রুটি আমারও আছে। মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে বোধ হয় এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটতো না—

মাস্টারমশাই, একটা কথা বলবো।

বলো।

মিত্রানী কাউকে ভালবাসতো কিনা আপনি জানেন?

তুমি তো জানো কিরীটী, আমার সন্তানদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় কখনো আমি বাধা দিইনি—আমার কাছে সেটা অপরাধ বলেই বরাবর মনে হয়েছে—তাছাড়া আমাদের বাপ ও মেয়ের মধ্যে সব কথাই খোলাখুলি হতো—সে রকম কিছু থাকলে বোধ হয় আমি জানতাম।

আর একটা কথা মাস্টারমশাই, কখনো তার বিয়ের চেষ্টা করেছেন বা সে সম্পর্কে তার সঙ্গে কোন আলোচনা করেছেন?

করেছি বৈকি। কিছুদিন আগেও বিয়ের কথাটা তার কাছে তুলেছিলাম, সে তখন বলেছিল—

কি বলেছিল মিত্রানী?

সময় হলেই সে আমাকে জানাবে।

কি জানাবে?

তা তো কিছু বলেনি, ঐটুকুই কেবল বলেছিল আর আমিও কিছু বলিনি।

কিরীটী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার মৃদু কণ্ঠে বললে, আচ্ছা তার পুরুষ বন্ধুদের মধ্যে কারোর প্রতি—

যতদূর জানি—বন্ধুদের মধ্যে সে সুহাস ছেলেটিকে একটু বেশী বোধ হয় পছন্দ করতো।

সুহাস!

ঐ যে সুহাস মিত্র। ওর কলেজের সহপাঠী। ছেলেটি শুনেছি—লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিল বরাবরই—বি.এ.-তে ইকনমিকসে অনার্স পেয়েও আর নাকি পড়েনি, একটা বড় ফার্মে চাকরি করছে। মধ্যে মধ্যে আসতোও এখানে—বেশ স্মার্ট ও ভদ্র ছেলেটি, মনে হতো মিতু যেন সুহাসকে একটু বেশী পছন্দ করতো।

আর কে আসতো এখানে?

বিদ্যুৎ আসতো।

আর কেউ?

সতীন্দ্র আর সজলও কয়েকবার এসেছে। তবে ইদানীং আর সজলকে এখানে গত দু'বৎসর হতে আসতে দেখিনি—তবে দিন চারেক আগে হঠাৎ এসেছিল।

অবিনাশ ঘোষালের দু'চোখের কোণ বেয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

মাস্টারমশাই, যা হয়ে গিয়েছে তা তো আর ফিরবে না। আপনি যদি এভাবে ভেঙে পড়েন—

না, না—আমার জন্য ভেবো না কিরীটী, আমি ঠিক আছি—ঠিক আছি, বলতে বলতে অবিনাশ ঘোষাল চোখের জল মুছে নিলেন।

অতঃপর কিরীটী সেদিনকার মত প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিল।

নীচে এসে প্রণবেশের সঙ্গে তারপর অনেকক্ষণ কথা বলেছিল এবং প্রণবেশ বিদ্যুতের মুখে ও থানায় সুশীল নন্দীর কাছে যা শুনেছিল সব বললে।

প্রণবেশই একসময় অতঃপর প্রশ্ন করে, আচ্ছা কিরীটীবাবু, আপনারও কি সত্যি মনে হয় যে—

কি?

ঐ মানে মিতুর বন্ধুদের মধ্যে কেউ একজন—

নিশ্চিত হয়ে এই মুহূর্তে তা বলতে পারি না, তবে এটা ঠিক, সমস্ত ঘটনা শোনার পর যা মনে হয়—

pathagar.net

কি! কি মনে হয় আপনার?

কিরীটী নিজেকে যেন হঠাৎ সামলে নিল। বললে, কি জানেন প্রণবেশবাবু—ইট ইজ টু আরলি টু সে এনিথিং। আচ্ছা আমি এখন চলি—মাস্টারমশাইয়ের দিকে একটু নজর রাখবেন—মিত্রানীর মৃত্যুতে একটু বেশী রকমই আঘাত পেয়েছেন বলে যেন মনে হলো—

ভাবছি কিছুদিনের জন্য বাবাকে আমি সঙ্গেই নিয়ে যাবো।

॥ সাত ॥

ঐদিনই দ্বিপ্রহরে লালবাজারে গিয়ে কিরীটী পুলিস কমিশনার মিঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করলো। লম্বা-চওড়া সুগঠিত চেহারা। অফিসেই ছিলেন রায়চৌধুরী, কিরীটী স্লিপ পাঠাতেই ঘরের মধ্যে ডাকলেন।

দুজনার মধ্যে পরিচয় ছিল। রায়চৌধুরী কিরীটীকে শ্রদ্ধা করতেন।

আসুন—আসুন, বসুন রায়সাহেব—হঠাৎ এখানে কি মনে করে!

কিরীটী বসে মিত্রানীর হত্যার ব্যাপারটা বললে।

সব শুনে মিঃ রায়চৌধুরী বললেন, ব্যাপারটা আমারও কানে এসেছে—আজই সকালে—

কি রকম!

হোমিসাইড্যাল স্কোয়াডের জ্যোতিভূষণ আমাকে বলেছিলেন—তাঁর হাতে ইনভেসটিগেশনের ভার পড়েছে। আপনি মনে হচ্ছে বেশ একটু ইন্টারেস্টেড ব্যাপারটায়, রায়সাহেব!

একটু আগেই তো বললাম মিঃ রায়চৌধুরী, মিত্রানী, মানে যে মেয়েটিকে খুন করা হয়েছে, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে—

ঠিক আছে, আমি বরং জ্যোতিবাবুকে ডাকছি—তাঁর কাছেই আপনি সব ডিটেল্‌সে পাবেন।

জ্যোতিভূষণ চাকী—বেশ একজন কর্মঠ—উৎসাহী অফিসার। বয়েস খুব বেশী নয়, ত্রিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে—বলিষ্ঠ দোহারা চেহারা। জ্যোতিভূষণের সরেজমিন তদন্তের রিপোর্ট থেকেই সেদিনকার দুর্ঘটনার অনেক কিছুই জানতে পারল কিরীটী। ব্যাপারটা ঘটেছে ঐদিন বিকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে কোন এক সময়ে।

মিনিট পনেরো-কুড়ির জন্য একটা প্রচণ্ড কালবৈশাখীর ঝড় ও ধুলোর ঘূর্ণি উঠেছিল। সব অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। সেই ঝড় ও ধুলোর ঘূর্ণির মধ্যে বন্ধু ও বান্ধবীরা সব চারদিকে অতর্কিতে ছিটকে পড়েছিল। দিনটি ছিল শনিবার।

কালবৈশাখীর তাণ্ডব থেমে যাওয়ার পর প্রত্যেকে প্রত্যেককে খুঁজতে শুরু করে, একে অন্যর দেখা পায় কিন্তু দুজনের দেখা পাওয়া যায় না। মিত্রানী ঘোষাল আর সুহাস মিত্র। পরের ব্যাপারটা প্রণবেশের মুখেই শুনেছিল কিরীটী। প্রণবেশ যেমনটি বলেছিল, জ্যোতিভূষণের রিপোর্টেও তাই বলে। তারপর শিবপুর থানা অফিসার সুশীল নন্দীর রিপোর্ট।

পরের দিন সকালে হোমিসাইড্যাল স্কোয়াডের সঙ্গে সুশীল নন্দী স্পটে যান। স্পটে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে ওঁরা কয়েকটি জিনিস পান।

ঠিক যেখানে মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হয়েছিল, তার হাত পাঁচেক দূরে একটা ঝোপের ধারে একটা বেতের টুপি—কয়েকটা পোড়া চারমিনার সিগারেটের শেষাংশ—এবং মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল গতরাত্রে, তার আশেপাশে কিছু রাঙা কাচের চুড়ির টুকরো—আরো কিছু দূরে একটা বায়নাকুলার সুশীল নন্দী পেয়েছেন।

সত্যি কথা বলতে কি, কিরীটীর আগমনে সুশীল নন্দী যেন মনের মধ্যে একটা উত্তেজনাই বোধ করেন। তাই তিনি বিশেষ উৎসাহ নিয়েই কিরীটীকে তাঁর অনুসন্ধানের কাহিনী আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে একে একে ঐ উপরিউক্ত জিনিসগুলো দেখালেন।

বললেন—মিঃ রায়, এই জিনিসগুলো আমি অকুস্থানে পরের দিন সকালে অনুসন্ধানে গিয়ে কুড়িয়ে পেয়েছি—

কিরীটী বললে—ভালই করেছেন মিঃ নন্দী, এগুলো হয়তো মিত্রানীর হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটনে যথেষ্ট সাহায্য করবে। ভাল কথা, ওদের আলাদা ভাবে জবানবন্দি, মানে ওদের কোন স্টেটমেন্ট নেননি?

নিয়েছি বৈকি। তবে সবাই প্রায় এক কথাই বলেছে—এবং বিশেষ কোন তাৎপর্য আমি কারোর স্টেটমেন্টেই খুঁজে পাইনি। এই দেখুন না, পর পর প্রত্যেকের স্টেটমেন্টই আমি লিখে রেখেছি ও পরে ওদের দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছি—বলতে বলতে লম্বা খাতাটা এগিয়ে দিলেন সুশীল নন্দী কিরীটীর দিকে।

কিরীটী স্টেটমেন্টগুলো পড়তে শুরু করল।

(১) প্রথমেই বিদ্যুৎ সরকার! বাপ অ্যাডভোকেট সমর সরকার—বনেদী ধনী পরিবারের ছেলে। বি. এ. পাস করবার পর বাপের এক বন্ধু নামী চিত্র-পরিচালকের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে গত কয়েক বছর কাজ করছে। সুগঠিত ও স্বাস্থ্যবান—মিত্রানীর সঙ্গে পরিচয় অনেক দিনের—একই কলেজে তিন বৎসর ওরা পড়েছে। মধ্যে মধ্যে মিত্রানীর ওখানে যেতো—মিত্রানীও আসত—পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে টেলিফোনেও কথাবার্তা হতো মধ্যে মধ্যে। ঝড় উঠবার পর কিছুক্ষণের জন্য দল থেকে ছিটকে পড়ে। তারপর অন্যান্য বন্ধুদের সাহায্যে যেভাবে মিত্রানীকে খুঁজে পায় তারই বর্ণনা। অবিবাহিত।

(২) সুহাস মিত্র—নিয়মিত ব্যায়াম করার ফলে সুগঠিত চেহারা, কলেজ জীবনে শুধুই যে সে একজন মেধাবী ছাত্র হিসাবেই পরিচিত ছিল তাই নয়—ভাল অ্যাথলেটও ছিল। প্রাক্তন কলেজ ব্লু। বাড়ির অবস্থা তেমন ভাল নয়, তাছাড়া বাপ পঙ্গু—বিবাহযোগ্যা দুটি বোন। তাই বি. এ. পাস করবার পরই একটা মার্চেন্ট অফিসে চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছে। তারও স্টেটমেন্ট—অনেকটা বিদ্যুৎ সরকারের মতই—অকস্মাৎ ঝড় ওঠায় দল থেকে ছিটকে পড়ে ধুলোর অন্ধকারে কিছু চোখে দেখতে পাচ্ছিল না—দু'পা কোনমতে এগোয় তো পাঁচ-পা পিছিয়ে আসে এলোমেলো ঝড়ো বাতাসে—তারপরই হঠাৎ একটা ভারী গাছের ডাল মাথার উপরে ভেঙে পড়ে। মাথায় আঘাত লেগে অচৈতন্য হয়ে যায়, বন্ধুরা এসে তাকে গাছের ডাল সরিয়ে উদ্ধার করে! অন্যান্য বন্ধু ও মিত্রানীর সঙ্গে বিশেষ একটা দেখাসাক্ষাৎ হতো না—অবিবাহিত।

(৩) মণিময় দত্ত—বি. এ. পাস করে এম. এ. এক বছর পড়েছিল। ঐ সময় তার মামার সুপারিশে খিদিরপুর ডকে একটা ভাল চাকরি পেয়ে গত কয়েক বছর ধরে সেখানেই চাকরি করছে। রোগা পাতলা চেহারা—হঠাৎ ঝড় ওঠায় দল থেকে ছিটকে পড়ে। তারপর ঝড় থামলে প্রথমেই সে বিদ্যুৎকে দেখতে পায়—তখন দুজনে খুঁজতে খুঁজতে অন্য সকলের দেখা পায়—সুহাস আর মিত্রানী বাদে—তারপর তার স্টেটমেন্ট বিদ্যুতেরই অনুরূপ। তারও অন্যান্য বন্ধুদের ও মিত্রানীর সঙ্গে বিশেষ একটা দেখাসাক্ষাৎ হতো না। বিবাহিত। একটা সন্তানের বাপ।

(৪) ক্ষিতীশ চাকী—বি. এ. পরীক্ষা দুবার দিয়ে পাস না করতে পেরে পড়া ছেড়ে দেয়—কোন বিশেষ রাজনৈতিক পার্টির সভ্য—সক্রিয় সভ্য। পার্টির কাজকর্ম নিয়েই সে সর্বদা ব্যস্ত থাকে—বাকী স্টেটমেন্ট তার অন্যান্যদেরই অনুরূপ। বিবাহিত।

(৫) অমিয় রায়—বি. এ. পাস করবার পর ওকালতি পাস করে আলিপুর কোর্টে নাম লিখিয়ে প্র্যাকটিস করছে বাপের জুনিয়ার হয়ে। সেও ঘটনার যা স্টেটমেন্ট দিয়েছে অন্যান্যদেরই অনুরূপ। বন্ধুদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তার দেখা হতো। বিবাহিত—গত ফাল্গুনে বিবাহ করেছে।

(৬) সতীন্দ্র সান্যাল—আবলুশ কাঠের মত গাত্রবর্ণ। গোলগাল চেহারা। বাপ কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার—এবং বেশীরভাগই দেশে-বিদেশে চাকরির ব্যাপারে ঘুরতে হয় বলে—ওরা দুই বোন, এক ভাই ও মা কলকাতাতেই থাকেন। ফুড ডিপার্টমেন্টে ভাল চাকরি করে। অবিবাহিত—বাকী স্টেটমেন্ট অন্যান্যদেরই অনুরূপ। বিবাহ হয়নি বটে এখনো, তবে স্থির হয়ে গিয়েছে।

(৭) কাজল বোস। দেখতে কালো। রোগা। বি. এ., বি. টি. পাস করে একটা স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড-মিসট্রেস—বাপ নেই—মামা-মামীর কাছে মানুষ—স্কুল বোর্ডিংয়েই থাকে আগরপাড়ায়। বিবাহ হয়নি। কলকাতার বাইরে থাকায় বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বিশেষ একটা দেখা হতো না—কদাচিৎ কখনো কালে-ভদ্রে, একমাত্র সুহাস মিত্র ছাড়া। সুহাসের সঙ্গে প্রায়ই তার দেখা হয়—বাকী ঘটনার স্টেটমেন্ট অন্য সকলের মতই।

(৮) পাপিয়া চক্রবর্তী। বি. এ. পাস এবং ভাল এ্যাথলেট। জীবনে অনেক কাপ মেডেল শীল্ড পেয়েছে। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, অত্যন্ত স্মার্ট চেহারা, স্লিম ফিগার, কলকাতার একটা বড় অফিসে 'রিসেপশনিস্ট'—ভাল মাইনে। অবিবাহিতা। সকলের সঙ্গেই মধ্যে মধ্যে দেখা হতো, বিশেষ করে মিত্রানী ও সুহাস মিত্রের সঙ্গে। তার বাকী স্টেটমেন্ট অন্যান্যদেরই অনুরূপ।

কিরীটী সকলেরই স্টেটমেন্ট বা জবানবন্দিগুলো পড়লো। তারপর একসময় সুশীল নন্দীর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বললে, এদের মধ্যে পাঁচজনের স্টেটমেন্টের কোন গুরুত্ব নেই—

সুশীল নন্দী বললেন, কার কার কথা বলছেন? মণিময়, ক্ষিতীশ, অমিয়, সতীন্দ্র আর পাপিয়া—

হ্যাঁ, মণিময় দত্ত, ক্ষিতীশ চাকী, অমিয় রায়, সতীন্দ্র সান্যাল আর পাপিয়া চক্রবর্তী। —কিরীটী বললে।

কেন? প্রশ্নটা করে তাকালেন সুশীল নন্দী কিরীটীর মুখের দিকে।

কারণ, আমার মনে হয়—কিরীটী ধীরে ধীরে বলতে লাগল, যাদের কথা একটু আগে বলছিলাম, সেই পাঁচজনের সেদিনকার পিকনিকে উপস্থিতিটা নিছক একটা উপস্থিতি—বা অন্যান্যদের সঙ্গে অনেক দিন পরে একটা মিলনের আনন্দ বলে বোধ হয় ধরে নিতে পারেন। কেন এই কথাটা বলছি, আবার একটু পরিষ্কার করে বলি। তারপর একটু যেন থেমে পুনরায় তার অর্ধসমাপ্ত কথার জের টেনে কিরীটী বলতে লাগল, দলের মধ্যে সেদিন ঐভাবে মিত্রানীর মৃত্যুর ব্যাপারটা রীতিমত রহস্যে ঘেরা এবং সে মৃত্যু স্বাভাবিক নয়—কেউ তাকে রুমালের ফাঁস গলায় দিয়ে হত্যা করেছে ঝড় ও ধুলোর ঘূর্ণির মধ্যে অন্যান্যদের অগোচরে।

হত্যা যখন করা হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই কেউ না কেউ তাকে হত্যা করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন জাগে—কে? কে তাকে হত্যা করলো! বা কে তাকে হত্যা করতে পারে! হয় তো বাইরের কেউ ঐ সময় তাকে হত্যা করেছে গলায় রুমালের ফাঁস দিয়ে, না হয় যারা ঐ মুহূর্তে ঐখানে উপস্থিত ছিল, তাদেরই মধ্যে কেউ। তাই নয় কি?

হ্যাঁ, মৃদু গলায় সুশীল নন্দী বললেন, কিন্তু—

জানি। আপনি হয়তো বলতে চাইছেন, তারা দীর্ঘদিনের পরিচিত ও পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। কথাটা ঠিক এবং সেক্ষেত্রে কারোর প্রতি কারোর আক্রোশ থাকলে হয়তো অনেক আগেই তাকে হত্যা করতো, সে ধরনের সুযোগ পেতে তার কোন অসুবিধা ছিল না। তবে ঐদিনই বা হত্যা করলো কেন! তাই নয় কি?

হ্যাঁ।

দেখুন, আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন হত্যা দুই রকমের হয়—এক দীর্ঘ দিনের হত্যালিপ্সা—হত্যাকারী একটা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে—সেটা হচ্ছে পূর্ব-পরিকল্পিত হত্যা—আর একটা হচ্ছে সাডেন প্রোভোকেশন-জনিত হত্যা। এখন কথা হচ্ছে মিত্রানীর ক্ষেত্রে কোন্‌টা হয়েছে! যদি প্রথমটাই ধরে নিই—তাহলে স্বভাবতই যে কথাটা আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক, সেটা হচ্ছে হয়তো সেই হত্যাকারী মিত্রানীর পূর্ব-পরিচিত ছিল এবং সেই পরিচয়ের মধ্যে দিয়েই কোন কারণে সে মিত্রানীর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে এবং সেই বিরূপতা হয়তো এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল—যার ফলে ঐ নিষ্ঠুর হত্যা সংঘটিত হয়েছে।

তাহলে আপনি বলতে চান মিঃ রায়—মিত্রানীর পরিচিত জনেদের মধ্যে কেউ—

ঠিক তাই—আর সেই পরিচিত জনদের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই ঐ বন্ধুদের কথাই মনে পড়া স্বাভাবিক নয় কি?

তা অবিশ্যি—

অবশ্যই ওরা ছাড়াও মিত্রানীর আরো পরিচিতজন থাকতে পারে—সেটা তখনই আমরা ভাববো, যখন সেদিন যারা উপস্থিত ছিল, তারা প্রত্যেকে সন্দেহের তালিকা থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু আগেই যে পাঁচজনের নাম করেছি তারা সেই তালিকা থেকে আমার মতে বাদ পড়ে।

কেন?

আপনার নেওয়া জবানবন্দি বা স্টেটমেন্টগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন, তাহলেই আপনার প্রশ্নের জবাব পাবেন,—মণিময়, ক্ষিতীশ, সতীন্দ্র ও পাপিয়া এরা একমাত্র পাপিয়া ব্যতীত—সকলেই যে যার জীবনে প্রতিষ্ঠিত, বিবাহিত, সংসারধর্ম করছে —এদের পক্ষে ঐ ধরনের একটা নৃশংস হত্যার ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক কি?

কেন? ওদের মধ্যেও তো কোন আক্রোশ বা ঈর্ষার কারণ থাকতে পারে মিত্রানীকে কেন্দ্র করে—সুশীল নন্দী বললেন।

তা থাকতে পারে হয়ত এবং যদি থাকেই, স্বভাবতই যে প্রশ্নটা আমার মনে হচ্ছে—কি কারণে আক্রোশ বা ঈর্ষা—

কত কারণ তো থাকতে পারে—সুশীল নন্দী বললেন।

কথাটা মিথ্যা বলেননি আপনি—তবু একটা কিন্তু থেকে যায়—

কিসের কিন্তু—

কিন্তুটা হচ্ছে মিত্রানী কি তাহলে তার কিছুটা অন্তত আভাস পেত না! শুধু তাই নয়—ওদের জবানবন্দি থেকেও হয়ত তার কিছুটা ইঙ্গিত আমরা পেতাম—যেটা বাকী দুজনার জবানবন্দি থেকে অর্থাৎ সুহাস মিত্র ও কাজল বোসের স্টেটমেন্ট থেকে আমরা পেতে পারি—কিন্তু সে কথা আমরা পরে ভাববো। তার আগে আমি আপনার একটু সাহায্য চাই—

বলুন কি সাহায্য চান?

আমি ওদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কথা বলতে চাই—

বেশ তো। সে আর এমন কঠিন কি! আমি ব্যবস্থা করবো।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব—

তাই হবে—

তাহলে আজ আমি উঠি!

কিরীটী বিদায় নিল। জ্যোতিভূষণও কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে এলেন।

বেলা তখন অনেকটা গড়িয়ে গিয়েছে, বৈশাখের সূর্য মধ্য-গগনে প্রখর তাপ ছড়াচ্ছে।

গাড়িতে উঠতে হীরা সিং শুধায়, কিধার জায়গা সাব্?

লালবাজার হয়ে চল—বাবুকে নামিয়ে দিয়ে যাবো।

গাড়ি চলেছে কলকাতার পথে—চলমান গাড়ির খোলা জানালাপথে আগুনের হল্কার মত তপ্ত হাওয়া যেন এসে চোখমুখ ঝলসে দিচ্ছে।

গাড়িতে উঠে একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করে কিরীটী। থানায় জ্যোতিভূষণ একটা কথাও বলেননি, দুজনের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন।

কিরীটীর দিকে একবার তাকালেন জ্যোতিভূষণ, সিগার মুখে গাড়ির ব্যাক সীটে হেলান দিয়ে অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

মিঃ রায়!

কিছু বলছিলেন জ্যোতিবাবু?

আচ্ছা, মিত্রানীর হত্যার ব্যাপারটা আপনার কি মনে হচ্ছে পূর্ব-পরিকল্পিত না সাডন প্রোভোকেশন!

pathagar.net

অবশ্যই পূর্ব-পরিকল্পিত বলেই মনে হচ্ছে—কিন্তু এক জায়গায় ব্যাপারটা যেন ঠিক মিলছে না—

কি রকম? প্রশ্নটা করে তাকালেন জ্যোতিভূষণ কিরীটীর মুখের দিকে।

ধরুন যদি পূর্ব-পরিকল্পিত হয়—হত্যাকারীর পক্ষে চান্স পাওয়াটা যেন ফিফটি-ফিফটি হচ্ছে, অর্থাৎ যদি ঝড় ও ধুলোর আঁধি না উঠতো, চারিদিক একটা অন্ধকারের যবনিকায় না ঢেকে যেতো, হত্যাকারী হত্যা করবার সুযোগই পেতো না, অবিশ্যি যদি হত্যাকারী মিত্রানীর পরিচিত জনেদের মধ্যেই কেউ হয়ে থাকে।

আমার মনে আছে মিঃ রায়, সেদিনকার কাগজেও আবহাওয়ার পূর্বাভাসে দেখেছিলাম—বিকালের দিকে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাটা। এবং পর পর কয়েকদিনই বিকেলের দিকে সে সময় ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। হত্যাকারী হয়ত সেইটুকুর উপরেই ভরসা করে প্রস্তুত হয়েছিল।

হতে পারে—তাহলে চান্স পাওয়াটা হত্যাকারীর পক্ষে ফিফটি-ফিফটিই থেকে যাচ্ছে—অর্থাৎ চান্স না পেলে সেদিন সে মিত্রানীকে হত্যা করতে পারতো না—মিত্রানী খুন হতো না। ভাল কথা, ময়না তদন্তের রিপোর্টটা কবেতক পাওয়া যাবে? পেলেই আমাকে একটু জানাবেন। আমি বাড়িতেই থাকবো।

জ্যোতিভূষণকে লালবাজারে নামিয়ে কিরীটী ফিরে এলো। এবং সারাটা দিন কিরীটী আর কোথাও বের হলো না।

লালবাজার থেকে ফোন এলো সন্ধ্যের দিকে।

কিরীটী কৃষ্ণা আর সুব্রত বসে বসে চা পান করছিল।

কিছুক্ষণ পূর্বে সুব্রত এসেছে।

ফোনের রিং হতেই কিরীটী বললে, দেখ্ তো সুব্রত, বোধ হয় লালবাজার থেকে জ্যোতিবাবু ফোন করছেন!

সুব্রত ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল, হ্যালো—

কিরীটীবাবু আছেন?

আছে।

বলুন লালবাজার থেকে জ্যোতিভূষণ কথা বলছি।

এগিয়ে গিয়ে ফোনটা সুব্রতর হাত থেকে নিল কিরীটী। কিরীটী কথা বলছি, তারপর পেলেন পোস্টমর্টেম রিপোর্ট?

হ্যাঁ।

শ্বাসরোধ করে মৃত্যু ছাড়া দেহে আর কিছু পাওয়া গিয়েছে কি?

মিঃ রায়, মনে হচ্ছে আপনি যেন আরো কিছু আশা করছেন!

করেছিলাম বলেই তো আই অ্যাম ইগারলি ওয়েটিং ফর দি রিপোর্ট!

শি ওয়াজ রেপড। হাউ হরিব্‌ল!

হরিব্‌ল তো বটেই, তবে আমি ছায়ার পিছনে যেন কায়ার আভাস পাচ্ছি—দি ম্যান বিহাইন্ড দি কারটেন, আর এখন অত অস্পষ্ট মনে হচ্ছে না—ঠিক আছে, থ্যাঙ্ক ইউ।

BanglaBook.org

রিপোর্টটা কি আপনি দেখতে চান?

পরে দরকার হলে আপনাকে জানাব।

ফোনটা নামিয়ে রেখে কিরীটী আবার এসে সোফায় বসল।

প্রশ্ন করে কৃষ্ণা, ময়না তদন্তের রিপোর্ট পেলে?

হ্যাঁ।

সুব্রত বললে, কার—মিত্রানী দেবীর?

হ্যাঁ, তার উপর বলাৎকার করা হয়েছিল—

তাহলে—সুব্রত যেন কি বলতে চায় কিন্তু তার বলা হলো না—

কিরীটী কতকটা যেন তাকে থামিয়ে দিয়েই বললে, তুই তো সব শুনেছিস সুব্রত—এবারে তোর কি মনে হয়, বাইরের কেউ, না ঐ মিত্রানীর পরিচিত জনদের মধ্যেই কেউ—

কৃষ্ণা জবাবটা দিল, বাইরের কেউও-তো হতে পারে।

না কৃষ্ণা, না—গণ্ডিটা অত্যন্ত ছোট—মিত্রানীর পরিচিত জনদের মধ্যেই কেউ এবং সম্ভবত যারা ঐদিন ঐসময় ঐখানে উপস্থিত ছিল তাদেরই মধ্যে একজন—যার তিনটি বস্তুই ছিল, অর্থাৎ সুবিধা সুযোগ ও হত্যার উদ্দেশ্য!

কি উদ্দেশ্য হতে পারে? কৃষ্ণার প্রশ্ন।

ব্যর্থ প্রেমের আক্রোশ বা বহুদিন ধরে অবদমিত কামভাব, ঠিক প্যাশান নয়, মিত্রানীর প্রতি একটা লালসা—যে কারণে প্রথমে ঐ অকস্মাৎ হাতের মুঠোয় আসা সুযোগকে যেমন সে নষ্ট হতে দেয়নি, তেমনি বহুদিনের লালসার পরিতৃপ্তি সাধন করতেও সে এতটুকু পশ্চাদপদ হয়নি। কিল্‌ড হার বাই থ্রোটিং অ্যান্ড দেন রেপড হার।

পর পর হত্যা ও ধর্ষণ—বিশেষ করে হত্যার নিষ্ঠুর পদ্ধতি দেখে সেটাই বেশী করে মনে হয়!

দিন দুই পরে শনিবার সুশীল নন্দীর ফোন এলো।

মিঃ রায়—কাল সকলে বিকালের দিকে আমার এখানে আসছে আপনি যেমন বলেছিলেন—

কিরীটী জবাবে বলেছিল, ঠিক আছে। আমি যাবো, ক'টার সময় তারা আসছে?

এই ধরুন পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে!

আমার কথা কিছু তাদের বলছেন?

না, আমিই তাদের সঙ্গে আরো কিছু আলোচনা করতে চাই এইটুকুই বলেছি। সুশীল নন্দী বললেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে অতঃপর কিরীটী ফোনের রিসিভারটা সবে নামিয়ে রেখেছে, সুব্রত এসে ঘরে ঢুকল।

এই যে সুব্রত—এসে গেছিস তুই, ভালই হলো, নচেৎ একটু পরেই হয়ত তোকে ফোন করতাম।

সুব্রত কোন কথা না বলে একটা খালি সোফার উপরে উপবেশন করলো।

কিরীটিই বললে, কাল শনিবার সুশীল নন্দীর ওখানে একবার যাবো বিকেলের দিকে, তুইও থাকবি আমার সঙ্গে—

মিত্রানীর বন্ধু ও বান্ধবীদের সঙ্গে কথা বলবি? সুব্রত শুধাল।

হ্যাঁ।

কিন্তু পাঁচজনকে তো আগেই লিস্ট থেকে বাদ দিয়েছিস তুই!

তা দিয়েছি ঠিকই, তবু সকলেরই মুখোমুখি একবার আমি হতে চাই—তাতে করে মিত্রানীর মৃত্যুতে কার মনে কি রকম রেখাপাত করেছে, কিছুটা অন্তত তার আভাস পাবো হয়তো।

কিন্তু ওরাই তো সব নয়—একজন তো বাকী থেকে যাচ্ছে, যদিও সে ঘটনার দিন স্পটে উপস্থিত ছিল না—

সজল চক্রবর্তী?

হ্যাঁ।

কথাটা যে আমার মনে হয়নি সুব্রত তা নয়, ঘটনার সময় সেদিনকার স্পটে সে না থাকলেও মিত্রানীর পরিচিত জনদের মধ্যে সেও একজন। সে নিশ্চয়ই এতদিনে ব্যাপারটা জানতে পেরেছে—কাজেই তার মনে মিত্রানীর হত্যার ব্যাপারটা কতখানি রেখাপাত করেছে তাও জানা প্রয়োজন তো বটেই, তাছাড়া মিত্রানী সম্পর্কে কোন নতুন তথ্যও হয়ত সে দিতে পারে।

কৃষ্ণা এতক্ষণ ঘরের এক কোণে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে একখানা বই পড়ছিল, দুই বন্ধুর আলোচনায় কোন সাড়া দেয়নি, সে এবারে বললে, দেখো, একটা কথা তোমাকে গতকাল থেকেই বলবো ভাবছিলাম!

কি বল তো? স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল।

দলের মেয়ে দুটিকেই বোধ হয় তুমি তোমার বাদের—মানে অমিশনের লিস্টে যোগ করে নিতে পারো—

তুমি বোধ হয় পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটার কথাই ভাবছো কৃষ্ণা, কিন্তু এটা তো স্বীকার করবে ঐ চরম ঘটনাটা ঘটাবার আগে বিক্ষিপ্ত কোন ইতিহাস বা ঘটনা ঐ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে।

তা যে পারে না আমি বলছি না, তবে—

তাছাড়া এটাও তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে কৃষ্ণা, রহস্য উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে এমন অনেক কিছু আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও, পরে কোন এক সময় সেটা কোন মূল্যবান সূত্র হয়েও দাঁড়াতে পারে! কি জানো কৃষ্ণা, ঠিক সেই কারণে ঐ দশটি নরনারীর পরিচয়ের ইতিহাস যতটা সম্ভব আমি জানতে চাই—যদি কোথাও কিছু এমন খোঁজ পাই যেটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে এগুতে পারব!

কৃষ্ণা আর কথা বাড়াল না, সোফা থেকে উঠে পড়ে বললে, বোসো তোমরা, আমি চা নিয়ে আসি।

কৃষ্ণা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

BanglaBook.org

॥ আট ॥

ওদের সকলের পৌঁছাবার আগেই কিরীটী সুশীল নন্দীর ওখানে পৌঁছে গিয়েছিল। কিরীটী সুশীল নন্দীকে আগেই ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিল, থানার মধ্যে নয়—সম্ভব হলে ঐ বিলডিংয়েরই দোতলায় সুশীল নন্দীর কোয়াটার্স-এ সে সকলের সঙ্গে দেখা করতে চায়। সুশীল নন্দী বলেছিল, তাতে কোন অসুবিধা হবে না, কারণ তার স্ত্রী কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি গিয়েছেন—তার কোয়াটার্স খালি।

কিরীটী ও সুব্রত সুশীল নন্দীর দোতলার বসবার ঘরে ঢুকে দেখলো—দুটি যুবকের সঙ্গে বসে সুশীল নন্দী কি সব আলোচনা করছেন!

কিরীটীদের ঘরে ঢুকতে দেখে সুশীল নন্দী বললেন, আসুন মিঃ রায়, সকলে এখনো এসে পৌঁছাননি, মাত্র দুজন এসেছেন—মণিময়বাবু, ক্ষিতীশবাবু—ইনি কিরীটী রায়, সরকারের পক্ষ থেকেই উনি আপনাদের সকলের সঙ্গে মিত্রানী দেবীর হত্যার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান।

মণিময় দত্ত ও ক্ষিতীশ চাকী যুগপৎ একসঙ্গে সুশীল নন্দীর কথায় কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল, কিরীটীও ওদের দিকে তাকিয়েই আছে তখন, দুজনারই বয়স বত্রিশ থেকে চৌত্রিশের মধ্যে। মণিময়ের গায়ের রংটা কালো হলেও চোখে মুখে একটা আলগা শ্রী আছে—বেশ বলিষ্ঠ, সুগঠিত চেহারা। উচ্চতায় মাঝারি। মাথায় বড় বড় চুল। ঘাড়ের দিকে যেন একটু বেশীই, লংস ও একটা হাওয়াই শার্ট পরনে। পায়ে কালো চপ্পল।

ক্ষিতীশ চাকী একটু বেঁটেই—তবে রোগা পাতলা চেহারার জন্য তেমন বেঁটে মনে হয় না, গায়ের রং তামাটে, মনে হয় কোন এক সময় গৌর ছিল, এখন রোদে জলে ঘুরে ঘুরে তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে, তৈলহীন রুক্ষ একমাথা চুল—কিছু কিছু চুলে পাক ধরেছে ইতিমধ্যে। নাকটা একটু চাপা, ছোট কপাল, গালের হাড় দুটো প্রকট। বুদ্ধিদীপ্ত চঞ্চল দুটো চোখের দৃষ্টি।

কথা বললে ক্ষিতীশ চাকীই, সুশীলবাবু একটু আগেই বলছিলেন, আপনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান বলেই বিশেষ করে আমাদের সকলকে আজ এখানে ডাকা হয়েছে। কিন্তু আমরা যা জানি সবাই তো সেদিনই বলে ওর খাতায় সই করে দিয়েছি! কথার মধ্যে একটা ঝাঁঝ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিরীটী মৃদু হেসে বললো, ঠিকই ক্ষিতীশবাবু, আমি ঠিক সেজন্য আপনাদের এখানে আজ আসবার জন্য ওঁকে বলতে বলিনি—

তবে? ক্ষিতীশের প্রশ্ন।

দেখুন আমি একটু ভিতরের কথা জানতে চাই। কিরীটী বললে।

ভিতরের কথা মানে? প্রশ্নটা করে ক্ষিতীশ চাকী কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

আপনাদের সকলের পরস্পরের সঙ্গে তো দীর্ঘদিনের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা—তাই—

কি তাই? বলুন, থামলেন কেন?

মিত্রানী সম্পর্কে আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত এমন অনেক কথা জানেন যেটা

জানতে পারলে আপনাদের কাছ থেকে মিত্রানীর হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে আমার কিছুটা সাহায্য হতে পারে। যেমন ধরুন মিত্রানী এতদিন বিয়ে করেনি কেন? তার বাবাকে বিয়ের কথায় সে বলেছে সময় হলে জানাবো—

ক্ষিতীশ চাকী বললে, তাই নাকি—তা সে-রকম কিছু আমি শুনিনি। তাছাড়া ওটা তার তো পার্সোন্যাল ব্যাপার—

ঠিকই—আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, কিরীটী বললে, মিত্রানী কাউকে ভালবাসত কিনা জানেন? কিংবা অন্য কেউ মানে আপনাদের মধ্যে তাকে কেউ ভালবাসত কিনা বা তার প্রতি কোনরকম দুর্বলতা ছিল কিনা কারো?

ক্ষিতীশ চাকী বললে, কাউকে মিত্রানী ভালবাসতো কি বাসত না আমি জানি না—তা নিয়ে কোনদিন আমার কোন মাথাব্যথা ছিল না। আর দুর্বলতার কথা যদি বলেন, আমার তার প্রতি এতটুকুও দুর্বলতা ছিল না, কলেজ ছাড়বার পরও বড় একটা দেখাসাক্ষাৎ-ই হতো না।

আচ্ছা ক্ষিতীশবাবু, ক্ষিতীশের কথাগুলো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন প্রশ্নটা করলো হঠাৎ কিরীটী—মিত্রানীর হত্যার ব্যাপারে কাউকে আপনি সন্দেহ করেন?

ব্যাপারটা এত অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর যে, ঐ ব্যাপারে কোন কিছু মাথায়ই এখনো আসছে না। না মশাই, কাউকে আমি সন্দেহ করি না।

আচ্ছা ক্ষিতীশবাবু, আপনাকে আর আমাদের প্রয়োজন নেই। আপনি যেতে পারেন।

ধন্যবাদ। ক্ষিতীশ চাকী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল এবং দরজার দিকে এগুতেই কিরীটীর শেষ কথাটা তার কানে এলো।

পুলিসের কিন্তু ধারণা—আপনাদেরই মধ্যেই একজন সেদিন—

কি, কি বললেন! চকিতে ঘুরে দাঁড়ায় ক্ষিতীশ।

কিরীটী কথাটা তার শেষ করে, মিত্রানীকে—না—কিছু না—আপনি যান।

ইউ মীন সাম ওয়ান অব আস মিত্রানীকে হত্যা করেছি!

তাই।

বলিহারি বুদ্ধি! বরাবরই আমার ধারণা, বেশীর ভাগ পুলিসের লোকেরই বুদ্ধি বলে কোন পদার্থ নেই। এখন দেখছি—

সুশীল নন্দী বাধা দিলেন গম্ভীর গলায়—ক্ষিতীশবাবু, আপনি যেতে পারেন।

প্রথমে সুশীল নন্দী ও পরে কিরীটীর প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে ক্ষিতীশ চাকী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মণিময় এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। এবারে সে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, সত্যি কিরীটীবাবু! তার গলায় রীতিমত একটা উদ্বেগ যেন প্রকাশ পেল।

কি সত্যি মণিময়বাবু? মৃদু হেসে কিরীটী প্রশ্ন করে। বস্তুত এতক্ষণ সে মৃদু মৃদু হাসছিল।

ঐ যে ক্ষিতীশ বলে গেল, আ—আপনাদের তাই ধারণা নাকি?

কিরীটী শান্ত গলায় এবারে জবাব দিল, তা যদি ধরুন হয়ই, সেটা কি খুব একটা অপ্রত্যাশিত কিছু—

BanglaBook.org

না, না—কিরীটীবাবু, এ হতেই পারে না, আপনি বিশ্বাস করুন।

আপাতত ঐ কথা থাক, আগে আমার প্রশ্নটার জবাব দিন। মিত্রানীকে আপনাদের মধ্যে কেউ ভালবাসতো কি না আপনি কিছু জানেন? বা তার আপনাদের কারোর প্রতি কোন আকর্ষণ বা দুর্বলতা ছিল কিনা—

দেখুন কিরীটীবাবু, আমি ঠিক জানি না—আমি তার সঙ্গে কখনো সেরকম ভাবে মিশিনি—সহপাঠিনী হিসাবে সামান্য যা পরিচয়—

মণিময়ের কথা শেষ হলো না, সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেরই দৃষ্টি একসঙ্গেই যেন খোলা দরজার উপর গিয়ে পড়লো। অমিয় রায়, সতীন্দ্র সান্যাল সর্বপ্রথমে এবং তাদের পশ্চাতে কাজল বোস, পাপিয়া চক্রবর্তী ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলো।

সুশীল নন্দীই সকলকে আহ্বান জানালেন—আসুন আসুন, তা বিদ্যুৎবাবু আর সুহাসবাবুকে দেখছি না! তাঁরা এলেন না?

জবাব দিল সতীন্দ্র সান্যাল, তাদেরও আসার কথা নাকি!

হ্যাঁ—আমি তো সকলকেই লোক মারফৎ চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছি আলাদা আলাদা ভাবে আসবার জন্য।

কিন্তু চিঠিতে তো সে কথা লেখা ছিল না, শুধু আমাকেই আসবার কথা লেখা ছিল, সতীন্দ্র বললে।

সুশীল নন্দী বললেন, তা আপনারা সব একত্রে এলেন কি করে?

সুশীল নন্দীর কথায় ওরা সবাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। তখন অমিয়ই বললে, হাওড়া ব্রীজের কাছে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে বিশ্রী জ্যাম হয়েছে—তাই সকলেই আমরা যে যার যানবাহন ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে ব্রীজের উপর দিয়ে একে অন্যের দেখা পাই—পরে ব্রীজ পার হয়ে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত হেঁটে এসে সকলে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে আসছি—

ও তাই বলুন—তা আপনারা দাঁড়িয়ে কেন, বসুন—

সকলের দৃষ্টিই তখন মণিময়ের প্রতি নিবদ্ধ—মনে হচ্ছে সকলের মনের মধ্যেই যেন একটা সংশয় দেখা দিয়েছে, কিন্তু কেউ কিছু বললো না, ঘরের মধ্যে সকলের জন্যই আসনের ব্যবস্থা ছিল, একে একে সব চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

॥ নয় ॥

সুব্রত এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি—নীরব দর্শকের মত কিরীটীর পাশে নিঃশব্দে বসে ওদের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। এদেরও সকলের বয়েস অন্য দুইজনার মতই, অমিয়র চেহারার মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই—সাধারণ একজন যুবক, একজোড়া গোঁফ আছে—পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, চোখে সরু শৌখিন ফ্রেমের চশমা—চোখের দৃষ্টিটা যেন কেমন একটু বোজা-বোজা।

সতীন্দ্র সান্যালের কালো আবলুস কাঠের মত গায়ের রঙ। বেশ মোটা-সোটা, মুখটা গোল—পুরুষ্টু। জামা কাপড় চেহারা দেখে মনে হয় বেশ সুখী ব্যক্তি। আর হবেই বা

না কেন, কিরীটীর মনে পড়লো সুশীল নন্দীর খাতায় লেখা আছে ওর সম্পর্কে, ফুড ডিপার্টমেন্টে ওর বড় চাকুরে বাপের দৌলতে ভাল চাকরি একটা করছে। সুশীল নন্দী সতীন্দ্র সম্পর্কে যেন ঠিক-ঠিকই লিখেছেন। কাজল বোস—একেবারে টিপিক্যাল একজন স্কুল মিসট্রেসের মতন চেহারা। কালো, রোগা ঠিক না বলে বলা উচিত যৌবন-রস যেন ওর দেহ থেকে অনেকখানি নিংড়ে নেওয়া হয়েছে। চোখেমুখে ও চেহারায় যেন একটা হতাশা—একটা ক্লান্তির স্পষ্ট ইঙ্গিত।

আর পাপিয়া চক্রবর্তী। হ্যাঁ—উজ্জ্বল শ্যাম—স্লিম ফিগার—ঠিক যেন আজকের দিনের যে সব তরুণীদের পথেঘাটে চোখে পড়ে—নিজেকে আকর্ষণের বস্তু করে তোলার উগ্র প্রচেষ্টা, পাপিয়া যেন তাদেরই সমগোত্রীয়। পাপিয়ার মত মেয়েরা অন্তরের সঙ্গে কখনো কোন পুরুষের কাছে ধরা দিতে পারে না—কতকটা যেন আত্মকেন্দ্রিক।

কথা বললো পাপিয়াই চেয়ারটা টেনে বসতে বসতে, কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো সুশীলবাবু, হঠাৎ এভাবে আবার আমাদের তলব পাঠিয়েছেন কেন?

মণিময় ও ক্ষিতীশকে যা বলেছিলেন সুশীল নন্দী, কিরীটীকে দেখিয়ে ওদেরও তাই বললেন। সকলেই তাঁর কথায় একেবারে কিরীটীর দিকে তাকাল!

পাপিয়াই আবার বললে, আপনাকে যেন চিনি বলে মনে হচ্ছে—নন্দী সাহেব, উনি কি সত্যসন্ধানী কিরীটী রায়?

ঠিকই ধরেছেন মিস চক্রবর্তী।

হুঁ। এখন তাহলে বুঝতে পারছি, আজকে আমাদের ডাকার আসল উদ্দেশ্যটা। আর উনি বোধ হয় সুব্রতবাবু, ওঁর পাশে বসে!

হ্যাঁ, সুব্রত রায়। সুশীল নন্দী আবার বললেন।

কিরীটী কথা বললে এবারে, দেখুন মিস চক্রবর্তী—আপনারা সকলেই মিত্রানীর বন্ধু—সহপাঠীও, তাই মিত্রানী সম্পর্কে দুটো-একটা প্রশ্ন আমি করতে চাই—

সতীন্দ্র বলেন, কি প্রশ্ন?

মিত্রানীর প্রতি দলের কারো কোন দুর্বলতা ছিল কিনা—কিংবা মিত্রানীর আপনাদের কারোর প্রতি—

সবাই চুপ। একেবারে যেন বোবা! অকস্মাৎ যেন সকলেই কেমন একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়েছে।

বুঝতে পারছি আমার প্রশ্নে আপনারা সকলেই একটু অস্বস্তিবোধ করছেন। সুশীলবাবু—

বলুন—

আপনার পাশের ঘরটা আমরা একটু ব্যবহার করতে পারি?

নিশ্চয়ই—

তাহলে আমি আর সুব্রত পাশের ঘরে যাচ্ছি, আপনি এক-একজন করে এঁদের ঐ ঘরে পাঠান—

বলা বাহুল্য, সেই মতই ব্যবস্থা হলো।

BanglaBook.org

প্রথমেই এলো অমিয় রায়। সে এক কথাতেই জবাব দিল, কলেজ ছাড়ার পর মিত্রানীর সঙ্গে তার বিশেষ কোন সম্পর্কই ছিল না—ক্বচিৎ কখনো দেখা হতো—তাও দু'-একটা সাধারণ কুশল প্রশ্ন ছাড়া ওদের মধ্যে আর কোন কথা বড় একটা হতো না—কাজেই মিত্রানী সম্পর্কে সে বিশেষ কোন খবরই রাখে না।

অমিয়কে কিরীটী বিদায় দিল।

অমিয়র পর এলো সতীন্দ্র। তারও জবাব অমিয়র মতই।

কিরীটী মৃদু হেসে তাকেও বিদায় দিল।

অতঃপর এলো পাপিয়া চক্রবর্তী।

সে কিরীটীর প্রশ্নের জবাবে বললে, মিত্রানী ওয়াজ এ টিপিক্যাল অধ্যাপিকা। স্ট্যঞ্চ মরালিস্ট অ্যান্ড নেভার সোস্যাল। ঐ টাইপের মেয়েরা প্রেম করলেও কখনো তা কি প্রকাশ করে—করে না! কাজেই, তার সম্পর্কে ঐ ধরনের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না—মিত্রানী সম্পর্কে আমার ধারণা, প্রেম-ট্রেমের ব্যাপারে তার বোধ হয় একটা নশিয়াই ছিল। বলে পাপিয়া মৃদু হাসলো। কিরীটী মৃদু হেসে তাকেও বিদায় দিল।

সর্বশেষ এলো কাজল বোস।

দুই চোখে ঐ মুহূর্তে তার, কিরীটীর মনে হয়, কেমন যেন একটা ভয় ও সংশয়। দাঁড়িয়ে থাকে সে, বসে না।

বসুন মিস্ বোস—কিরীটী বললে।

কিন্তু আমার যা বলবার ছিল তা তো সেইদিনই থানার অফিসারকে বলেছি কিরীটীবাবু।

জানি বলেছেন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন!

একটু দ্বিধা, একটু সঙ্কোচ নিয়েই যেন কাজল চেয়ারটার উপরে বসলো। সোজাসুজি কিরীটীর চোখের দিকে যেন সে তাকাতে পারছে না।

বলুন তো মিস্ বোস, আপনার বান্ধবী মিত্রানী আপনাদের বন্ধু-ছেলেদের মধ্যে কাউকে কি ভালবাসতো।

ঠিক জানি না। তার সঙ্গে আমার বড় একটা দেখা হতো না কলেজ ছাড়ার পর। তাছাড়া সে ছিল নামকরা একটি কলেজের প্রফেসার, আর আমি সাধারণ একজন স্কুল-মিসট্রেস—

কিরীটী বুঝলো কাজলের মধ্যে একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আছে মিত্রানী সম্পর্কে। কিরীটী একটু যেন সজাগ হয়ে নড়েচড়ে বসলো।

আপনি মনে হচ্ছে মিত্রানীকে তেমন বোধ হয় একটা খুব পছন্দ করতেন না!

না, না—তা নয়—

তবে?

ওর বরাবরই ভাল ছাত্রী ও অধ্যাপিকা বলে মনের মধ্যে একটা ভ্যানিটি ছিল। অন্যান্যেরা টের না পেলেও আমি টের পেতাম।

আচ্ছা আপনাদের দলের পুরুষদের কারো উপরই কি মিত্রানীর কোন দুর্বলতা ছিল

BanglaBook.org

না? আবার আগের প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলো কিরীটী, আপনার দৃষ্টিতে না পড়লে দলের অন্য কারো মুখেও কি কিছু শোনেন নি?

না। তবে সুহাস যেন একদিন আমাকে কথায় কথায় বলেছিল—

কি বলেছিলেন সুহাসবাবু?

মিত্রানীর সুহাসের প্রতি ব্যবহারটা যেন একটু কেমন-কেমন ছিল। আর মনে হয়, আবার সুহাসেরও বোধ হয় মিত্রানীর প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল। আচ্ছা কিরীটীবাবু—

বলুন।

সত্যিই কি পুলিসের ধারণা হয়েছে যে, আমাদের মধ্যেই কেউ সেদিন মিত্রানীকে—

সেটাই তো স্বাভাবিক মিস বোস।

কেন—কেন?

মনে করুন, আপনারা ছাড়া সে সময় সেখানে কেউ বাইরের লোক ছিল না—সেও একটা কথা এবং আপনাদের কারো পক্ষে সেদিন ঐখানে মিত্রানীকে হত্যা করার যে রকম সুবিধা ছিল, ততটা আর কারোর পক্ষেই ছিল না।

কিন্তু—

কিরীটী বলতে লাগল, তাছাড়া ধরুন যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তিরই কাজ হবে—সে নিশ্চয়ই আশেপাশে কোথাও ছিল যেটা আপনাদের অতগুলো মানুষের কারো না কারো চোখে পড়তই, সেরকম কাউকে কি সেদিন আপনাদের আশেপাশে সুযোগের অপেক্ষায় ঘুরঘুর করতে দেখেছিলেন আপনাদের কেউ?

না, সে রকম কাউকেই দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

আচ্ছা মিস্ বোস!

বলুন।

আপনাদের মধ্যে কেউ সেদিন বেতের টুপি মাথায় দিয়ে গিয়েছিলেন?

না তো!

আচ্ছা আপনাদের দলের মধ্যে কে কে সিগ্রেট খায়?

সুহাস, অমিয় আর বিদ্যুৎ—আরো একজন চেইন স্মোকার সজল চক্রবর্তী। সে তো সেদিন আসেইনি—

কে কি ব্রান্ড খায় জানেন?

বিদ্যুৎ আর সজলের কথা জানি না—তবে সুহাস আর অমিয় দুজনে চার্মিনার খায়।

হুঁ। কে বেশী খায় সিগ্রেট ওদের দুজনের মধ্যে?

সুহাসই মনে হয় বেশী খায়।

আপনারা কেউ সেদিন একটা বায়নাকুলার নিয়ে গিয়েছিলেন?

বায়নাকুলার! না তো!

কারো কাছেই বায়নাকুলার ছিল না?

না।

আচ্ছা মিত্রানীর হাতে কি সবুজ রঙের কাচের চুড়ি ছিল? আপনার হাতেও তো দেখছি কাচের চুড়ি রয়েছে—

হ্যাঁ—এটা আমার শখ। মিত্রানীকে কখনো কাচের চুড়ি ব্যবহার করতে দেখিনি। আর কাচের চুড়ি ব্যবহার সে করতেই বা যাবে কোন্ দুঃখে—এত টাকা মাইনে পেত।

টাকার জন্যই কি কেউ কাচের চুড়ি ব্যবহার করে! আপনার মত শখ থাকলে অনেক বড়লোকের মেয়েও হাতে কাচের চুড়ি পরেন। আচ্ছা আপনি সেদিন পড়ে-টড়ে গিয়েছিলেন নাকি?

কই না তো!

দেখছি আপনার ডান হাতে তিনটি, অন্য হাতে একটি চুড়ি—

আমার এক ছোট ভাইঝি আছে, সে ভেঙে ফেলেছে।

আচ্ছা মিস বোস, এবারে আপনি যেতে পারেন।

কাজল উঠে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুব্রত!

কি?

কাজল বোসের বাঁ হাতটায় কব্জির কাছে লক্ষ্য করেছিলি—একটা অ্যাব্রেশন মার্ক আছে।

দেখেছি—মনে হয় সব কথা উনি স্পষ্ট করে বললেন না।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, আর কিছু মনে হলো তোর ঐ মহিলা সম্পর্কে?

মনে হলো নিজের অসুন্দর চেহারার জন্য যেন একটা মানসিক দৈন্যে ভুগছেন।

ঠিক। আর কিছু?

আর তো কিছু মনে হলো না।

সুহাসবাবুর প্রতি বোধ হয় ঐ ভদ্রমহিলার কিছুটা দুর্বলতা আছে।

ঐ সময় সুশীল নন্দী এসে ঘরে ঢুকলেন—মিঃ রায়!

বলুন।

আরো দু'জন এসেছেন।

কে কে? কিরীটী শুধাল।

সুহাস মিত্র আর সজল চক্রবর্তী। মানে সেই ভদ্রলোক যার অনুরোধেই সেদিন ওদের বটানিক্স-এ পিকনিকের প্রোগ্রাম হয়েছিল। কিন্তু সজলবাবু তো সেদিন পিকনিকে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর সঙ্গেও কথা বলতে চান নাকি?

ঘটনাচক্রে এসেই পড়েছেন যখন তখন আলাপ করতে দোষ কি! দিন না—তাঁকেই আগে পাঠিয়ে দিন।

সুশীল নন্দী চলে গেলেন এবং একটু পরে সজল চক্রবর্তী এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। চেহারায় ও পোশাকে বেশ স্মার্ট। বেশ লম্বা সুগঠিত চেহারা। গাত্রবর্ণ শ্যামই বলা চলে। ছোট কপাল, নাকটা একটু চাপা—চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত। পরনে দামী স্যুট—

আপনার নাম—

সজল চক্রবর্তী।

বসুন।

pathagar.net

সজল বসতে বসতে বললে, আজই এগারোটা নাগাদ মর্নিং ফ্লাইটে কলকাতায় এসেছি—মিত্রানীর বাসায় ফোন করেছিলাম—প্রণবেশবাবুর মুখেই সব শুনলাম। সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, আমি তো একেবারে হতবাক। ব্যাপারটা তো বিশ্বাসই করতে পারিনি—সঙ্গে সঙ্গে সুহাসের ওখানে আমি ছুটে যাই—অ্যান্ড হি অলসো রিপিটেড দি সেম স্টোরি! সে-ই বললে থানা অফিসার নাকি আজ তাকে বিকেলের দিকে এখানে আসতে বলেছেন কি সব আলোচনার জন্য—আমিও তাই ওর সঙ্গে চলে এলাম।

বেশ করেছেন। ভালই করেছেন। আপনিও তো মিত্রানীর বন্ধু—সহপাঠী! আপনি নিশ্চয়ই তাঁর সম্পর্কে অনেক কথাই জানেন।

কি আর, কতটুকুই বা জানতে পারি বলুন—এইটুকু বলতে পারি—শী ওয়াজ ভেরি নাইস—ভেরি সোস্যাল।

কিন্তু কাজল বোস বলছিলেন—

কি? কি বলছিল কাজল?

মিত্রানী ওয়াজ রাদার আনসোস্যাল।

বরং ঠিক উল্টোটাই—

আচ্ছা মিঃ চক্রবর্তী—মিত্রানীর কোন লাভ-অ্যাফেয়ার ছিল বলে জানেন?

তা বোধ হয় ছিল—

আপনাদের মধ্যে কি কেউ—

ইফ আই অ্যাম নট রং, ঐ সুহাস—

সুহাস মিত্র?

মনে হয়।

আপনি শুনেছেন কিনা জানি না, পুলিসের একটা ধারণা, আপনাদের দলের মধ্যেই কেউ তাকে হত্যা করেছে—

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়? আই মাস্ট সে দে আর ফুলস! আমাদের মধ্যেই কেউ মিত্রানীকে হত্যা করতে যাবে কেন?

ঈর্ষার তাড়নায়ও তাকে কেউ আপনাদের মধ্যে হত্যা করে থাকতেও তো পারে।

ঈর্ষা! কিসের ঈর্ষা! না, না—অসম্ভব।

আপনি তো সকলেরই মনের কথা জানেন না মিঃ চক্রবর্তী। তাছাড়া সব সময় নিজের মনের কথাই কি আপনি জানতে পারেন? থাক সে কথা—আপনার কোন বায়নাকুলার আছে?

বায়নাকুলার!

হ্যাঁ।

কই না!

নেই?

না।

তা আপনি এই সেদিন কলকাতায় এসেছিলেন—হঠাৎ দুদিন পরেই যে আবার কলকাতায় এলেন?

BanglaBook.org

একটা অফিসিয়াল কাজে আসতে হলো।

কালই বোধ হয় আবার চলে যাবেন?

না—দিন দুই আছি।

আপনি থাকেন কোথায়?

কলুটোলায়।

বাড়িতে কে কে আছেন?

বাবা মা আর এক ছোট বোন। ছোট বোন কলেজে পড়ে। সেকেন্ড ইয়ার।

কলুটোলায় আপনাদের নিজেদের বাড়ি?

না মিঃ রায়, ভাড়াটে বাড়ি। বাবা আমার সামান্য জজ কোর্টের কেরানী ছিলেন। অবশ্যি আমি এখন যাকে আপনারা বলেন মোটা মাইনে তাই পাই, কিন্তু বাবা আমার অর্থসাহায্য নেবেন না। এ পিকিউলিয়ার টাইপ।

॥ দশ ॥

সজল চক্রবর্তীর পর এলো সুহাস মিত্র। নিয়মিত ব্যায়াম করলে যেমনটি হয়, তেমনি সুগঠিত চেহারা, পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। কালোর উপর সব কিছু মিলিয়ে সুহাস মিত্রের চেহারাটা যাকে বলে সুশ্রী তাই। সমস্ত মুখে একটা আত্মবিশ্বাস ও বুদ্ধির ছাপ।

বসুন সুহাসবাবু—কিরীটী বললে।

সুশীলবাবু বলছিলেন, আপনি নাকি কি সব আলোচনা করতে চান।

হ্যাঁ—দু-একটা প্রশ্ন আর কি মিত্রানী সম্পর্কে।

ক্ষণকাল সুহাস মিত্র কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো—তারপর শান্ত গলায় বললে, তা শুনতে পারি কি—কি প্রশ্ন আপনার মিত্রানী সম্পর্কে? অবিশ্যি উত্তর আমার জানা থাকলে নিশ্চয়ই পাবেন।

ধন্যবাদ।

কিন্তু কিরীটীবাবু, কি হবে আর তার কথা জেনে। সে তো আজ অতীত। কোনদিনই সে ফিরে আসবে না।

শেষের দিকে কিরীটীর যেন মনে হলো, সুহাস মিত্রের গলাটা যেন কেমন রুদ্ধ হয়ে এলো।

সুহাসবাবু, আপনি তো তার একসময় সহপাঠী ছিলেন—অনেক দিনের পরিচয় আপনাদের ছিল—কিছুটা হয়ত ঘনিষ্ঠতাও ছিল—

না। পরিচয় ছিল ঠিকই—তবে ঘনিষ্ঠতা বলতে যা বোঝায় সে রকম কিছুই ছিল না।

আপনি তাকে—মানে মিত্রানীকে ভালবাসতেন?

সাধারণ একজন মার্চেন্ট অফিসের কেরানীর ভালবাসা কি আজকের দিনে ভালবাসা!

টাকা-পয়সা-মান-সম্পদ বা মর্যাদা দিয়ে তো ভালবাসার বিচার হয় না। যাক সে কথা, আপনি কি কখনো তাকে আপনার মনের কথা জানিয়েছেন?

না।

কেন?

pathagar.net

প্রয়োজন বোধ করিনি শেষ পর্যন্ত—

কেন প্রয়োজন বোধ করেননি?

কখনো কখনো মনে হতো বলি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন জানতে পারলাম—সে অন্য একজনকে ভালবাসে—

কি করে জানলেন? নিশ্চয়ই কেউ আপনাকে বলেছিল?

ধরে নিন তাই!

কিন্তু সে যে সত্য বলেছে তার প্রমাণ কি আপনি কিছু পেয়েছিলেন?

সত্য যা তার কি আবার কোন প্রমাণের দরকার হয় কিরীটীবাবু! ও-কথা থাক। আর কি আপনার জানবার আছে বলুন।

সেদিন যখন ঝড় ও ধুলোর অন্ধকারে সকলের কাছ থেকে ছিটকে পড়ে অন্ধের মত পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তখন আপনার আশেপাশে আর কারো গলা শুনছিলেন বা আর কারোর সাড়া পেয়েছিলেন কিংবা কারো কোনরকম চিৎকার বা আর্তনাদ আপনার কানে এসেছিল সুহাসবাবু?

না, তাছাড়া আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই একটা ভারী গাছের ডালের তলায় অকস্মাৎ আমি চাপা পড়েছিলাম, সব অন্ধকার হয়ে যায়—আমি জ্ঞান হারাই।

আচ্ছা ঠিক যে মুহূর্তে ঝড়টা ওঠে, তখন আপনার আশেপাশে কারা ছিল মনে আছে?

হাত দুয়েকের মধ্যে ছিল বিদ্যুৎ, আর তারই পাশে ছিল বোধ হয় মিত্রানী—

আর কাজল বোস?

ঠিক মনে নেই—তবে কাজল বোধ হয় আমার কাছাকাছিই ছিল।

হুঁ। আর একটা কথা। সেদিন যতক্ষণ গার্ডেনে ছিলেন, দূরে বা কাছে কোন তৃতীয় কাউকে আপনার নজরে পড়েছিল কি—যার মাথায় ধরুন একটা বেতের টুপি ছিল আর হাতে বা গলায় একটা বায়নাকুলার ঝোলানো ছিল?

বায়নাকুলার—বায়নাকুলার, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে—খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা সকলে যখন গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি, যেন একজনকে মুখে চাপদাড়ি, চোখে রঙিন চশমা, পরনে কালো প্যান্ট ও গায়ে স্ট্রাইপ দেওয়া একটা হাওয়াই শার্ট দেখেছিলাম বার দুই—ভদ্রলোক বায়নাকুলার দিয়ে গঙ্গার মধ্যে যেন কি দেখছিলেন—আমাদের কিছুটা দূরেই—

আপনার পরিচিত কেউ নন?

না। তাছাড়া পরিচিত হলে তো আমাদের কাছে বসতো।

ঝড়টা যখন ওঠে তখন তাকে দেখেছিলেন?

ঠিক তেমন নজর করিনি—নিজেরাই হঠাৎ ধুলোয় পড়ে বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম—

আচ্ছা সুহাসবাবু, আপনি নিশ্চয় রুমাল ব্যবহার করেন? কিরীটীর প্রশ্ন।

করি বৈকি।

সেদিন নিশ্চয়ই আপনার পকেটে রুমাল ছিল?

ছিল।

সিলকের রুমাল ছিল কি সেটা?

না মশাই, সাধারণ ক্যালিকোর রুমাল একটা—সাদা।

আপনার রুমালের কোণে নাম লেখা থাকত বা কোন চিহ্ন?

হ্যাঁ—আমার ডাক নাম টুটু—ইংরাজীতে 'টি' অক্ষরটা লেখা থাকত।

হঠাৎ পকেট থেকে একটা সিল্কের রুমাল বের করলো কিরীটী—সাধারণ জেন্টস রুমালের সাইজের থেকে সামান্য একটু বড়—তার এক কোণে ইংরাজী 'টি' অক্ষরটা সবুজ সুতো দিয়ে বোনা। বললে, দেখুন তো, এই রুমালটা একবার!

দেখি রুমালটা, রুমালটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে সুহাস বললে, আশ্চর্য!

কি হলো?

রুমালটা আমারই মনে হচ্ছে—কিন্তু—, রুমালটা কিরীটীর হাতে আবার ফিরিয়ে দিল সুহাস।

আপনারই রুমাল! এটা তো সিল্কের?

হ্যাঁ গত বছর কাজল আমার জন্মদিনে সবুজ সুতো দিয়ে 'টি' লিখে এই রুমালটাই আমাকে উপহার দিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ পিকনিকের দিন দুই আগে কোথায় যে রুমালটা ফেললাম আর খুঁজে পাই নি, অথচ মনে আছে সেটা অফিসে আমার পকেটেই ছিল।

ঠিক বলেছেন—ঠিক চিনতে পেরেছেন ওটা আপনারই রুমাল?

হ্যাঁ—তাছাড়া দেখুন ওর এক কোণে লাল কালির একটা দাগ আছে—

কথাটা মিথ্যা নয়, কিরীটী দেখতে পেল, সত্যিই এক কোণে একটা লাল কালির দাগ আছে রুমালটায়।

কিন্তু এটা—এটা আপনি পেলেন কোথায় কিরীটীবাবু? ব্যগ্র কণ্ঠেই প্রশ্ন করে সুহাস মিত্র কিরীটীকে।

এই রুমালটাই পাকিয়ে ফাঁস দিয়ে মিত্রানীকে সেদিন—

না-না-না—একটা যেন চাপা আর্তনাদ করে ওঠে সুহাস, না, না, না।

কিরীটী তাড়াতাড়ি রুমালটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। তারপর **শান্ত গলায়** ডাকল, সুহাসবাবু?

অ্যাঁ।

আপনার ফেবারিট ব্রান্ড সিগারেট **চার্মিনার, তাই না?**

হ্যাঁ—

দিনে কতগুলো সিগারেট খান?

তিন-চার প্যাকেট।

আচ্ছা আপনি মিত্রানীর হত্যার ব্যাপারে দলের মধ্যে **কাউকে সন্দেহ করেন?**

আমাদের দলের মধ্যে—না, না—এ অসম্ভব—

কিন্তু পুলিসের ধারণা, সেদিন আপনাদের মধ্যেই কেউ—

হরিব্‌ল! কি বলছেন আপনি?

আমার কি ধারণা জানেন?

কি?

ঐ ধুলোর ঝড় আর অন্ধকারের ভেতরেও আপনাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ

কিছু অস্পষ্টভাবে দেখেছেন বা শুনেছেন, যেটা সেদিন আপনাদের জবানবন্দিতে কেউই আপনারা সুশীল নন্দীর কাছে প্রকাশ করেননি—অথচ যে কথাটা জানতে পারলে মিত্রানীর হত্যাকারীকে ধরার ব্যাপারে হয়ত অনেক সাহায্য পেতো পুলিস!

আমি—আমি—আমার কথা আমি বলতে পারি—অন্তত আমি কিছু আপনাদের কাছে গোপন করিনি—সুহাস মিত্র বলে উঠলো জবাবে—

কিরীটী তার কথাটার আর জের টানলো না। সে সম্পূর্ণ অন্য এক প্রশ্ন করলো। বললে, আচ্ছা সুহাসবাবু, কাজল বোস সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

সুহাস মিত্র প্রথমটায় কিছু সময় চুপ করে রইলো তারপর ধীরে ধীরে বললে, মিত্রানীকে ও বোধ হয় একটু হিংসা করতো—

সেটা ওর সঙ্গে আমি কথা বলেই বুঝতে পেরেছি—**তা নয়, আমার প্রশ্ন আপনি** নিশ্চয়ই জানেন।

কি?

উনি আপনাকে ভালবাসেন!

জানি।

ওঁর প্রতি আপনার মনোভাবটা বোধ হয় বিপরীত?

আমি ওকে ঠিক পছন্দ করি না।

তার কোন কারণ আছে?

আসলে ও দেহে মেয়েছেলে হলেও মনের গঠনের দিক দিয়ে ঠিক যেন তা নয়—র‍্যাদার ওর মধ্যে একটা যেন পুরুষালী ভাব আছে—

মৃদু হেসে কিরীটী বললে, আপনি যে মিত্রানীকে মনে মনে ভালবেসেছিলেন, সেটা বোধ হয় উনি অনুমান করতে পেরেছিলেন!

মিত্রানীর প্রতি আমার মনোভাব তো কখনো ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে আমি প্রকাশ করিনি—

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, ভালবাসার ব্যাপারটা মুখ ফুটে প্রকাশ না করলেও মেয়েদের কাছে অস্পষ্ট থাকে না সুহাসবাবু।

॥ এগার ॥

কিরীটী আর সুব্রত সেদিন যখন উঠবে-উঠবে করছে, বিদ্যুৎ সরকার এলো।

সবাই তখন চলে গিয়েছে।

বিদ্যুৎ ঘরে ঢুকে বললে, সুশীলবাবু, আমি অত্যন্ত দুঃখিত—বিশেষ কাজে আটকা পড়ায় আসতে দেরী হয়ে গেল।

সুশীল নন্দী বললেন, ঠিক আছে, বসুন—আলাপ করিয়ে দিন—ইনি—বিদ্যুৎ সরকার আর বিদ্যুৎবাবু, এঁকে চাক্ষুষ দেখেছেন কিনা জানি না, তবে নিশ্চয়ই এঁর নাম শুনেছেন—কিরীটী রায়।

নমস্কার। ওঁর নাম আমি বহুবার শুনেছি মিত্রানীর মুখে। আজই সকালে মিত্রানীর দাদা

প্রণবেশবাবুর সঙ্গে টেলিফোনে যখন কথা হচ্ছিল, উনি বললেন, মিত্রানীর মৃত্যুর ব্যাপারটা উনি তদন্ত করছেন।

কিরীটী বললে, মিত্রানীর বাবা অবিনাশবাবুর কাছে একসময় আমি পড়েছি—স্কুলে উনি আমাদের অঙ্কের মাস্টার ছিলেন।

বিদ্যুৎ সরকার কিরীটীর মুখোমুখি একটা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে বসল, উঃ, কি প্রচণ্ড গরম—

কিরীটী বললে, আজও সকালবেলায় কাগজে ছিল সন্ধ্যার দিকে বজ্রবিদ্যুৎসহ এক পশলা ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে—

বিদ্যুৎ বললে, ছিল নাকি! আমি দেখিনি। সচরাচর ওদের আবহাওয়ার পূর্বাভাস বড় একটা মেলে না বলে আমি কখনো ও-সব দেখি না বা থাকলেও গুরুত্ব দিই না—

একেবারে যে মেলে না তা নয়, কিরীটী বললে, সেদিন কিন্তু পূর্বাভাস ঠিক মিলে গিয়েছিল—আর তাতেই হত্যাকারীর পূর্ব পরিকল্পনা সাকসেসফুলও হয়েছিল।

চকিতে বিদ্যুৎ সরকার কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

কিরীটী একটা সিগার ধরানোর ব্যাপারে ঐ মুহূর্তে ব্যস্ত থাকায় ব্যাপারটা তার নজরে না পড়লেও সুব্রতর দৃষ্টি কিন্তু এড়ায় না।

আরো কিছুক্ষণ পরে কিরীটী ও বিদ্যুৎ সরকারের মধ্যে কথা হচ্ছিল। বিদ্যুৎ সরকার যে অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে, সেটা তার চেহারা ও পোশাকেই কিছুটা যেন ধরা যায়। যেমন গাত্রবর্ণ, তেমনি সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা। চেহারার মধ্যে একটা যেন বনেদী ছাপ আছে।

বিদ্যুৎবাবু, আপনার সঙ্গে তো প্রায়ই মিত্রানীর টেলিফোনে কথাবার্তা হতো?

হ্যাঁ—মধ্যে মধ্যে হতো।

কিছুটা আপনাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও ছিল ধরে নিতে পারি বোধ হয়—কিরীটী বললে।

ঘনিষ্ঠতা বলতে আপনি কি মীন করছেন জানি না কিরীটীবাবু—তবে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা হৃদ্যতা ছিল। আমাদের কলেজ-লাইফে আরো সহপাঠিনী ছিল কিন্তু মিত্রানীকে আমার বরাবরই ভাল লাগতো ওর মিশুকে সরল মিষ্টি স্বভাবের জন্য—মনের মধ্যে কোন মার প্যাঁচ ছিল না।

আচ্ছা মিত্রানীর আপনাদের ছেলেদের মধ্যে কারোর প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ বা তার প্রতি কারো ছিল বলে আপনার মনে হয়? আপনারা তো পরস্পরের অনেক দিনের পরিচিত!

মিত্রানীর ঠিক সে রকম কারোর প্রতি ছিল বলে কখনো আমার মনে হয়নি। তবে মিত্রানী বরাবর যেমন লেখাপড়ায় ভাল ছিল, আমাদের দলের সুহাসও তাই ছিল—কলেজ-লাইফে লাইব্রেরীতে ওদের দুজনকে অনেক দিন বসে গভীর আলোচনারত দেখেছি—আর বিশেষ কিছু তেমন চোখে পড়েছে বলে তো মনে পড়ছে না। তারপর একটু থেমে বিদ্যুৎ বললে, তবে ইদানীং বছর তিনেকের বেশী কলেজ ছাড়বার পর বিশেষ তেমন একটা দেখাশোনা হতো না—ঐ সময়ে যদি কিছু হয়ে থাকে তো বলতে পারবো না।

BanglaBook.org

আচ্ছা বিদ্যুৎবাবু, দুর্ঘটনার দিন হঠাৎ যখন ধুলোর ঝড় উঠে চারিদিক ঢেকে গেল—আপনারা সকলেই পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন কিছু সময়ের জন্য, তখন কারো কোনরকম চিৎকার বা গলার শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন কি?

না তো? তবে আমার মনে হচ্ছে, একটা কথা যা সেদিন সুশীলবাবুকে বলিনি, সেটা বোধ হয় আমার বলা ভাল—

কি কথা?

ঝড় ওঠবার পরই যখন হাতড়াতে হাতড়াতে কোনক্রমে সেই ধুলোর ঘূর্ণির অন্ধকারের মধ্যে এগুচ্ছি, মনে হয়েছিল যেন কে আমাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেল—আমি 'কে' বলে চেঁচালাম, কিন্তু কারো সাড়া পেলাম না। তারপরই আরো কয়েক পা অন্ধের মত এগুতেই একটা যেন ঝটাপটির শব্দ আমার কানে এসেছিল, কিন্তু চোখে ধুলো ঢোকায় চোখ দুটো এত কর-কর করছিল, এত জ্বালা করছিল যে, নিজেকে নিয়েই তখন আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি—

কেউ আপনাকে ধাক্কা দিয়েছিল? একটা ঝটাপটির শব্দ শুনেছিলেন?

হ্যাঁ।

ঝড় ওঠবার মুহূর্তে আপনি মিত্রানীকে দেখতে পেয়েছিলেন, সে কোথায় কত দূরে ঠিক কার পাশে ছিল?

মিত্রানী ঠিক বোধ হয় আমার পাশেই ছিল।

আর কাজল বোস?

সে বোধ হয় সুহাসের কাছাকাছিই ছিল।

আচ্ছা বিদ্যুৎবাবু, আর একটা কথা, সেদিন আপনাদের আশেপাশে মুখে চাপদাড়ি, চোখে রঙিন কাচের চশমা, মাথায় বেতের টুপি, হাতে বা গলায় ঝোলানো একটা বায়নাকুলার—এমন কাউকে দেখেছিলেন কি? পরনে কালো প্যান্ট, গায়ে স্ট্রাইপ দেওয়া একটা হাওয়াই শার্ট—

না—সে রকম তো কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। আমরা নিজেদের নিয়ে এত মশগুল ছিলাম যে—

বুঝেছি, আশেপাশে তাকাবার ফুরসুৎ পাননি। তাই না?

হ্যাঁ।

আপনার বায়নাকুলার আছে বিদ্যুৎবাবু?

না।

আপনাদের দলে কারোর আছে?

বলতে পারবো না।

আপনি সিগ্রেট খান?

মাঝে-মধ্যে—

কি ব্রান্ড?

কোন স্পেশ্যাল ব্রান্ড নেই—একটা হলেই হলো, ঠিক নেশায় তো ধূমপান করি না, এমনি শখ করে দু একটা খাই। তারপরই একটু থেমে বিদ্যুৎ সরকার বললে, দেখুন মিঃ

BanglaBook.org

রায়, আপনি মিত্রানীর মৃত্যুর ব্যাপারটা একটু আগে বলেছিলেন, হত্যাকারীর পূর্বপরিকল্পিত—সত্যিই কি আপনি তাই মনে করেন?

করি।

ও! আচ্ছা, আপনার কি আমাদের মধ্যে সত্যিই কাউকে সন্দেহ হচ্ছে—

আপনার কাছে মিথ্যা বলবো না বিদ্যুৎবাবু, সেই রকমই আমার সন্দেহ হয়।

মানে অনুমান—

আচ্ছা বিদ্যুৎবাবু, রাত অনেক হলো—এবার আমি উঠবো। চল সুব্রত—

কিরীটী হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। সুব্রতও উঠে দাঁড়ায় সঙ্গে সঙ্গে।

॥ বারো ॥

ছুটির দিন বলেই হয়ত রাস্তায় অত্যন্ত ভিড়—ওদের গাড়ি কেবলই থামছিল সামনের ভিড়ের চাপে। গাড়ি এক সময় হাওড়া ব্রীজ পার হয়ে ডাইনে স্ট্র্যান্ড রোড ধরলো।

হঠাৎ কিরীটীর কথা শুনে তাকাল ওর দিকে সুব্রত।

সুব্রত!

কিছু বলছিস?

সকলের কথাই তো মোটামুটি শুনলি—

আমি সকলের কথা মন দিয়ে শুনিনি—জনাতিনেক ছাড়া—মৃদুকণ্ঠে সুব্রত বললে।

তিনজন কে কে?

সুহাস মিত্র, বিদ্যুৎ সরকার ও কাজল বোস—

হুঁ। আর কারো কথাই তাহলে তুই মন দিয়ে শুনিসনি। কান দিসনি—

না।

তবে আমার মনে হয়, যা জানতে আজ আমরা ওদের ডেকেছিলাম—তার মধ্যে কিছুটা হয় তো মিস করেছিস।

কি বলতে চাস তুই?

মানুষের মুখ যদি তার মনের ইনডেক্স হয়—একজনকে তুই মিস করেছিস মানে তার মনের কথাটা পাঠ করা হয়নি তোর।

যথা?

এখন আর তার কথা তুলে লাভ নেই—কারণ সেই বিশেষ ব্যক্তিটির কথাগুলো না শোনা থাকলে তার কথার তাৎপর্যই হয়ত ঠিক তুই বুঝতে পারবি না। থাক সে কথা—যাদের কথা তুই মন দিয়ে শুনেছিস, মানে তোর ঐ সুহাস মিত্র, বিদ্যুৎ সরকার ও কাজল বোস, তাদের সম্পর্কে তোর কি ধারণা তাই বল।

সুহাস মনে হলো সত্যিই মিত্রানীকে ভালবাসত—মিত্রানীর মৃত্যুতে সে অত্যন্ত 'শক' পেয়েছে।

আর কাজল বোস?

বেচারী সুহাসকে সে অন্ধের মতই ভালবাসে, অথচ সুহাস মনে হলো কাজলকে সহ্যই করতে পারে না যেন।

BanglaBook.org

ঠিক। আচ্ছা আর কেউ ওদের মধ্যে মিত্রানীকে ভালবাসতো বলে তোর মনে হয়?

সে রকম কিছু তো মনে হলো না।

কিন্তু আমার মনে হলো—

কি মনে হলো তোর?

ওদের মধ্যে আরো একজন মিত্রানীকে পেতে চেয়েছিল বোধ হয়—র‍্যাদার হি ওয়ানটেড টু হ্যাভ হার।

কে, কার কথা বলছিস?

সজল চক্রবর্তী—কাজেই দু'জনার আকর্ষণ একজনের বিকর্ষণের মধ্যে দিয়ে একটা জটিল ত্রিকোণ গড়ে উঠেছিল হয়ত।

জটিল ত্রিকোণ!

হ্যাঁ—আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ত্রিকোণ! আর সেই আকর্ষণ ও বিকর্ষণেরই ফল আমার মনে হচ্ছে এখন ঐ নিষ্ঠুর হত্যা। কিংবা বলা চলে ঐ আকর্ষণ বিকর্ষণের মধ্যেই মিত্রানীর নিষ্ঠুর হত্যার বীজটি রোপিত হয়েছিল। এখন কথা হচ্ছে, মিত্রানী ব্যাপারটা জানত কিনা। এবং যদি জেনে থাকত, সে কিভাবে ব্যাপারটা নিয়েছিল।

আরো একটু স্পষ্ট করে বল কিরীটী।

আপাতদৃষ্টিতে ভালবাসা ও ঘৃণা যদিও দুটি বিপরীত বস্তু—তাহলেও দেখা যায়, ভালবাসা থেকে যেমন ঘৃণার জন্ম হতে পারে, তেমনি ঘৃণারও পিছনে অনেক সময় অবচেতন মনে থাকে ঐ ভালবাসাই। এখন কথা হচ্ছে দুজনের ভালবাসাই শেষ পর্যন্ত ভালবাসাই ছিল, না ক্রমশ একদিন ঘৃণায় পর্যবসিত হয়েছিল। অথবা প্রথম থেকেই জন্ম নিয়েছিল ঘৃণা এবং সেই ঘৃণাই হয়েছিল ভালবাসা! পরস্পর-বিরোধী দুটি বস্তু—ভালবাসা ও ঘৃণা। তাই প্রথমটায় মিত্রানীর হত্যার ব্যাপারটা যতটা কঠিন বা জটিল ভাবিনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা বেশ জটিল।

মনে হচ্ছে হত্যাকারী তোর কাছে এখন খুব একটা অস্পষ্ট নেই।

অস্পষ্ট না থাকলেও এখনো খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সুহাস মিত্রের কথা যদি সত্য হয়, কাকে সে সেদিন দেখেছিল কিছুদূরে মুখে চাপদাড়ি, চোখে রঙিন চশমা, মাথায় বেতের টুপি, পরনে কালো প্যান্ট ও স্ট্রাইপ দেওয়া হাওয়াই শার্ট, হাতে বায়নাকুলার এবং যে বায়নাকুলার ও বেতের টুপি অকুস্থলে পাওয়া গিয়েছে সেগুলোর সঙ্গে সেই ব্যক্তির কোন সম্পর্ক আছে কিনা! তোর কি মনে হয়? সম্পর্ক আছে?

যদি থাকেই তো ব্যাপারটা ঠিক মেলাতে পারছি না—বেতের টুপিটা মাথা থেকে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে হয়ত উড়ে যেতে পারে, কিন্তু বায়নাকুলারটি—সেটা—সেটাই বা ওখানে, মানে ঐ স্পটে এলো কি করে? ব্যাপারটা কি একটা অসাবধানতা না ইচ্ছাকৃত, অসাবধানতা হওয়া এক্ষেত্রে উচিত নয়, আর ইচ্ছাকৃত যদি হয়েই থাকে তাহলে—

নিজের অপরাধের দায়িত্বটা কারো কাঁধে চাপানোর ইচ্ছা ছিল হয়ত তার।

ঠিক, কিন্তু কার কাঁধে—কিরীটী কথাগুলো বলতে বলতেই যেন কেমন চুপ করে যায়।

গাড়ি তখন রেড রোড ধরে ছুটে চলেছে।

হু-হু করে গাড়ির খোলা জানালা পথে হাওয়া ঢুকছে।

কিরীটীর গলার স্বর আবার শোনা যায়, প্রবাবিলিটি মোটিভ কাকে সব চাইতে বেশী ফিট ইন্‌ করে—

তোর কি তাহলে স্থির ধারণা কিরীটী—ওদেরই মধ্যে একজন—

আগে সন্দেহ থাকলেও এখন সন্দেহ মাত্র নেই সুব্রত—ওয়ান অফ দেম—হ্যাঁ, ওদেরই মধ্যে একজন।

কে?

কে তা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না বটে সুব্রত এবং মণিময় দত্ত, ক্ষিতীশ চাকী, অমিয় রায়, সতীন্দ্র সান্যাল ও পাপিয়া চক্রবর্তীকে আমি বাদ দিয়েছি—এবং ওদের বাদ দেওয়ার কারণও আমি আজই ব্যাখ্যা করেছি, শুনেছিস—

হ্যাঁ—তাহলে—বাকী তিনজনের মধ্যেই—

তিনজন তো ঠিক নয়!

তবে?

বল চারজন—বিদ্যুৎ সরকার, সুহাস মিত্র, কাজল বোস আর—

আর আবার কে? তুমি কি তাহলে সজল চক্রবর্তীকেও ঐ লিস্টে ফেলতে চাও? কিন্তু সে তো ঐ দিন কলকাতাতেই ছিল না—ভোরের প্লেনেই ফ্লাই করে চলে গিয়েছিল।

জানি, তবে সেটা এলিবিও হতে পারে—কিন্তু আমি ঠিক এই মুহূর্তে তার কথা ভাবছি না—ভাবছি সেই মুখে চাপদাড়ি, রঙিন চশমা চোখে, মাথায় বেতের টুপি, পরনে কালো প্যান্ট ও স্ট্রাইপ দেওয়া হাওয়াই শার্ট ও গলায় বা হাতে বায়নাকুলার—যাকে সুহাস মিত্র দেখেছিল—কিরীটী একটু থেমে যেন বলতে লাগল—

কে? কে সে? তার উপস্থিতিটা ঐদিন একটা নিছক ঘটনাই, না উদ্দেশ্যপ্রণোদিত—

তোর মাথায় দেখছি ঐ অজ্ঞাত ব্যক্তিটির ভূত চেপেছে!

ভূত নয় সুব্রত ভূত নয়, আমার মন বলছে—মিত্রানীর ঐ ত্রিকোণের সঙ্গে কোথাও ঐ মুখে চাপদাড়ি, রঙিন চশমাধারীর অদৃশ্য যোগাযোগ রয়েছে—হয়ত বা রহস্যের সেই নিউক্লিয়াস।

গাড়িটা ঐ সময় ধীরে ধীরে থেমে গেল।

কিরীটী আর সুব্রত দেখলো, গাড়ি বাড়ির দরজায় পৌঁছে গিয়েছে।

॥ তেরো ॥

পরের দিন ভোরবেলাতেই কিরীটী মিত্রানীদের ওখানে গিয়ে হাজির হলো। গতরাত থেকেই তার মনে হয়েছে মিত্রানীর ঘরটা একবার তার দেখা দরকার।

দোতলায় উঠতেই মাস্টারমশাই অবিনাশ ঘোষালের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। অবিনাশ ঘোষাল বারান্দায় পায়চারি করছিলেন।

কিরীটী—

মাস্টারমশায় আমি একবার মিত্রানীর ঘরটা দেখবো বলে এলাম।

বেশ তো। যাও—ঐ যে সামনের ঘরটাই, দরজা ভেজানো আছে মাত্র, সে চলে যাওয়ার পর থেকে কেউ আর ঐ ঘরে ঢোকেনি। কিরীটী—

বলুন মাস্টারমশাই—

তুমি তো আজন্ম জটিল রহস্যের মীমাংসা করছো। জীবনে অনেক গর্হিততম অপরাধের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে—

হ্যাঁ মাস্টারমশাই—আমাদের চারপাশের মানুষগুলো যাদের আমরা নিত্য দেখি—যাদের সঙ্গে হয়ত কথা বলি, হৃদ্যতা করি, ভালবাসি—তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ ঘৃণ্যতম অপরাধে যখন চিহ্নিত হয়, আমরা বিস্মিত হই, আঘাত পাই—কিন্তু বিচার করে দেখতে গেলে আঘাত পেলেও বিস্ময়ের তো কিছু নেই মাস্টারমশাই—

নেই বলছো?

না, কারণ আমাদের পরিচয় মানুষের বাইরের জগতের সঙ্গেই—তার মনোজগতের বিশেষ করে অবচেতন মনের খবর আমরা কিছুই তো পাই না। সেখানে কার মন কোন্ পথে চলেছে, কোন্ জটিল আবর্তের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে সেটির সংবাদ তো আমরা পাই না। এই মুহূর্তে আমার মনের কথাটা কি আপনার জানা সম্ভব!

ঠিক—ঠিক বলেছো কিরীটী—নচেৎ একজনকে হত্যা করে তার দেহের উপরে জঘন্য কুৎসিত অত্যাচার—

আপনি—আপনি কি করে জানলেন কথাটা মাস্টারমশাই?

জেনেছি কিরীটী, প্রণবেশই আমাকে বলছিল।

ঐ মুহূর্তে কিরীটী অবিনাশ ঘোষালের কথাটার জবাব না দিতে পারলেও পরে দিয়েছিল।

কিরীটী চুপ করে থাকে এবং কিরীটীকে চুপ করে থাকতে দেখে অবিনাশ ঘোষাল বললেন, মিতা মাকে আমি আর ফিরে পাব না জানি—কিন্তু তুমি যদি সেই পিশাচটাকে ধরতে পার— তাকে ক্ষমা করো না—ক্ষমা করো না কিরীটী—

কিরীটী এবারেও অবিনাশ ঘোষালের কথার জবাব দিল না—কেবল বললে, মিত্রানীর ঘরটা একবার আমি দেখে আসি মাস্টারমশাই—

অবিনাশ ঘোষাল আর কোন কথা বললেন না। বাইরের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় প্রাণপণে নিজের বুকের অস্থিরতাটাকে দমন করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিরীটী আর একবার সেই শোকে-দুঃখে মুহ্যমান মানুষটির দিকে তাকিয়ে নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল দরজার কপাট ঠেলে।

ঘরের জানালাগুলো বন্ধ ছিল। গোটা দুই জানালা খুলে দিতেই দিনের আলো অন্ধকার ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল। নিঃশব্দে একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতেই সিংগল খাটটার প্রায় কাছাকাছি, লেখাপড়ার টেবিলটার পাশে একটা ত্রিকোণ বুক-সেলফের প্রতি তার নজর পড়ল। থমকে যেন দাঁড়াল কিরীটী।

ত্রিকোণ বুক-সেলফটার উপরে একটা সুদৃশ্য ধূপাধার—তার পাশেই একটি কারুকার্যখচিত ফটো-ফ্রেমের মধ্যে মিত্রানীর ফটো। মিত্রানী তারই দিকে চেয়ে যেন মৃদু মৃদু হাসছে।

কয়েকদিন আগেও মেয়েটি জীবিত ছিল—আজ আর নেই। অতীব নিষ্ঠুরভাবে একটা সাদা সিল্কের রুমাল পাকিয়ে তারই সাহায্যে হত্যা করা হয়েছে।

BanglaBook.org

রুমালটার কোণে সবুজ সুতো দিয়ে লেখা ইংরাজী অক্ষর 'টি'। মনে পড়ছে ঐ সঙ্গে এক তরুণীর বুকভরা ভালবাসার উপহার তারই প্রেমাস্পদকে। কাজল বোসের দেওয়া উপহার সুহাস মিত্রকে, সুহাস মিত্র নাকি পিকনিকের—অর্থাৎ ঐ দুর্ঘটনার দিন দুই আগে কোথায় হারিয়ে ফেলে।

সুহাস মিত্র কি সত্য কথা বলেছে! যদি সত্যিই বলে থাকে তো রুমালটা হত্যাকারীর হাতে কিভাবে গেল!

তবে কি—তবে কি হত্যাকারী ইচ্ছা করেই রুমালটা চুরি করেছিল? হত্যা করবার জন্য তো সে অন্য কোন রুমালও ব্যবহার করতে পারত। এই বিশেষ রুমালটিরই বা তার প্রয়োজন হলো কেন! একটি—একটিমাত্র কারণই থাকতে পারে তার, হত্যাকারী চেয়েছিল যাতে করে মিত্রানীর হত্যার সন্দেহটা সুহাস মিত্রের উপরে গিয়ে পড়ে।

কিরীটী মনে মনে হাসে। হত্যাকারী তার পরিকল্পনা মত মিত্রানীকে যে কারণেই হোক হত্যা করতে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং যেটা সে কিরীটীর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণকে এড়িয়ে যেতে পারে নি, হত্যাকারী বাইরের বা সম্পূর্ণ অপরিচিত কেউ নয়—সে এমন একজন যার কেবল সুহাস মিত্রের বাড়িতে অবাধ গতিবিধি ছিল তাই নয়— সে সুহাসদের অনেক কথাই জানত, ওদের সকলকার ভিতরের খবর এবং সেটা একমাত্র জানা সম্ভব ছিল ঐ নয়জনেরই—হ্যাঁ, সেইখানেই কিরীটী নিঃসন্দেহ ওদের মধ্যেই কেউ একজন হত্যাকারী। গত রাত থেকেই কিরীটীর মনের মধ্যে বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। প্রবাবিলিটি, চান্স ও মোটিভের দিক থেকে ঐ নয়জনের মধ্যে কার উপরে বেশী সন্দেহ পড়ে!

কে? কে? দলের প্রত্যেকেই এক-একজন করে তার মনের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে গতকাল। আর তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজেকে নিজে একটার পর একটা প্রশ্ন করে গিয়েছে কিরীটি।

পারে নি—এখনো পারেনি শক্ত মুঠোর মধ্যে একজনকে ধরতে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল টেবিলটার সামনে কিরীটী। নানা ধরনের বই খাতাপত্র—বোঝা যায় রীতিমত পড়ুয়া ছিল মেয়েটি। খাতা বই ড্রয়ার প্রভৃতি ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ একটা মোটা সুদৃশ্য সবুজ মলাটের খাতা কিরীটীর হাতে এলো।

খাতার কয়েকটা পাতা উল্টোতেই কিরীটী বুঝতে পারল সেটা একটা ডাইরী। মুক্তার মত সুন্দর হাতের লেখা—পাতার পর পাতা লেখা। প্রথম দিকে বিশেষ কোন তারিখ নেই, যাও আছে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে—কিন্তু শেষের দিকে তারিখগুলো দেওয়া আছে। একেবারে শেষ পাতার তারিখটার দিকে তাকিয়ে যেন চমকে ওঠে কিরীটী—

১০ই মে, বুধবার, রাত দশটা পঞ্চান্ন, আজ সজল হঠাৎ সকালে এসে হাজির। আশ্চর্য হইনি কিছু—সজল যে একদিন আসবে জানতাম এবং সে যে প্রস্তাব করবে তাও জানতাম। আমার অনুমানটি যে মিথ্যা নয় সেটাই প্রমাণিত হলো। তার প্রশ্নের জবাবে বলতে বাধ্য হলাম তার প্রস্তাব আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আমি অন্যের বাগদত্তা কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে বললাম, মন জানাজানির পালা এখনো চলেছে। ভাবছি বলে দিলেই হতো স্পষ্ট করে, সুহাসের প্রতীক্ষায় আমি আজও আছি—তার কাছেই আমি বাগদত্তা।

ও যখন চলে যায় ওর মুখের দিকে তাকাতে আমার কষ্ট হচ্ছিল—কিন্তু ঐ ভাবে আমাকে পীড়াপীড়ি না করলে আজ ওর কাছে যতটুকু বলেছি সেটুকুও কখনো কারো কাছে প্রকাশ করতাম না।

কিরীটী পড়ে চলে।

ঐ পর্যন্ত ঐ পাতায়। তার পরের পাতায় একেপাশে কেবল তারিখ দেওয়া আর লেখা রাত্রি, ১৩ই মে, শনিবার।

পরশুদিন সুহাস ফোন করেছিল—সকালে। সে তো কখনো আমাকে আজ পর্যন্ত ফোন করেনি—এই তার আমাকে প্রথম ফোন।

মিত্রানী—

বল।

বলছিলাম—মানে সজল কি তোমাকে কিছু বলেছে?

বুঝতে পারলাম না সুহাসকে কি জবাব দেবো, সজল গতকাল **আমাকে যে কথাটা** বলেছিল, সেটা কি কাউকে বলা ঠিক হবে!

চুপ করে আছ কেন মিত্রানী, সজল তোমাকে কিছু বলেছিল?

বললাম, না—মানে বলছিলাম হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

সুহাস আবারও তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলো, বল না সজল তোমাকে কিছু বলেনি?

বললাম—হ্যাঁ, মিথ্যাই বললাম—না তো, সেরকম কিছু তো আমার মনে পড়ছে না সুহাস, তবে কি ঠিক তুমি জানতে চাও যদি বলতে—

আশ্চর্য—তারপরই তার প্রশ্ন : আচ্ছা মিত্রানী, সজল কি তোমাকে বলেছিল, সে তোমাকে ভালবাসে—সে তোমাকে বিয়ে করতে চায়? তার জবাবে তাকে তুমি বলেছিলে তা সম্ভব নয়—কারণ তুমি অন্য একজনকে ভালবাস?

জিজ্ঞাসা করলাম, সজল তোমাকে ঐ কথা বলেছে?

সুহাস ফোনে আবার বললে, নচেৎ আমি জানবো কি করে বল! সজলের কাছে অবিশ্যি তুমি তার নামটা বলোনি—এড়িয়ে গেছো, কিন্তু আমাকে তুমি বলতে পার কে সে— আমাদের মধ্যেই কেউ কি—

আশ্চর্য! এরপর আর কি বলতে পারি—বললাম, কি হবে নামটা জেনে তোমার?

তবু সে পীড়াপীড়ি করতে লাগল—আমি চুপ করে রইলাম। আশ্চর্য, সত্যিই কি আজো বুঝতে পারেনি সুহাস কোথায় আমার মনটা বাঁধা পড়েছে।

ফোনটা নামিয়ে রেখে চলে এলাম ঘর থেকে।

এর পরে মাত্র দুটি লাইন লেখা ডায়েরীর শেষ পৃষ্ঠায়। তারিখ নেই তবে পড়ে মনে হয় ঠিক পরের দিনই—বিকেলের দিকে আবার সজল এসেছিল—

সজল এসেছিল—

যাক, সজলের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, সজল বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা সহজ ভাবেই নিয়েছে। সজল বললে সে চায় পুরাতন বন্ধু-বান্ধবরা সকলে মিলে—বিদ্যুৎকে সে নাকি কথাটা বলেছে। যাবার আগে সজল একটা অদ্ভুত ব্যাপার করলো—ভাবতেও হাসি পাচ্ছে। সুহাসকে ওর চোখ দিয়ে আজ আমাকে চিনতে হবে—হায় রে—

কিরীটী ডাইরীটা একপাশে রেখে আরো কিছুক্ষণ বই ও খাতাপত্র ঘাঁটলো, তারপর একসময় জানালা দুটো বন্ধ করে ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

অবিনাশ ঘোষাল তখনো আগের মতই পায়চারি করছিলেন—

মাস্টারমশাই—

অবিনাশ ঘোষাল কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

মাস্টারমশাই, মিত্রানীর ডাইরীটা আমি নিয়ে যাচ্ছি!

মিত্রানীর ডাইরী? অবিনাশ ঘোষাল শুধালেন।

হ্যাঁ।

কোথায় পেলে?

ওর ড্রয়ারে—

ওঃ, আচ্ছা। যাও নিয়ে।

॥ চোদ্দ ॥

ডাইরীখানা নিয়ে রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর বসবার ঘরের সোফায় গিয়ে বসল কিরীটী একটা চুরোট ধরিয়ে।

বেশী দিন নয়—বৎসর খানেক আগের তারিখ থেকে ডাইরী লেখার শুরু, তাহলেও প্রথম পাতাতেই লিখেছে মিত্রানী—ডাইরী লিখতাম সেই কবে থেকে—কিন্তু মাঝখানে কয়েক বৎসর লিখিনি, লিখতে ইচ্ছাও হয়নি—কিন্তু আজ থেকে আবার লিখবো ভাবছি। চমৎকার ডাইরীটা পাঠিয়েছে সজল—এমন সুন্দর মরক্কো লেদারে বাঁধানো ডাইরীটা—দেখলেই কিছু লিখতে লোভ জাগে মনে। কিন্তু কি লিখি! কাকে নিয়ে শুরু করি আমার এই ডাইরী—দৈনন্দিন জীবন-কথা! ত্রিশ বৎসর বয়স হলো—অধ্যাপনা করছি। কলেজে যাই, মেয়েদের পড়াই, অবসর সময়টা বেশীর ভাগই বই নিয়ে কাটে—একা, বড় একা লাগে। মধ্যে মধ্যে মনে হয় যেন এক মরুভূমির মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি। এ যাত্রার শেষ কোথায় কে জানে।

সুহাস—সুহাস কি আজও বুঝতে পারেনি কি বুকভরা ভালবাসা নিয়ে তারই প্রতীক্ষায় প্রহর গুনে চলেছি! যার জন্য অপেক্ষা করে আছি তার সাড়া নেই—অথচ যার কথা মনেও পড়ে না ভুলেও কখনো, সে একটার পর একটা চিঠি লিখে চলেছে।

সজল, আমি বুঝি, তুমি স্পষ্ট করে না লিখলেও বুঝতে পারি, তোমার ঐ কথার গাঁথুনির ফাঁকে ফাঁকে বিশেষ কোন কথাটি তোমার মনের মধ্যে উঁকি দিতে চাইছে।

কিন্তু আমি যে অনেক আগেই দেউলিয়া হয়ে বসে আছি। কাউকেই আর দেবার মত যে অবশিষ্ট কিছুই নেই। বাবা এতদিন পর্যন্ত কখনো আমার বিয়ের কথা বলেননি—কিন্তু গতরাত্রে বলছিলেন, একটি ভাল পাত্রের সন্ধান পেয়েছি মা—সন্ধানও ঠিক নয়, পাত্রপক্ষই এগিয়ে এসেছে, তোর যদি কোন আপত্তি না থাকে তো কথা বলতে পারি।

বললাম, না বাবা—

ছেলেটি ভাল—

আমি তোমাকে ঠিক সময়ে জানাবো বাবা।

বাবা আর কোন কথাই বললেন না। অসন্তুষ্ট হলেন কিনা কে জানে! আশ্চর্য! সুহাস, এখনো তোমার সময় হলো না!

কয়েক পৃষ্ঠা পরে—

বিদ্যুতের সঙ্গে সেদিন হঠাৎ দেখা—সে বললে, কেমন আছো মিত্রানী?

ভাল।

ভাবছিলাম একদিন তোমাকে ফোন করবো—

করেছিলে নাকি?

না।

করলেও কথা হতো না—আমার সাড়া পেতে না।

কেন?

ফোনটা আজ দশদিন আউট অফ অর্ডার হয়ে আছে।

বিদ্যুৎ হো হো করে হেসে উঠলো।

তা আমার কথা হঠাৎ মনে পড়লো কেন বিদ্যুৎ?

আমার নায়িকার সন্ধানে—মানে আমার পরের বইতে মনে হচ্ছিল তোমাকে চমৎকার ফিট ইন করবে।

এবার হেসে উঠলাম আমি।

হাসলে যে?

শেষ পর্যন্ত আর মেয়ে খুঁজে পেলে না? আমার কথা ভাবছিলে?

সত্যি—বল না, করবে অভিনয়?

না।

কেন?

আমি বিয়ে করবো—

সে তো অভিনয় করলেও বিয়ে করা যায়—

না, স্ত্রী আর অভিনেত্রী একসঙ্গে হওয়া যায় না।

কিন্তু তোমাকে অনেক উদাহরণ দিতে পারি—

পারো হয়ত, কিন্তু অভিনেত্রীদের স্বামীর ঘর—কোনদিনই স্বামীর ঘর হয়ে ওঠে না, একটার গ্ল্যামার অন্যটার শান্তসুন্দর জীবনের গলা টিপে ধরতে শুরু করে পদে পদে—যার ফলে বিক্ষোভ—অশান্তি—তারপর—

কি তারপর?

হয় দুঃসহ এক জীবন-যন্ত্রণা—না হয় অকস্মাৎ একদিন পরিসমাপ্তি। না বিদ্যুৎ, মেয়ে হয়ে জন্মেছি—আমি মেয়ে হয়েই বেঁচে থাকতে চাই। গৃহিণী, সন্তানের জননী—

তা বসে আছো কেন আজো?

বসে আছি পথ চেয়ে—

কার পথ চেয়ে—আমার নয় তো!

BanglaBook.net

না—সে নহ তুমি—সে নহ তুমি—

তবে? কে সে ভাগ্যবান মিত্রা?

আচ্ছা বিদ্যুৎ—

বল।

সুহাসের খবর কি? তার সঙ্গে দেখা হয় তোমার?

হয় কদাচিৎ, কখনো। জানোই তো, নিদারুণ সিরিয়াস টাইপের ছেলে সে।

অমন ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করলো বি. এ.-তে অথচ এম. এ.-টা পড়লো না, কি এক সামান্য চাকরিতে ঢুকে গেল সাততাড়াতাড়ি।

তার সংসারের কথা তো তুমি জানো না—বাবা চাকরি করতে করতে হঠাৎ সেরিব্রাল অ্যাটাকে পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন—দুটি বিবাহযোগ্যা বোন—একটিরও বিয়ে দিতে পারেনি, গায়ের রঙের জন্য বিয়ের বাজারে বিকোয়নি বলে তাদের পড়াচ্ছে—চাকরি করা ছাড়াও গোটা দুই টিউশনী করছে।

সত্যিই আমি জানতাম না ব্যাপারটা।

॥ পনেরো ॥

কিরীটী পাতার পর পাতা পড়ে চলে ডাইরীর।

বাবা আর আমার বিয়ের কথা বলেননি। বলবেনও না জানি। বুঝি বাবা জানতে চান কোথায় আমার মন বাঁধা পড়েছে। কিন্তু কি বলবো তাঁকে? যাকে মন দিলাম তারই যে সাড়া নেই!

আজ হঠাৎ সুহাসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—কলেজ স্ট্রীটের একটা বইয়ের দোকানে। ও আমাকে দেখতে পায়নি—আমিই ওকে দেখতে পেয়ে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডাকলাম, সুহাস!

চমকে ও ফিরে তাকাল, মিত্রানী—

হ্যাঁ—চিনতে পেরেছো তাহলে!

চিনতে পারবো না হঠাৎ একথা তোমার মনে হলো কেন মিত্রানী? সুহাস বললে।

মিত্রানীকে মনে আছে আজো তোমার?

প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসলো সুহাস। কোন কথা বললো না।

বই কেনা হলো?

না।

কেন?

টাকা নেই।

আমার কাছে আছে নাও না, দেবো?

না। ধন্যবাদ।

নিতে বাধা আছে বুঝি?

তা নয়—

amarboi.net

তবে?

পাওয়াটা যেখানে সুনিশ্চিত, সেখানে হাত বাড়ানোর মধ্যে যে কতখানি লজ্জা—থাক, সে তুমি বুঝবে না।

তা তুমি এখানে এসেছিলে—কোন নতুন বই কিনতে বুঝি?

হ্যাঁ—এসেছিলাম কিন্তু বইটা আসেনি এখনো।

দুজনে একসঙ্গে দোকান থেকে বের হয়ে এলাম। পাশাপাশি হেঁটে চলেছি—সন্ধ্যা হয়ে গেলেও ঐখানে তখনো বেশ ভিড়।

কফি খাবে সুহাস?

মন্দ কি, চলো।

দুজনে গিয়ে কফি হাউসে ঢুকলাম।

কতদিন পরে আবার কফি হাউসে এলাম।

কফি হাউসটা তখন গমগম করছে। এক কোণে কয়েকজন কলেজেরই ছাত্রছাত্রী মনে হলো, একটা টেবিলে বসে জোর গলায় তর্কাতর্কি করছে। কোনমতে একটা নিরিবিলি টেবিলে গিয়ে দুজনে মুখোমুখি বসলাম। কফির অর্ডার দিলাম।

বললাম, বেশ ছিলাম কলেজ-জীবনে, তাই না!

সুহাস হাসলো নিঃশব্দে।

বরাবরই ও কথা কম বলতো—আজ যেন মনে হলো আরো গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। কফি খেতে খেতে একসময় বললাম, আচ্ছা সুহাস, তুমি কোন কমপিটিটিভ পরীক্ষা দিলে না কেন?

দিলেও হতো না।

সজল পাস করলো, আর তুমি পারতে না?

সকলের দ্বারা তো সব কিছু হয় না মিত্রানী। যা হয়েছে তাতেই আমি খুশি। কি জানো মিত্রানী, যোগ্যতার বাইরে কখনো লোভের হাত প্রসারিত করতে হয় না। ওতে করে কেবল দুঃখই বাড়ে—ওসব কথা থাক—অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে সত্যি খুব ভাল লাগছে—

সত্যি বলছো?

বাঃ, মিথ্যা বলবো কেন।

তা ইচ্ছে করলেই তো মধ্যে মধ্যে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হতে পারে—

কি হবে—তার চাইতে আজকের মত হঠাৎ দেখা হয়ে যায় যদি সেই ভাল। আকস্মিকতার যে আনন্দ আছে, নিত্যনৈমিত্তিকতার মধ্যে তা থাকে না।

সামনে শুক্রবার আমার জন্মদিন—প্রতি বছরই তোমাকে নিমন্ত্রণ করি, তুমি আসনি আজ পর্যন্ত—শুক্রবার আসবে?

গেলে তুমি খুশি হবে?

খুশির আমার অন্ত থাকবে না।

বেশ যাবো।

সত্যি বলছ?

হ্যাঁ, যাবো।

আজ শুক্রবার আমার জন্মদিন ছিল।

সজল আর সুহাস বাদে সবাই এসে হৈ-হৈ করে চলে গেল। সজল আসতে পারবে না জানি, সে দিল্লীতে ট্রেনিং-এ আছে—কিন্তু সুহাস কেন কথা দিয়েও কথা রাখলো না!

শেষ পর্যন্ত রাত ন'টা নাগাদ সুহাস এলো—হাতে একগোছা রজনীগন্ধা।

এতক্ষণে সময় হলো?

কি করি বলো, টিউশনী সেরে আসতে হলো। রাগ করেছো?

না। আজকের দিনটি টিউশনী না হয় নাই করতে।

ছেলেটার ক্ষতি হতো—সামনে তার ফাইন্যাল পরীক্ষা।

সুহাসকে প্লেট ভরে খাবার দিলাম—সব সে খেল। যাবার সময় আমার হাতে একটা মুখবন্ধ খাম দিয়ে বললে, পরে পড়ো।

বুকটার মধ্যে সে আমার কি ধুকপুকুনি। সুহাস চলে যাবার পর কম্পিত হাতে খামটা খুললাম। এক টুকরো সাদা কাগজে লেখা—রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটি লাইন :

স্বপন-পারের ডাক শুনেছি, জেগে তাই তো ভাবি
কেউ কখনো খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি॥
নয়তো সেথায় যাবার তরে নয় কিছু তো পাবার তরে,
নাই কিছু তার দাবি—
বিশ্ব হতে হারিয়ে গেছে স্বপ্নলোকের চাবি॥

গানটা আমার জানা। গুনগুনিয়ে উঠল যেন সুর আর কথাগুলো আমার বুকের মধ্যে।

চাওয়া-পাওয়ার বুকের ভিতর না-পাওয়া ফুল ফোটে,
দিশেহারা গন্ধে তারি আকাশ ভরে ওঠে।

রাত্রি বারোটা—আমার জন্মদিন। ঘুম কেন আসছে না চোখে—সুহাস-সুহাস—

॥ ষোলো ॥

দিন দুই আর কিরীটী কোথাও বেরুই হলো না। মিত্রানীর হত্যারহস্যটা যেন ক্রমশ জট পাকিয়ে পাকিয়ে জটিল হতে জটিলতর হয়ে উঠছে। সূত্রগুলো কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

ফোন এলে পর্যন্ত কিরীটী ফোন ধরে না। ফোনে কেউ ডাকলেও সাড়া দেয় না।

সারাদিন প্রচণ্ড গরমের পর কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি হাওয়ায় প্রখর তাপ-দাহ কিছুটা কমেছে।

কৃষ্ণা একটা সোফার ওপরে বসে একটা বই পড়ছে আর কিরীটী সোফার গায়ে হেলান দিয়ে সামনের ছোট টেবিলটার ওপর পা দুটো তুলে দিয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে!

বই পড়লেও কৃষ্ণার মনটা বইয়ের পাতার মধ্যে ঠিক ছিল না—সে মধ্যে মধ্যে চোখ তুলে স্বামীর দিকে তাকাচ্ছিল।

বুঝতে পারছিল কৃষ্ণা, মিত্রানীর মৃত্যুরহস্যের কোন সমাধানে কিরীটী পৌঁছতে পারেনি—তাই তার ঐ নিঃশব্দতা। বাইরের চেহারাটা যতই শান্ত হোক, ভিতরে ভিতরে তার একটা অস্থির আলোড়ন চলেছে।

চা খাবে? কৃষ্ণা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে।

চা!

হ্যাঁ, চা করে আনি—

নিয়ে এসো!

কৃষ্ণা একপাশে বইটা রেখে ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই একটু পরে সুব্রত এসে ঘরে ঢুকল দরজা ঠেলে।

সুব্রতকে ঘরে ঢুকতে দেখে কিরীটী ওর দিকে তাকাল চোখ তুলে—আচ্ছা সুব্রত।

কি?

মিত্রানী সেদিন অকস্মাৎ আক্রান্ত হবার পর নিশ্চয়ই চিৎকার করে উঠেছিল—

সেটাই তো স্বাভাবিক। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শেষ প্রতিরোধ যেমন মানুষ করে তেমনি শেষ একটা ভয়ার্ত চিৎকারও সে করে ওঠে।

তাহলে—

কি তাহলে?

কাজল বোস নিশ্চয়ই সে চিৎকার শুনেছিল—

কাজল বোস!

হ্যাঁ, সে যে ঠিক সেই মুহূর্তে মিত্রানী ও আক্রান্তকারীর আশেপাশেই ছিল সে ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ—আর তার প্রমাণ হচ্ছে কাজলেরই ভাঙা চুড়ির কয়েকটি টুকরো মৃতদেহের অনতিদূরে, যেগুলো সুশীল নন্দী পরের দিন কুড়িয়ে পেয়েছেন। কাজল বোস আমাদের কাছে সে কথা চেপে গিয়েছে—কিন্তু কেন? হোয়াট ইজ হার মোটিভ বিহাইন্ড? কি উদ্দেশ্যে?

হয়ত হত্যার ব্যাপারে জড়িয়ে যাবার ভয়ে সে মুখ খোলেনি—

হতে পারে—তবে এও হতে পারে—সে কাউকে শিল্ড করবার চেষ্টা করছে।

তোমার তাই মনে হয়?

অনুমান—অনুমান মাত্র আমার—

অসম্ভব নয় হয়তো, কিন্তু সে কে। কাকে সে আড়াল করার চেষ্টা করছে—

কাজল বোসের একমাত্র ইন্টারেস্ট সুহাস মিত্র তার প্রেমাস্পদ—কিন্তু ঐখানেই আমার যোগফলটা মিলছে না সুব্রত—

কিন্তু সুহাসই যদি হত্যা করে থাকে মিত্রানীকে—একটা বলিষ্ঠ অ্যাথলেট মানুষ—

ঠিক, ঠিক। কিন্তু সে সত্যিই ভালবাসতো মিত্রানীকে। যোগফলটা ঐখানেই বিয়োগফলে দাঁড়াচ্ছে। দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ হয়ে চার হচ্ছে না—দুই থেকে বাদ গিয়ে শূন্য দাঁড়াচ্ছে। না—ঠিক মিলছে না।

সুব্রত বললে, তবে আর কে হতে পারে?

কেন, বিদ্যুৎ সরকার—

বিদ্যুৎ সরকার—

হ্যাঁ, তুই ভেবে দেখ্—বিদ্যুৎ সরকারই সুহাসকে প্রথম আবিষ্কার করেছিল। এবং সুহাস যেখানে গাছের ডাল চাপা পড়েছিল তারই কাছাকাছি মিত্রানীর মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হয়—আর বিদ্যুৎই সেটা দেখতে পায় প্রথম। একমাত্র ঐ বিদ্যুৎ সরকারেরই যোগাযোগ ছিল মিত্রানীর সঙ্গে—

কিন্তু তাকে তো তুই প্রথম থেকেই বাদ দিয়েছিস—

কিরীটী বললে, দিয়েছি ঠিকই—কিন্তু যুক্তিরও সেটাই শেষ কথা নয়—হতেও পারে না তা।

কৃষ্ণা ঐ সময় দু'কাপ চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বললে, কখন এলে?

এই—

কিরীটী ও সুব্রতর দিকে দু'কাপ চা এগিয়ে দিল কৃষ্ণা।

তুমি খাবে না? সুব্রত শুধায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।

তোমার জুতোর শব্দ আমি পেয়েছিলাম, কৃষ্ণা হাসতে হাসতে বললে, আর এক কাপ তৈরী করেছি, তোমরা শুরু কর, আমারটা আমি নিয়ে আসছি—

কিছুক্ষণ পরে, তখনো চায়ের কাপ কারো নিঃশেষ হয়নি—

সুব্রত এক সময় বললে, তোর কথায় মনে হচ্ছে কিরীটী, সুহাস মিত্র আর কাজল বোস মিত্রানীর হত্যারহস্যের মধ্যে বেশ জটিলভাবে জড়িয়ে আছে—যেহেতু ওরা দুর্ঘটনাটা যখন ঘটে তখন খুবই কাছাকাছি ছিল—

শুধু তাই নয় সুব্রত।

তবে—

সুহাসকে মিত্রানী যেমন ভালবাসত, সুহাসও তেমনি ভালবাসত মিত্রানীকে। সেদিক থেকে একমাত্র সুহাসের প্রতি কিছুটা যে সন্দেহ জাগে না তা নয় কিন্তু মজা হচ্ছে কেউ কাউকে সে কথাটা ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয়নি—কিন্তু কেন? পরস্পরকে পরস্পরের ভালবাসা জানাবার সত্যিই কি কোথায়ও বাধা ছিল?

কৃষ্ণা বললে, হয়ত কোন তৃতীয় ব্যক্তি সজল চক্রবর্তীর মত মিত্রানীর দিক থেকে যেমন ছিল—সুহাসের দিক থেকেও তেমনি ছিল—

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকাল, আশ্চর্য কৃষ্ণা, ঐ কথাটা তো একবারও আমার মনে হয়নি—ঠিক—তৃতীয় ব্যক্তি—তৃতীয় ব্যক্তি...

সুব্রত বললে, মিত্রানীর ব্যাপারে না হয় সজল চক্রবর্তী ছিল—কিন্তু সুহাসের বেলায় কে ছিল তবে?

কৃষ্ণা শান্ত গলায় বললে, তোমার ঐ প্রশ্নের জবাব একমাত্র একজনই দিতে বোধ হয় পারে—

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বললে, তুমি বোধ হয় সুহাসের কথা বলছো কৃষ্ণা!

pathagar.net

হ্যাঁ—

জংলী এসে ঐ সময় ঘরে ঢুকল।

বাবু—

জংলীর দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণা বললে, কে এসেছে?

সুহাসবাবু বলে এক ভদ্রলোক।

কৃষ্ণা হেসে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বললে, যাক—দেখো মেঘ না চাইতেই জল স্বয়ং এসে হাজির একেবারে তোমার দরজায়।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, এখন জলটা ভালো ভাবে বর্ষিত হলেই হয়। এই জংলী যা, বাবুকে এই ঘরে নিয়ে আয়—

কৃষ্ণা উঠে দাঁড়াল—সুব্রত, রাত্রে এখানে তুমি খেয়ে যাবে কিন্তু—

ঠিক আছে। সুব্রত জবাব দেয়।

কৃষ্ণা ঘর থেকে বের হয়ে যাবার একটু পরেই সুহাস মিত্র এসে কিরীটীর ঘরে ঢুকল।

আসুন সুহাসবাবু—একটু আগে আপনার কথাই ভাবছিলাম।

সুহাস মিত্র বসতে বসতে বললে, জানি কেন ভাবছিলেন।

জানেন? কথাটা বলে কিরীটী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুহাস মিত্রের মুখের দিকে তাকাল!

হ্যাঁ—আমি সেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বাড়িতে ফেরা অবধি একটি কথাই ভেবেছি—আপনার কাছে তো অজ্ঞাত কিছুই থাকবে না কিরীটীবাবু, পেটের কথা আপনি ঠিকই বের করবেন, তার চাইতে যা সেদিন বলতে পারিনি—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক, সেটা আপনার কাছে প্রকাশ করে দেওয়াই ভাল। কিন্তু তাহলেও বলবো কিরীটীবাবু, সত্যি কথা বলতে কি ব্যাপারটা এখনো আমার কাছে যেন খুব একটা তেমন স্পষ্ট নয়—হয়ত সেই ঝড়ের শব্দের মধ্যে ভুল শুনেছি—

আমার অনুমান আপনি সেদিন কিছু শুনে থাকলে ভুল শোনেননি—ঠিকই শুনেছেন, বলুন এবারে ব্যাপারটা কি!

সুহাস মিত্র বলতে লাগল,—ঝড় আর ধুলোর ঘূর্ণির অন্ধকারের মধ্যে প্রথমটা আচমকা এমন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম যে, কোথায় কোন্ দিকে এগোচ্ছি বুঝতেই পারছিলাম না—তাছাড়া ঐ সময় আমার চোখ থেকে চশমাটা হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ায় কোথায় ছিটকে পড়ে গিয়েছিল।

হুঁ, সেদিন আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় আপনার চোখে চশমা দেখে সত্যিই একটু খটকা লেগেছিল এবং আপনার চশমার লেন্সের দিকে তাকিয়েই বুঝেছিলাম—একটু যেন বেশীই মাইনাস পাওয়ারের চশমা আপনার—অথচ সুশীল নন্দীর রিপোর্টে আপনার চশমার কথা কিছুই ছিল না। ভেবেছিলাম হয়তো সেটা সুশীল নন্দীর আপনার বর্ণনায় একটা সাধারণ 'অমিশন' মাত্র।

না—চশমা ছাড়াই আমি থানায় গিয়েছিলাম—যদিও দূরের সব কিছু দেখতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল।

চোখ কি আপনার অনেক দিন থেকেই খারাপ?

হ্যাঁ—ছোটবেলার একটা ইনজুরির জন্য বাঁ চোখের দৃষ্টিটা বরাবরই কিছুটা খারাপ

ছিল—ডান চোখেও হায়ার সেকেন্ডারি দেবার আগে থাকতেই চোখের এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে দৃষ্টিশক্তির বিপর্যয় শুরু হয়—মানে দু চোখের দৃষ্টিই ক্ষীণ হয়ে আসে।

কি রোগ?

গ্যাজুয়াল অপটিক নার্ভ অ্যাট্রোফি—ডান চোখের দৃষ্টিবাহী স্নায়ু আমার ক্রমশ শুকিয়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে বাঁ চোখটাও আরও দুর্বল হয়ে আসছে—অনেকেই জানত না সে কথাটা—বি. এ.-তে ভাল রেজাল্ট করা সত্ত্বেও যে আমি আই. এ. এস. দিই না এটাই ছিল তার মুখ্য কারণ, মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট আমি পেতাম না। অবিশ্যি বন্ধু-বান্ধবরা ধরে নিয়েছিল আমার আত্মবিশ্বাসের অভাব—ভীরুতা—কেউ বলেছে এসকেপিস্ট মেন্টালিটি—কাউকেই মুখ ফুটে আমি তবু বলতে পারিনি—আমার জীবনটাই ডুমড্—একদিন একটু একটু করে দু'চোখের দৃষ্টির উপরে চিরঅন্ধকার নেমে আসবে—অন্ধকার—ছেদহীন অন্ধকার।

সুহাস মিত্রর গলাটা যেন শেষের দিকে রুদ্ধ হয়ে এলো।

সুহাস মিত্র একটু যেন থেমে বলতে লাগল আবার,—ভগবানই যে আমার জীবনের অগ্রগতির পথে কাঁটা দিয়ে সব শেষ করে দিয়েছেন—

আর কাউকে না বলেছিলেন—না বলেছিলেন সুহাসবাবু, মিত্রানীকে কেন বললেন না কথাটা, কিরীটী শান্ত গলায় বললে।

কি হতো বলে কথাটা তাকে কিরীটীবাবু, কেবল দুঃখই দেওয়া হতো তাকে—মিত্রানী যে কি গভীর ভালবাসত আমায় আমি কি তা জানতাম না কিরীটীবাবু, জানতাম, আর জানতাম বলেই কখনো তার ডাকে সাড়া দিইনি—ভেবেছি আমার নীরবতায় যদি ক্রমশ একটু একটু করে মনটা তার অন্যদিকে ঘুরে যায়—তাই যাক।

সুহাসবাবু, সত্যিকারের ভালবাসা কি অত সহজে ভিন্নমুখী হয়? হয় না—

আগে সে কথাটা একবারও মনে হয়নি—কিন্তু মিত্রানীর মৃত্যুর পর কেবলই কি মনে হচ্ছে জানেন?

কি?

সেদিন আমাকেই হয়ত যদি সে ধুলোর ঘূর্ণি ও ঝড়ের মধ্যে অন্ধকারে খুঁজতে খুঁজতে পাগলের মত না হয়ে উঠতো তবে হয়ত অমন করে আমার কাছে থেকেই মৃত্যুকে বরণ করতে হতো না—আমার সবচাইতে বড় দুঃখ কি জানেন কিরীটীবাবু, সে জানতেও পারেনি ঐ মুহূর্তে তার অত কাছে থেকেও চশমা হারিয়ে আমি একপ্রকার ব্লাইন্ড—অন্ধ—আমি নিরুপায়—

উত্তেজিত কণ্ঠে কিরীটী প্রশ্ন করে, তা হলে আপনি কারো গলা বা চিৎকার শুনেছিলেন!

শুনেছিলাম—

কার—কার গলা শুনেছিলেন—চিনতে পেরেছিলেন সে কার গলা?

হ্যাঁ—

কার গলা?

মিত্রানীর গলা—

কি? কি বলেছিল সে?

কে? কে—আঃ ছাড়ো—সুহাস-সুহাস—তারপরই গোঁ গোঁ অস্পষ্ট একটা চাপা শব্দ—কিছু দেখতে পাচ্ছি না তখন তবু মরীয়া হয়ে সামনে এগুবার চেষ্টা করে দু'পাও এগোয়নি—একটা গাছের ডাল এসে মাথায় হঠাৎ হুড়মুড় করে পড়ল, আমি জ্ঞান হারালাম।

আর কারো গলা আপনি শোনেননি সুহাসবাবু? কিরীটী আবার শুধাল।

না।

॥ সতেরো ॥

সুহাসবাবু!

বলুন।

মিত্রানীর হত্যা-রহস্যের একটা 'জট' আমি কিছুতেই খুলতে পারছিলাম না—আপনার স্বীকারোক্তি সেই 'জট'টা খুলে দিল। আচ্ছা সুহাসবাবু, একটা কথা—

বলুন—

মিত্রানীর প্রতি সজলবাবু যে আকৃষ্ট ছিলেন সে কথাটা কি আপনি বুঝতে পেরেছিলেন কখনো?

জানতাম—

জানতেন? কি করে জানলেন?

বিদ্যুৎ একদিন আমাকে বলেছিল—

বিদ্যুৎবাবু আপনাকে কথাটা বলেছিলেন?

হ্যাঁ। কথাটা শুনে আমি, বিশ্বাস করুন কিরীটীবাবু, সুখীই হয়েছিলাম। সজল জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—মিত্রানীকে সে বিয়ে করলে মিত্রানী সুখীই হবে।

আচ্ছা ঐ দুর্ঘটনার আগে এবং গার্ডেনে সকলে মিলিত হবার পূর্বে শেষ কার কার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল বন্ধুদের মধ্যে?

সকালে বাড়িতে এসেছিল সজল এবং বিদ্যুৎ—সে এসেছিল অফিসে আমায় পিকনিকের কথাটা জানাতে পরের দিন দুপুরে।

ভাল কথা, কিরীটী বললে, দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল—১৪ মে, শনিবার—তাই না?

হ্যাঁ, তারিখটা আমার চিরকাল মনে থাকবে কিরীটীবাবু।

তারপর একটু থেমে বললে সুহাস, সেদিনটা—সরকারী এবং বেসরকারী অফিস সব বন্ধ ছিল—তাই তো শনিবার পিকনিকের জন্য স্থির করেছিল বিদ্যুৎ—

আচ্ছা বৃহস্পতিবার সকালের দিকে আপনি মিত্রানীকে ফোন করেছিলেন!

আমি মিত্রানীকে ফোন করেছি—কে বললে একথা!

মিত্রানীর ডাইরীতেই কথাটা লেখা আছে—

মিত্রানী তার ডাইরীতে লিখেছে, আমি বৃহস্পতিবার সকালে তাকে ফোন করেছিলাম?

হ্যাঁ—

BanglaBook.org

আশ্চর্য! আমি তাকে জীবনে কখনো ফোন করিনি—

আপনি জানতেন তার বাড়িতে ফোন ছিল?

জানতাম বৈকি।

কি করে জানলেন?

মিত্রানীই কলেজে একদিন আমাকে কথাটা বলেছিল।

তাহলে ১২ই মে সকালে আপনি মিত্রানীকে ফোন করেননি সুহাসবাবু?

না।

সকাল সাতটা থেকে আটটার মধ্যে সেদিন আপনি কোথায় ছিলেন, কি করছিলেন?

দোতলায় আমাদের বাসাবাড়ির বাড়িওয়ালার ছেলেকে পড়াচ্ছিলাম। মঙ্গল, বৃহস্পতি হপ্তায় দুদিন তাকে আমি পড়াই কিন্তু সত্যিই অবাক লাগছে, মিত্রানী তার ডায়েরীতে ঐ কথা লিখলো কেন? মিত্রানী তো কখনো মিথ্যা বলতো না—

হয়ত এমনও হতে পারে—

কি?

আপনার নাম করে অন্য কেউ তাকে ফোন করেছিল?

কিন্তু তাই বা কেউ করতে যাবে কেন?

আপনার ঐ প্রশ্নের জবাব হয়ত কয়েক দিনের মধ্যেই আমি দিতে পারবো সুহাসবাবু—কারণ অন্ধকার অনেকটা কেটে গিয়েছে—

কি বলছেন আপনি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কিরীটীবাবু—

কিরীটী হেসে বললে, কথামালা পড়েছিলেন ছোটবেলায়?

পড়েছি—

কথামালায় সেই নীলবর্ণ শৃগালের গল্পটা নিশ্চয়ই মনে আছে?

আছে—

শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে। ধোপার গামলায় পড়ে সেই ধূর্ত শৃগালের গায়ে যে রং লেগেছিল—তার সেই নীলবর্ণ বনের অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারদের মনের মধ্যে প্রথমটায় একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলেও অনতিকাল পরে অকস্মাৎ দৈবচক্রে তার কণ্ঠের চিরাচরিত হুক্কাহুয়া ধ্বনিই তার আসল স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল। তবে হ্যাঁ, ঐ শৃগালের ব্যাপারটা ছিল আকস্মিকই একটা ঘটনা মাত্র কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা আকস্মিক নয়, সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিত এবং স্থির মস্তিষ্কের কাজ।

কতকটা বোকার মতই যেন সুহাস কেমন অসহায় ভাবে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

কিরীটী স্মিতহাস্যে বললে, বুঝলেন না তো সুহাসবাবু?

না—মানে—

আমি বলতে চাই, কিরীটী শান্ত গলায় বললে, নো ক্রাইম ইজ পারফেক্ট!

কিছুক্ষণ হলো সুহাস মিত্র বিদায় নিয়েছে।

কিরীটী সুব্রত ও কৃষ্ণা দ্বিতীয় প্রস্থ চা নিয়ে বসেছিল। সুব্রত এতক্ষণ নির্বাক শ্রোতা

pathagar.net

ছিল, একটি কথাও বলেনি। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে এক সময় সুব্রত বললে, কিরীটী, মনে হচ্ছে কাজল বোসের ভূতটা বোধ হয় তোর কাঁধ থেকে নেমে গেছে—

কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল, না, না—আদৌ নয়—মোক্ষম তিনটি জটের একটি জট যেটা সুহাস মিত্রকে নিয়ে ছিল সেই জটটিই মাত্র খুলেছে, কিন্তু এখনো দুটো জট রয়ে গিয়েছে—

তার মধ্যে একটি বোধ হয় কাজল বোস!

হ্যাঁ—

আর বাকীটা?

সেটা হত্যাকারীকে চিহ্নিত করবার মধ্যে শেষ জট। তোকে বলেছিলাম সেদিন সুশীল নন্দীর ওখান থেকে গাড়িতে আসতে আসতে—একটা কথা নিশ্চয়ই তোর মনে আছে—মিত্রানীকে কেন্দ্র করে একটি জটিল ত্রিকোণের সৃষ্টি হয়েছিল দুটি পুরুষের আকর্ষণ ও বিকর্ষণে—

মনে আছে।

আমি বলেছিলাম মিত্রানীর হত্যার মূলে ঐ আকর্ষণ ও বিকর্ষণই—

হ্যাঁ—এবং এও বলেছিলাম, আপাতদৃষ্টিতে ভালবাসা ও ঘৃণা দুটি বিপরীত বস্তু হলেও ভালবাসা থেকে যেমন ঘৃণার জন্ম হতে পারে তেমনি ঘৃণার মূলে অনেক সময় থাকে ভালবাসা।

তুই ঠিক কি বলতে চাস কিরীটী?

বলতে চাই ঐ জটটি এখনো আমার কাছে খুলে যায়নি—আর সেটা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ হত্যাকারীর চেহারাটাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে না।

তবে কি এখনো—

না সুব্রত, হত্যাকারী এখনো কিছুটা ঝাপসা—কিছুটা ধোঁয়া—তাই ভাবছিলাম, দেখি যদি কাজল বোসের কাছ থেকে কিছুটা সাহায্য পাই—

কৃষ্ণা ঐ সময় বলে উঠল, কিছুই পাবে না।

কেন?

ভুলো না, সুহাস মিত্রের মতো পুরুষ নয় সে—নারী।

সুব্রত বললে, ঠিকই বলেছে কৃষ্ণা—ওদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, ঠিক—তবে যুধিষ্ঠিরের সেই তার মাকে অভিশাপ, কোন নারীর পেটে কোন কথা থাকবে না। তাছাড়া আমার তূণে আছে মোক্ষম অস্ত্র—

যথা? প্রশ্নটা করে সুব্রত কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

আমাদের সুহাস মিত্র—

সুহাস মিত্র?

হ্যাঁ—ভুলে যাচ্ছিস কেন সুব্রত, সুহাসের জন্য কাজল প্রাণও দিতে পারে—

কিরীটীর কথার সঠিক তাৎপর্যটা ঐদিন সুব্রত ঠিক উপলব্ধি করতে পারেনি—পেরেছিল দিন দুই বাদে।

সুহাসের সাহায্যেই কিরীটী কাজল বোসকে তার বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিল। সুব্রত

pathagar.net

বুঝতে পারেনি কিরীটীর প্ল্যানটা।

কিরীটী পরের দিন দুপুরে নিজেই গিয়েছিল সুহাস মিত্রের অফিসে।

সুহাস মিত্র কিরীটীকে দেখে অবাক।

কিরীটীবাবু আপনি!

একটা কাজ করতে হবে আপনাকে সুহাসবাবু—

বলুন কি কাজ?

আপনাদের বান্ধবী—কাজল বোসের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই—

সে তো আপনিই তাকে ডেকে পাঠিয়ে—মানে সুশীলবাবুকে বললেই তিনি ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।

তা পারবেন জানি, আমি তা চাই না। আমার ইচ্ছা আপনি তাকে কাল বা পরশু আমার ওখানে একটিবার যদি আসতে বলেন—

আমাকেই বলতে হবে?

হ্যাঁ—কারণ আপনাকে দিয়ে বলানোর মধ্যে আমার একটা উদ্দেশ্য আছে—

সুহাস যেন কি ভাবলো, তারপর বললে, বেশ তাই হবে—তবে আজ তো হবে না—কাল শনিবার আছে, দুটোয় অফিসের ছুটির পর আমি তার ওখানে যাবো—রবিবার আসতে বলবো—

খুব ভাল।

॥ আঠারো ॥

রবিবার সকালের দিকে কাজল বোস এলো।

কিরীটী কাজল বোসের অপেক্ষাতেই ছিল—এবং জংলীকে বলে রেখেছিল কাজল বোস এলে যেন সে তাকে তার ঘরে পৌঁছে দেয়।

জংলীর সঙ্গে কাজল বোস ঘরে ঢুকতেই কিরীটী বললে, আসুন, মিস বোস—কতকগুলো ব্যাপার আপনার সঙ্গে আমি আলোচনা করতে চাই, তাই আপনাকে কষ্ট দিতে হলো, বসুন।

কাজল কিরীটীর কথার কোন জবাব দিল না—অল্প দূরে সুব্রত চুপচাপ বসে একটা পিকটোরিয়ালের পাতা উল্টাচ্ছিল, সেদিকে একবার তাকিয়ে একটা খালি সোফায় কিরীটীর মুখোমুখি বসল।

কাজলের মুখটা গম্ভীর—যেন একটা বিরক্ত-বিরক্ত ভাব।

আপনি হয়ত বিরক্ত বোধ করেছেন মিস বোস, আপনাকে আমি বেশীক্ষণ আটকাবো না।

কাজল বোস নীরব।

মিস বোস সেই দুর্ঘটনার দিন আপনি কি ধুলোর ঝড়ে বিভ্রান্ত হয়ে হঠাৎ পড়েটড়ে গিয়েছিলেন?

না তো!

BanglaBook.org

তবে আপনার হাতের চুড়ি ভাঙল কি করে?

আমার হাতের চুড়ি—কেন আপনাকে তো সেদিন আমি বলেছিলাম, আমার ছোট ভাইঝি আমার হাতের চুড়ি টানাটানি করতে গিয়ে ভেঙে ফেলে।

হ্যাঁ বলেছিলেন মনে আছে—তবে কথাটা ঠিক আমার বিশ্বাস হয়নি—

কেন? বিশ্বাস হয়নি কেন আপনার—কেন, আপনার মনে হয়েছে যে আমি মিথ্যা বলছি!

মিথ্যা বলেছেন তা আমি বলিনি—

তবে?

আপনার বাঁ হাতে ঠিক কব্জির কাছে একটা 'অ্যাব্‌রেশন',—মানে কিছুটা ছড়ে যাওয়ার মত সেদিন দেখেছিলাম এবং তার চিহ্ন এখনো আছে, মনে হয় ওটা কিছুতে কেটে গিয়েছে—কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই আমার মনে হয়েছে—

কি মনে হয়েছে আপনার কিরীটীবাবু?

আপনি হয়ত সেদিন পড়ে গিয়েছিলেন বা কোন কারণে হাতে আঘাত পেয়েছিলেন, যার ফলে আপনার বাঁ হাতের দু-একগাছি চুড়ি ভেঙে গিয়েছিল ও কব্জির কাছে ছড়ে গিয়েছিল সেই আঘাতে।

না, সে সব কিছুই হয়নি—আপনি যা ভাবছেন!

তবে আপনার বাঁ হাতের কব্জির কাছে ঐ আঘাতের চিহ্নটা কি করে এলো?

তা ঠিক মনে নেই—হয়ত কোন সময়ে কিছু হয়েছে—

মিস বোস, যে সত্যকে আপনি ঢাকবার চেষ্টা করছেন, তাকে আপনি ঢেকে রাখতে পারবেন না। শুনুন, আমি যদি বলি, সেদিন ঝড় ও ধুলোর ঘূর্ণির মধ্যে কারো সঙ্গে আপনার ধাক্কা লেগেছিল!

ধাক্কা?

হ্যাঁ, কিংবা কারো সঙ্গে আপনার হাতাহাতি হয়েছিল—সেই সময়ই আপনার হাতের চুড়ি ভেঙে যায়।

কি পাগলের মত যা তা বলছেন?

আমি যে পাগলের মত যা-তা বলছি না মিস বোস—তার উপযুক্ত প্রমাণ থানা অফিসার সুশীল নন্দীর কাছে আছে—কিছু ভাঙা চুড়ির অংশ—যে অংশগুলো আপনার হাতের ঐ চুড়ির সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে—আর আদালত যখন সেই প্রশ্ন আপনাকে করবে—

আদালত প্রশ্ন করবে? কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে মনে হলো যেন কাজল বোসের গলার স্বর কেঁপে গেল একটু।

নিশ্চয়ই। আদালতে যখন মিত্রানীর হত্যা-মামলা উঠবে—এবং ঐ চুড়ির ব্যাপারে আপনাকে ক্রস করবে সরকারী উকিল—

আপনি—আপনি কি বলতে চান কিরীটীবাবু?

কিছুই না, কেবল সেদিন সত্য যা আপনার জ্ঞাতসারে ঘটেছিল সেইটুকুই আপনার কাছ থেকে জানতে চাই—বলুন—

আ—আমি কিছু জানি না।

জানেন। বলুন কার সঙ্গে সেদিন আপনার ধাক্কা লেগেছিল—কে সে?

আমি বলতে পারবো না—পারবো না।

আপনি বলতে পারবেন না কিন্তু আমি বলছি—তিনি সুহাসবাবু, তাই না?

না, না—তাকে আমি চিনতে পারিনি—বিশ্বাস করুন, তাকে আমি চিনতে পারিনি—

চিনেছিলেন—তাকে আপনি চিনেছিলেন মিস বোস, কিরীটীর গলার স্বর ঋজু ও কঠিন, বুঝতে পারছেন না কেন একজনকে বাঁচাতে গিয়ে ফাঁসির দড়ি আপনার দিকে এগিয়ে আসছে!

ফাঁসি! একটা আর্ত অস্ফুট চিৎকার যেন কাজল বোসের কণ্ঠ চিরে বের হয়ে এলো। তার দুই চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি।

একজনকে হত্যার অপরাধে ইনডিয়ান পেনাল কোর্ডের ৩০২ ধারায় সেই দণ্ডই দেওয়া হয়ে থাকে—কাজেই সুহাসবাবুর—

না, না—আপনি বিশ্বাস করুন কিরীটীবাবু, সুহাস নির্দোষ—সম্পূর্ণ নির্দোষ, সে মিত্রানীকে হত্যা করেনি—

তাকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাবার একটি মাত্র উপায় আছে মিস বোস—অকপটে সেদিন যা যা ঘটেছিল সেইটুকু আমার কাছে প্রকাশ করে দেওয়া। কিরীটীর গলার স্বর শান্ত কিন্তু দৃঢ়। বলুন—সেদিন ঠিক কি ঘটেছিল আপনার দৃষ্টির মধ্যে ধুলোর ঘূর্ণিঝড় ওঠাবার পর—

সত্যি বলছি, আপনি বিশ্বাস করুন কিরীটীবাবু—

আমার প্রশ্নের জবাব দিন যদি সুহাসবাবুকে বাঁচাতে চান। কেন বুঝতে পারছেন না আপনি মিস বোস—সুহাসবাবুর বাঁচবার আর কোন রাস্তা নেই বলেই আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য!

আমার কথা আপনি বিশ্বাস করবেন?

সত্য বললে কেন বিশ্বাস করবো না!

কাজল বোস অতঃপর নিজেকে যেন একটু গুছিয়ে নিলো। তারপর বলতে শুরু করল, হঠাৎ ধুলোর ঘূর্ণিঝড় ওঠবার পর আমরা প্রত্যেকেই সেই ধুলোর অন্ধকারে ছিটকে পড়েছিলাম—

জানি। তারপর?

ঝড়ের ঝাপটা থেকে বাঁচবার জন্য এলোমেলো ভাবে যে কোথায় চলেছি প্রথমটায় যেমন বুঝতে পারিনি তেমনি এও বুঝতে পারিনি কতদূর এগিয়েছি ঐ সময়—

একটা কথা মিস বোস, মিত্রানী আপনার কত দূরে ছিল?

ঠিক জানি না, তবে মনে হয়—

সুহাসবাবু—

হ্যাঁ, বোধ হয় আমার ঠিক আগেই ছিল সুহাস—**কাজল বোস থামল।**

কিরীটী বললে, বলুন, থামলেন কেন?

হঠাৎ যেন কার সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগলো—

BanglaBook.org

ধাক্কাটা লেগেছিল সামনে না পিছন থেকে, না পাশ থেকে? কিরীটীর প্রশ্ন।

মনে হয়েছিল যেন পাশ থেকেই—একটু থেমে আবার কাজল বললে, ভেবেছিলাম বুঝি সুহাসই, তাই তাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠি—কে, সুহাস—কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না—বরং যাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম সে যেন একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলো—আমি সামলাতে পারিনি নিজেকে—পড়ে যাই—

লোকটাকে আপনি ভাল করে দেখতে পাননি?

না।

তারপর?

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা অস্ফুট চিৎকার শুনতে পাই, আমি পড়ে গিয়ে ততক্ষণে আবার উঠে দাঁড়িয়েছি—একটা ঝটাপটির শব্দ—তারপরই—

কেউ কি সুহাস বলে ডেকেছিল?

না, না। তারপরই একটু থেমে কাজল বোস বলতে লাগল, এগুতে যাবো কোন-মতে—একটা গাছের ডাল এসে সামনে আছড়ে পড়ল, আবার একটা অস্ফুট চিৎকার কানে এলো। সুহাসই গাছের ডালের তলায় চাপা পড়েছিল, পরে বুঝেছিলাম। আর মিত্রানীকে আরো কিছুটা দূরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল—কাজেই সুহাস নয়, সে মিত্রানীকে হত্যা করতে পারে না। বলা শেষ করে কাজল যেন কিছুটা হাঁপাতে থাকে।

একটা কথা বোধ হয় আপনি জানেন না—

কি কথা?

কখনো হয়ত আজ পর্যন্ত চিন্তাও করতে পারেননি—

কি কথা? পুনরায় প্রশ্ন করলে কাজল বোস।

আপনি গত বছর সুহাসবাবুর জন্মদিনে তাঁকে সবুজ সুতোর নাম তুলে যে সিল্কের রুমালটা প্রেজেন্ট করেছিলেন, মিত্রানীকে সেই রুমালটার সাহায্যেই হত্যা করা হয়েছে—

কে—কে বললে?

যে রুমালটা মিত্রানীকে পেঁচিয়ে গলার ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, সেটা সুহাসবাবুরই—তিনি ঐ কথা বলেছেন পুলিসের কাছে।

কাজল বোস যেন একেবারে বোবা। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে কিরীটীর মুখের দিকে।

সামান্য একটা রুমাল নিশ্চয়ই চুরি যায়নি—এক যদি না হত্যাকারী কৌশলে তার নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সেটা হাতিয়ে থাকে কিংবা সুহাস মিত্রই নিজে সেটা ব্যবহার না করে থাকেন!

কাজল বোস যেন পাথর।

কিরীটীর শেষ কথাটার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কাজল বোস যেন এলিয়ে পড়ল সোফাটার ওপরে অসহায় ভাবে। কিরীটী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়, কি—কি হলো মিস বোস—সুব্রত, ভদ্রমহিলার চোখমুখে একটু জল দে—বোধ হয় সংজ্ঞা হারিয়েছেন!

সুব্রত বুঝতে পেরেছিল কিরীটীর অনুমান মিথ্যা নয়, তাই সে তাড়াতাড়ি উঠে পাশের টিপয় থেকে জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে হাতে গ্লাসের জল ঢেলে কাজল বোসের চোখেমুখে

ঝাপটা দিতে থাকে।

মিস বোস!

চোখের পাতায় তখনো জলের কণাগুলো লেগে আছে, কাজল বোস কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সুহাস মিত্র এসে ঘরে ঢুকল।

কাজল বোস উঠে দাঁড়াল।

তুমি—তাহলে তুমিই—কাজল বললে।

কাজল! ডাকল সুহাস।

তাকে যেন একটা থাবা দিয়ে থামিয়ে দিয়ে কাজল বললে, তুমি—তুমি এত নীচ—এত ছোট সুহাস?

কাজল—শোনো, শোনো—

এখনো—এখনো তুমি বলতে চাও—

কাজল!

শুনেছি—সব শুনেছি—কিরীটীবাবু আমাকে সব বলেছেন এইমাত্র, মিত্রানীকে হত্যা করবার আর কিছু তুমি খুঁজে পেলে না—শেষ পর্যন্ত আমারই দেওয়া রুমালটা দিয়ে—

কাজল, এসব কি বলছো তুমি!

ঠিক বলছি—তুমিই সেদিন আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলে—

আমি তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলাম! কি বলছো—তুমি কি ক্ষেপে গেলে?

সুহাস, পাপ কখনো চাপা থাকে না—

কাজল বোস আর দাঁড়াল না—টলতে টলতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ঘর থেকে বের হয়ে যেতে কেউ তাকে বাধা দিল না। সুহাস তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে—তারপর বললে, কি বলে গেল কাজল কিরীটীবাবু?

নিজের কানেই তো শুনলেন আপনি ও কি বলে গেল—

শুনেছি, কিন্তু আপনি ওকে কি বলেছেন?

রুমালটার কথা বলেছি মাত্র—

কিন্তু ধাক্কা দেওয়ার কথা কি ও বলে গেল?

সেদিন কে নাকি ওকে ধাক্কা দিয়েছিল ধুলোর ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে। তারপরই একটু হেসে কিরীটী বললে, ওর কাছে আমার যা জানবার ছিল জানা হয়ে গিয়েছে—কাজল বোসকে নিয়ে যে জটটা ছিল সেটা খুলে গিয়েছে, বাকী এখন শেষ জটটি—

কিসের জট? প্রশ্ন করে সুহাস।

মিত্রানীর হত্যারহস্যকে ঘিরে তিনটে জট ছিল—তার মধ্যে একটি খুলে দিয়েছেন সেদিন আপনি—আজ কাজল বোস খুলে দিয়ে গেল একটি—বাকী এখন শেষ জটটি। আশা করছি সেটাও খুলতে আর দেরি হবে না—

কিরীটীবাবু! সুহাস ডাকল।

বলুন।

সত্যিই কি আপনি মনে করেন—সুহাস ইতস্তত করে থেমে গেল।

BanglaBook.org

কি, আমি!

সত্যিই কি আপনি মনে করেন—দলের মধ্যে আমিই সেদিন মিত্রানীকে হত্যা করেছি?

সে কথা থাক—আপনি আগে বলুন, সেদিন কি কাজলের সঙ্গেই আপনার ধাক্কা লেগেছিল অথচ সাড়া দেননি তার ডাকে?

না, সে কাজল নয়—

তবে কে? আমার অনুমান আপনি হয়ত তাকে চিনতে পেরেছিলেন—চোখের দৃষ্টিতে নয়, হয়ত অনুভবে—স্পর্শের মধ্যে দিয়ে—

বিশ্বাস করুন তাকে আমি চিনতে পারিনি—

সুহাসবাবু, আপনারা এখনো একটা কথা জানেন না—কারণ বলা হয়নি কাউকে আপনাদের—

জানি না—কি জানি না?

মিত্রানী ওয়াজ রেপড্—

সে কি! একটা অর্ধস্ফুট চিৎকার যেন বের হয়ে এলো সুহাসের কণ্ঠ চিরে।

হ্যাঁ—এবং খুব সম্ভব প্রচণ্ড ঘৃণা ও আক্রোশের বশে হত্যাকারী প্রথমে তাকে রুমালের ফাঁস গলায় দিয়ে হত্যা করে, তারপর তাকে রেপ করে—

আমি—আমি কথাটা এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না কিরীটীবাবু!

হয়ত হত্যাকারীর মিত্রানীকে ঘিরে দীর্ঘদিনের অমিত লালসা শেষ পর্যন্ত তাকে পশুর পর্যায়ে টেনে এনেছিল, তাকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে ফেলেছিল—

কিরীটীবাবু!

বলুন।

এখনো আপনার ধারণা সে আমাদেরই একজন?

না বলতে পারলেই আমি খুশি হতাম সুহাসবাবু কিন্তু তা পারছি না—এখনো সন্দেহের জালটা যেন আপনাদেরই কাউকে ঘিরে আছে—

সুহাস আর কোন প্রতিবাদ জানাল না। কেমন যেন মুহ্যমানের মত সোফার উপরে বসে রইলো। কারো মুখেই কোন কথা নেই, যেন একটা পাষাণ-স্তব্ধতা বিরাজ করছে ঘরের মধ্যে—তারপরই যেন হঠাৎ একসময় উঠে দাঁড়াল সুহাস মিত্র এবং কোন রকম কিছু না বলে শ্লথ পায়ে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে গেল।

সিঁড়িতে সুহাস মিত্রের পায়ের শব্দটা মিলিয়ে যাবার পর সুব্রত বললে, বেচারা মনে হলো যেন অত্যন্ত কঠিন আঘাত পেয়েছে।

কিরীটী শান্ত গলায় বললে, ঐ আঘাতটা না দিতে পারলে—যাকে বলে অ্যাসিড টেস্ট সেটা হতো না এবং আসলে সত্যটাও প্রকাশ পেত না।

তুই তাহলে সুহাস মিত্রকে মুক্তি দিলি?

আপাতত।

আপাতত মানে?

কিরীটী সুব্রতর কথার কোন জবাব না দিয়ে উঠে গিয়ে ফোন ডায়েল করতে লাগল।

বার-দুই এনগেজ টোন হলো, তারপর অন্য প্রান্তে শোনা গেল, ও. সি. শিবুপুর পি. এস.—

সুশীলবাবু আমি কিরীটী—কোন খবর আছে?

আছে তবে ফোনে বলবো না—কাল আসুন না একবার—

যাবো—আচ্ছা মৃতের জামা ও শাড়ি—

এখনো থানাতেই আছে—এক্‌জিবিট হিসাবে—কেন বলুন তো?

ওগুলো আমি একবার দেখতে চাই—আর ঐ সঙ্গে স্পটটাও একবার ঘুরে দেখে আসবো ভাবছি। আচ্ছা তাহলে সেই কথাই রইলো।

কিরীটী অতঃপর রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিল।

কিরীটী ফিরে এসে সোফায় বসতেই সুব্রত শুধালো, স্পটটা একবার দেখবার কথা গত দু'দিন ধরে আমিও ভাবছিলাম!

॥ উনিশ ॥

কিরীটীর ওখান থেকে বের হয়ে সুহাস মিত্র একটু অন্যমনস্ক হয়েই যেন বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগুতে থাকে। মিত্রানীর কথাই সে ভাবছিল বোধ হয়, হঠাৎ বাস স্ট্যান্ডের কাছাকাছি আসতেই কাজলের ডাক শুনে সুহাস থমকে দাঁড়াল।

সুহাস—

কে! ও তুমি! বাড়ি ফিরে যাওনি—

না। তোমার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিলাম এতক্ষণ—

আমার অপেক্ষায়! কেন?

তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল—

কথা! কি কথা—

এই রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কথা হতে পারে না।

কিন্তু রাত অনেক হয়েছে—তোমাকে তো আবার ফিরতে হবে ট্রেনে—

সেজন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না—

কথাটা কি খুব জরুরী? জিজ্ঞাসা করলো সুহাস।

জরুরী না হলে প্রায় এক ঘণ্টা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করতাম না। চল, ঐ পার্কটায় গিয়ে বসা যাক—

সুহাস একটু চুপ করে থেকে বললে, বেশ চল—

দশ পনেরো গজ দূরেই রাস্তাটা যেখানে সামান্য একটু বেঁকেছে—সেখান থেকে রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে—একটা যাওয়ার একটা আসার—মাঝখানে ট্রামের লাইন—

একটা ট্রাম উল্টো দিকে ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে চলে গেল, একটা বাস এসে দাঁড়িয়েছে—ঐ সময়ও যাত্রীতে একেবারে যেন ঠাসাঠাসি।

দুজনে ট্রাম-রাস্তা পার হয়ে একটা পার্কের মধ্যে এসে ঢুকল। গ্রীষ্মের সময় বলেই হয়ত তখনো পার্কের মধ্যে বেশ কিছু মানুষজন রয়েছে। দুজনে এগিয়ে গেল আরো কিছুটা—একটা খালি বেঞ্চ দেখে দুজনে পাশাপাশি বসলো।

কিছুটা সময় দুজনেই চুপচাপ, দুজনেই যেন যে যার ভাবনার মধ্যে তলিয়ে আছে।

BanglaBook.org

সুহাস—হঠাৎ কথা বললো কাজল, এতদিনে আমি বুঝতে পারছি—

কি বুঝতে পারছো কাজল!

আই ওয়াজ এ ফুল—নচেৎ কথাটা আমার আরো আগেই বোঝা উচিত ছিল।

কি বলতে চাও তুমি কাজল স্পষ্ট করে বল।

বলবার তো আর কিছু নেই—

কিছুই যদি নেই তো এভাবে এখানে আমাকে টেনে নিয়ে এলে কেন?

কাজল বলতে লাগল, অবিশ্যি ব্যাপারটা যে আমি একেবারে অনুমান করতে পারি নি তা নয়—কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দিয়েছি—না, হতে পারে না। তাছাড়া আমি ভেবেছিলাম—মিত্রানীর মনটা অন্য জায়গায় বাঁধা আছে—ওরা পরস্পরকে ভালবাসে যখন তখন আমি কিছুটা নিশ্চিন্ত—

কি বলছো তুমি কাজল, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। মিত্রানী কাকে ভালবাসত—আর কেই বা মিত্রানীকে ভালবাসত—

কিন্তু সে ভুল আজ আমার ভেঙে গেছে। বুঝতে পারছি মিত্রানীর আরো অ্যাডমায়ারার ছিল—তাকে ভালবাসার জন্য আরো কেউ ছিল।

কাজল, সত্যিই বলছি তোমার হেঁয়ালি আমি একটুও বুঝতে পারছি না—

এই রকম কিছু যে আজ তোমার কাছ থেকে আমায় শুনতে হবে আমি জানতাম—

কাজল, অনেক রাত হয়ে গিয়েছে—আমাকে বাসায় ফিরতে হবে—আমি চললাম—

যাবে তো নিশ্চয়ই—তোমাকে আমি আটকাবো না—কিন্তু মন তোমার অনেক আগেই অন্য জায়গায় বাঁধা পড়েছে কথাটা আমাকে এতকাল জানতে দাওনি কেন! কেন আমাকে নিয়ে তুমি খেলা করেছো?

বিরক্তিভরা কণ্ঠে সুহাস বললে, খেলা তোমাকে নিয়ে আমি কোনদিনই করিনি কাজল, বোঝবার শক্তি থাকলে তুমি অনেক আগেই সেটা বুঝতে পারতে—

তা পারতাম হয়ত কিন্তু এও তুমি জেনো সুহাসবাবু, তোমার মুখোশটা আমি খুলে দেবো—

কাজল!

হ্যাঁ—আমি যতটুকু জানি সব কিরীটীবাবুকে বলবো।

কি বলবে?

আদালতে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেই সেটা বুঝতে পারবে—একটা বিষাক্ত জ্বালায় যেন কথাগুলো উচ্চারণ করে কাজল উঠে পড়ে হন হন করে গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

আর সুহাস যেন কেমন বিমূঢ় হয়ে বেঞ্চটার উপরে বসে রইলো।

সকাল সকালই পরের দিন কিরীটী আর সুব্রত বের হলো। থানায় যখন ওরা এসে পৌঁছাল, তখন সোয়া আটটা মত হবে—গ্রীষ্মের তাপদাহ তখনো শুরু হয়নি। থানাতেই অপেক্ষা করছিলেন সুশীল নন্দী।

কিরীটী বললে, সুশীলবাবু, চলুন আগে বটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে স্পটটা ঘুরে আসি।

বেশ চলুন—সুশীল নন্দী উঠে দাঁড়ালেন।

উইক ডে—বটানিক্যাল গার্ডেনে তেমন লোকজন বড় একটা নেই। কয়েকজন আমেরিকান টুরিস্ট ঘুরে বেড়াচ্ছিল—হাতে তাদের ক্যামেরা দুজনের।

সুশীল নন্দীই সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ওদের ঠিক যেখানে মিত্রানীর মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হয়েছিল। একটা ঝোপের মত—তারই সামনে খানিকটা খোলা জমি—কিরীটী তাকিয়ে দেখে। তারপর এক সময় সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে যায়—জায়গাটা গঙ্গার ধার থেকে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ গজ দূরে হবে। এবং গঙ্গার ধার থেকে বিশেষ করে ঐ ঝোপটার জন্য জায়গাটা নজরে পড়ে না।

কিরীটী ঘড়ি দেখে একটু দ্রুতই গঙ্গার ধার থেকে জায়গাটায় এগিয়ে গেল—ঠিক জানবার জন্য কতক্ষণ আন্দাজ লাগতে পারে ঐখানে পৌঁছাতে।

সুশীলবাবু—

বলুন!

বায়নাকুলারটা আর বেতের টুপিটা কোথায় কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল জানেন?

সুশীল নন্দীই জায়গা দুটো দেখিয়ে দিলেন।

হুঁ। ভাঙা চুড়ির টুকরোগুলো?

ঐ যে বায়নাকুলারটা যেখানে পাওয়া যায় সেইখানেই—

কিরীটীর মনে হলো মৃতদেহটা যেখানে আবিষ্কৃত হয়, সেখান থেকে জায়গাটা হাত দশেক দূরেই হবে।

হুঁ। চলুন, এবার থানায় যাওয়া যাক।

গাড়িতে উঠে সুশীল নন্দী বললেন, জায়গাটা দেখে কিছু অনুমান করতে পারলেন?

একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে—

কি বলুন তো!

হত্যাকারী বুঝতে পেরেছিল ঐ ঝোপের দিকে আসতে হলে গঙ্গার ধার থেকে ঐ পথটাই সহজ হবে এবং সেই অনুমানেই—কিরীটী থেমে গেল হঠাৎ ঐ পর্যন্ত বলে।

সুশীল নন্দী বললেন, কিন্তু তাতে কি এসে গেল—ওরা অন্য পথও তো ধরতে পারত—

তা পারত, তবে ঐটাই সামনে ছিল। আর সহজ পথ ছিল। কি জানেন সুশীলবাবু, সেদিনকার যাবতীয় ঘটনাই একটা অ্যাকসিডেন্ট বলতে পারেন—

মানে!

মানে অ্যাকসিডেন্টালি সব কিছুই যেন সেদিন খুনীর ফেবারে এসে গিয়েছিল—

সুব্রতর কাছে ঐ মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা যেন অকস্মাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল কিরীটীর আগের কথায়—সে নিঃশব্দে কিরীটীর কথা শুনতে থাকে।

কিরীটী বলতে লাগল, প্রথমত ধরুন, সেদিনকার ধুলোর ঘূর্ণিঝড়, আবহাওয়া অফিসের সেদিনের সকালের ফোরকাস্টে অবিশ্যি ছিল বিকেলের দিকে বজ্রবিদ্যুৎসহ একপশলা ঝড়বৃষ্টি হবে—যদিও সেটা সেদিন ঠিক হয়েছিল—কিন্তু নাও তো হতে পারত—সেদিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে খুনী জাস্ট টুক এ চান্স—এবং চান্সটা

BanglaBook.org

সে পেয়ে গেল ফোরকাস্ট মতো আবহাওয়া ঠিক মুহূর্তে তার ফেবারে পেয়ে। দ্বিতীয়ত ঐ ঘূর্ণিঝড় হবার দরুন তাকে, মানে খুনীকে আর কষ্ট করতে হলো না—মিত্রানী নিজেই তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল। তৃতীয়ত ওরা স্থির করছিল চাঁদনী রাত আছে, কাজেই সন্ধ্যা উতরাবার পর তারা ওখান থেকে ফিরবে—যেমন করে হোক খুনী সেটা অনুমান করতে পেরেছিল—এবং তাই যদি শেষ পর্যন্ত হতো তো সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে গঙ্গার ধার থেকে ফেরার পথে তাকে কার্যসিদ্ধি করতে হতো—

তাহলেই ভেবে দেখুন সুশীলবাবু—যদিও খুনীর সবটাই ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত—এবং তার ডিটারমিনেশন—তবু সব কিছু ঘটনাচক্রে তার ফেবারে আসায় ব্যাপারটা সহজই হয়ে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত তার কাছে—অ্যাকসিডেন্টালি সে হত্যা করবার চান্সটা পেয়ে গিয়েছিল। ভাল কথা, কাউকে এই ক'দিন ঐ জায়গাটার আশেপাশে দেখা গিয়েছে কি?

হ্যাঁ—গতকাল দুপুরে আমার লোকেরা যারা পালা করে সর্বক্ষণ নজর রাখছিল নির্দেশমত—একজনকে দেখেছে—

কি রকম দেখতে লোকটা, বয়স কত—

বয়স হবে লোকটার তেত্রিশ-চৌত্রিশের মধ্যে—পরনে একটা সাদা প্যান্ট ও সিল্কের শার্ট—চোখে রঙিন কাঁচের চশমা—একটা ট্যাক্সি করে এসেছিল লোকটা—কয়েক মিনিট জায়গাটার আশেপাশে ঘুরে আবার সে ট্যাক্সি করে চলে যায়—

ট্যাক্সি—ট্যাক্সির নম্বরটা রেখেছিল কি আপনার লোক?

না—

পালিয়ে গেল—আপনার নাকের ডগা দিয়ে সুশীলবাবু!

কে পালিয়ে গেল নাকের ডগা দিয়ে—

হত্যাকারী। মিত্রানীর ঘোষালের হত্যাকারী—

বলেন কি?

হ্যাঁ—কিন্তু থাক—একটা ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম সুশীলবাবু—হত্যাকারী ওদেরই একজন।

গাড়ি ইতিমধ্যে থানার সামনে পৌঁছে গিয়েছিল।

সুশীল নন্দী একটা সীল করা কাগজের প্যাকেট কিরীটীর সামনে টেবিলের ওপর এনে নামিয়ে রাখল। বললে, এর মধ্যে মিত্রানীর শাড়ি-সায়া-ব্রেসিয়ার-ব্লাউজ সব কিছু আছে।

প্যাকেটটা খুলতে খুলতে কিরীটী বললে, সেই বেতের টুপিটা ও বায়নাকুলারটাও আনুন—আর একবার দুটো বস্তু ভাল করে দেখবো।

সুশীলবাবু সেগুলো আলমারি থেকে বের করে এনে টেবিলের ওপর রাখলেন।

মিত্রানীর পরনে ছিল সেদিন একটা নীল রঙের মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ি। শাড়ির কিছুটা অংশ মনে হয় টানা-হ্যাঁচড়াতে ফেঁসে গিয়েছে, শাড়িটা পুরোনো বলেই বোধ হয়।

ব্লাউজের বোতামগুলো একটা বাদে বাকী নেই—ব্লাউজটা দেখতে দেখতে একটা কি যেন টেনে তুললো ব্লাউজ থেকে কিরীটী।

একটা মাঝারী সাইজের কর্কশ চুল, রঙটা কটা—

চুলটা পকেট থেকে একটা ছোট লেন্সের ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে তারই সাহায্যে পরীক্ষা করতে করতে কিরীটী বললে, এক টুকরো কাগজ দেখি সুশীলবাবু—

সুশীল নন্দী একটা প্যাডের কাগজ ছিঁড়ে দিলেন।

সেই কাগজের মধ্যে সযত্নে চুলটা রেখে কিরীটী ওদের দিকে তাকিয়ে বললে, হত্যাকারী খুবই সতর্কতা অবলম্বন করেছিল সুব্রত, এবং সব কিছু সেদিন তার ফেবারে থাকলেও নির্মম নিয়তি তাকে ফেবার করেনি শেষ পর্যন্ত।

সুব্রত হাসতে হাসতে বললে, সে তো তখুনি আমি বুঝেছিলাম কিরীটী, যখন তুই ব্যাপারটা হাতে নিয়েছিস।

সুশীলবাবু!

কিরীটীর ডাকে সুশীল নন্দী কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে সাড়া দিলেন, বলুন—

আপনার কিছু সক্রিয় সাহায্য চাই এবার আমার—

বলুন কি করতে হবে?

আপনি আজ সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে আসুন, তখন বলবো কি সাহায্য আপনার নিকট আমি চাই—তবে এইটুকু আমি বলতে পারি—মিত্রানীর হত্যাকারী আর এখন অস্পষ্ট নেই—এবং মনে হয় রহস্যের শেষ জটটাও খুলে যাবে সহজেই—

সুব্রত বললে, কিছুটা বোধ হয় আমিও অনুমান করতে পেরেছি কিরীটী। কিন্তু আমি ভাবছি—

কি?

তাহলে কি সবটাই অভিনয়—

না—অভিনয় নয়, সত্য। চল্ এবার ওঠা যাক।

সুব্রত বুঝলো এখনো মীমাংসার শেষ সূত্রটি কিরীটী তার হাতের মধ্যে পায়নি। যদিও হত্যাকারী একটা স্পষ্ট আকার নিয়েছে তার মনের মধ্যে, কিরীটী মুখ খুলতে চায় না।

॥ কুড়ি ॥

বাড়িতে ফিরে সারাটা দিন কিরীটী পেসেন্স খেলেই কাটিয়ে দিল একা একা আপন মনে—কেবল মধ্যে দু'চার জায়গায় ফোন করেছিল।

সুব্রত আর বাড়িতে ফিরে যায়নি, সে ঐখানেই ছিল। আহারাদির পর কিরীটী যখন তাসের প্যাকেট নিয়ে বসলো, সে একটা উপন্যাস নিয়ে বসেছিল।

বেলাশেষের আলো ইতিমধ্যে একটু একটু করে মুছে এসেছে যেন কখন—বাইরে বোধ হয় মেঘ করেছে—ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে।

কৃষ্ণা জংলীর হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

চা—কৃষ্ণা প্রথম সুব্রতকে একটা কাপ দিয়ে দ্বিতীয় কাপটা স্বামীর দিকে এগিয়ে দিল।

কিরীটী হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিল। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললে, আচ্ছা কৃষ্ণা, তোমার কি মনে হয়—মিত্রানী জানতে পারেনি কখনো যে কাজল বোসও সুহাসকে ভালবাসত?

BanglaBook.org

আমার মনে হয়—কৃষ্ণা বললে, কাজল বোস যেমন জানত মিত্রানী সুহাসবাবুকে ভালবাসে, তেমনি মিত্রানীও বুঝতে পেরেছিল তারই মত কাজলও সুহাসবাবুকে ভালবাসত—

তাই যদি হতো—তার ডাইরীর মধ্যে কোথাও সেই সম্পর্কে এতটুকু ইঙ্গিতমাত্রও নেই কেন?

তার কারণ হয়ত—

কি?

মিত্রানীর নিজের ভালবাসার উপর এতখানি স্থির বিশ্বাস ছিল যে, সে ওটা চিন্তা করবারও প্রয়োজনবোধ করেনি—অথবা সুহাসবাবুর দিক থেকে তার কোন উদ্বেগের কারণ আছে বলেই মনে করেনি—

কিরীটী কি যেন বলতে উদ্যত হয়েছিল জবাবে—কিন্তু বলা হলো না, ঠিক ঐ সময় ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

কিরীটী উঠে গিয়ে ফোনটা ধরলো—কিরীটী রায়—

রায়সাহেব, আমি নাইডু, ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস্-এর—

নমস্কার। যা জানতে চেয়েছিলাম জানতে পেরেছেন?

হ্যাঁ—ঐ নামে কোন প্যাসেঞ্জার সেদিনের মর্নিং ফ্লাইটে বা নুন ফ্লাইটে ছিল না রিজার্ভেশন লিস্টে।

কিছুক্ষণ অতঃপর দুজনের মধ্যে মিনিট পনেরো ধরে টেলিফোনে কথা হলো। সুব্রত লক্ষ্য করে, কিরীটীর চোখে-মুখে যেন একটা আনন্দের আভাস।

থ্যাংকু মিঃ নাইডু—থ্যাংকু—বলে কিরীটী টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

কিরীটী ফিরে এসে সোফায় বসতেই জংলী এসে ঘরে ঢুকল।

বাবু, সেদিন যে ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, তিনি এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান—

সুব্রত বললে, নাম বলেনি?

জবাব দিল কিরীটী, যা, এ-ঘরে পাঠিয়ে দে। তারপর সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বললে, কাজল বোস।

সত্যিই কাজল বোস। কিরীটীর অনুমান মিথ্যা নয়। কাজল বোস এসে ঘরে ঢুকল।

আসুন মিস বোস—

সেদিন একটা কথা আপনাকে আমি গোপন করে গিয়েছি কিরীটীবাবু—কাজল বোস বললে।

বসুন। দাঁড়িয়ে কেন। কিরীটী বললে।

কাজল বোস বললে, আপনি সেদিন আমার চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে দিলে কোনদিনই হয়ত আমার জীবনের সবচাইতে বড় ভুলটা ভাঙতো না। তারপরই একটু থেমে কাজল বললে, আশ্চর্য! আমি এত বছর ধরে বুঝতেই পারিনি যে, ওর সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে আর একজন—ছিঃ ছিঃ, আর আমি কিনা হ্যাংলার মত ওর পিছনে পিছনে এতদিন ছুটে বেড়িয়েছি—

কিরীটী শান্ত গলায় বললে, ঐ আঘাতটা আপনার প্রয়োজন ছিল বলেই কালকে ইঙ্গিতটা আমি আপনাকে দিয়েছিলাম মিস বোস। হ্যাঁ—সত্য যে সুহাসবাবু মিত্রানীকে ভালবাসতেন, কিন্তু সে ভালবাসা জানবেন কোনদিনই তার প্রকাশ পেতো না—

না, না—আপনি জানেন না। ও. এত ছোট—এত নীচ।

না মিস বোস—মানুষ হিসেবে অন্তত আমি তাকে ঐ বিশেষণগুলো দিতে পারছি না—আপনি জানেন না একটা কথা—ওর দুটো চোখের দৃষ্টি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং একদিন তার দু'চোখে চির অন্ধকার নেমে আসবে—

কি বলছেন আপনি—

তার চশমার পুরো লেন্স দেখেও কি কখনো আপনার কথাটা মনে হয়নি—

না—

হওয়া কিন্তু উচিত ছিল। আমি জানি, কোন্ কথাটা আমাকে আজ বলবার জন্য আপনি ছুটে এসেছেন—

জানেন! বিস্ময়ে তাকাল কাজল বোস কিরীটীর মুখের দিকে।

যার সঙ্গে আপনার ধাক্কা লেগেছিল—সেদিন ধুলো-ঘূর্ণির ঝড়ের মধ্যে—কে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল—

সে সুহাস—এখন আমি বুঝতে পেরেছি সে সুহাস—

না। মিস বোস—তিনি সুহাসবাবু নন। শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় কিরীটী প্রতিবাদ জানাল।

হ্যাঁ আমি বলছি—সে সুহাস ছাড়া আর কেউ হতে পারে না—আর কেউ হতেই পারে না—তবু বলে কাজল বোস।

না। আমি বলছি শুনুন, তিনি সুহাসবাবু নন মিস বোস।

তবে—তবে সে কে?

আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয়—সে-ই হত্যা করেছিল সেদিন মিত্রানীকে।

কে! কে হত্যা করেছিল সেদিন মিত্রানীকে?

যার সঙ্গে আপনার ধাক্কা লাগবার পর তাকে আপনি দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন এবং যে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল—

কে সে?

পূর্ববৎ শান্ত গলায় কিরীটী বললে, এইমাত্র বললাম আপনাকে সে-ই মিত্রানীর হত্যাকারী—

তাহলে সে সুহাস নয়?

না। তবে আপনাদের মধ্যেই একজন।

কাজল বোস অতঃপর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো মাথা নীচু করে। তারপর যখন মুখ তুললো, কাজলের দু'চোখে জল টল-টল করছে। কাজল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল তারপর বললে, আমি তাহলে যাই কিরীটীবাবু—

আসুন—

মাথাটা নীচু করে উপচীয়মান অশ্রুকে যেন রোধ করতে করতে কাজল বোস ক্লান্ত

BanglaBook.org

পা দুটো টেনে টেনে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বললে, পুওর গার্ল!

সুব্রত এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল, সে এবার বললে, কিরীটী, তাহলে সুহাস মিত্র নয়?

না।

যুক্তি দিয়ে আমি যেটা খাড়া করেছিলাম, তাহলে সেটা দেখছি ভুল। তাহলে কি সেই চোখে চশমা—দাড়িওয়ালা ব্যক্তিটিই—

কিরীটী মৃদু মৃদু হাসতে থাকে সুব্রতর কথার কোন জবাব না দিয়ে।

কিন্তু একজন ছাড়া সেই ব্যক্তি আর কে হতে পারে বুঝতে পারছি না। আচ্ছা ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের মিঃ নাইডু কার কথা বলছিলেন তোকে ফোনে—প্যাসেঞ্জার লিস্টে কার নাম ছিল না?

সজল চক্রবর্তী।

মানে।

দুর্ঘটনার দিন সকালের ফ্লাইটে তো নয়ই—নুন ফ্লাইটেও সজল চক্রবর্তীর নাম কোথাও পাওয়া যায়নি—কাজেই এটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার যে, তিনি আদৌ সেদিন কলকাতা ছেড়ে তাঁর কর্মস্থলে ফিরে যাননি—

তবে ভদ্রলোক পিকনিক পার্টিতে সেদিন ওদের সঙ্গে যোগ দিল না কেন?

সে প্রশ্নের জবাব একমাত্র সজল চক্রবর্তীই দিতে পারে। আসলে তুই সেই বেতের টুপি আর বায়নাকুলার নিয়েই বেশী মাথা ঘামিয়েছিস সুব্রত—

কিন্তু—

ওই বস্তু দুটির কোন মূল্যই যে একেবারে মিত্রানীর হত্যা-রহস্যের মধ্যে নেই তা আমি বলছি না—কিন্তু তার চাইতেও মূল্যবান সূত্র দুটি হয়ত তোর মনের মধ্যে ততটা রেখাপাত করেনি—

কোন্ দুটি সূত্রের কথা বলছিস?

এক নম্বর হচ্ছে মিত্রানীর ডাইরীর মধ্যে যে ফোনের সংবাদটি আছে, যেটা সে মনে করেছিল সুহাসের ফোন—সেটা এবং দু'নম্বর—যেটা হচ্ছে বর্তমান হত্যা-মামলার প্রধানতম সূত্র—

কি সেটা?

একটা চশমা।

চশমা!

হ্যাঁ চশমা—হ্যাঁ সুহাসবাবুর চশমা—যে চশমাটা তার চোখ থেকে ছিটকে আশেপাশেই অকুস্থানের কোথাও পড়েছিল, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেটা আর পাওয়া যায়নি। এবং ঐ চশমার পিছনের ইতিহাসটা হচ্ছে সুহাসবাবুর ক্ষীণদৃষ্টি—যার অ্যাডভানটেজ বা সুবিধা ব্যাপারটা জানা থাকায় হত্যাকারী পুরোপুরিই নিতে পেরেছিল।

কি রকম?

সুহাসবাবুর চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ না থাকলে হত্যাকারী তার রুমালটা অনায়াসেই সরিয়ে পকেটস্থ করতে পারত না ও হত্যার সন্দেহটা পুরোপুরি তার কাঁধে চাপিয়ে দিতে এত

সহজে বোধ হয় পারত না। যাক—কথাগুলো বলতে বলতে কিরীটী সহসা দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, রাত ন'টা প্রায় বাজে—

মনে হচ্ছে কারো অপেক্ষা করছিস?

হ্যাঁ—

কার, সুশীলবাবুর?

না। সজল চক্রবর্তীর।

॥ একুশ ॥

কিন্তু সে রাত্রে সজল চক্রবর্তী এলোই না।

এলো পরের দিন সকাল সাড়ে-আটটা নাগাদ।

সুব্রত গতরাতে বাড়ি চলে গিয়েছিল, এখনো ফেরেনি—কিরীটী চা-পানের পর ঐদিনকার সংবাদপত্রটা নিয়ে পাতা উল্টে উল্টে দেখছিল।

জংলী এসে ঘরে ঢুকল—বাবু, সুশীলবাবু আর একজন ভদ্রলোক এসেছেন।

এ ঘরে পাঠিয়ে দে—

আসুন সুশীলবাবু—

সুশীল নন্দী বললেন, সজলবাবুকে একেবারে তাঁর বাসা থেকেই ধরে নিয়ে এলাম—

বসুন—বসুন সজলবাবু, কিরীটী বললে।

আমাকে আজই নুন ফ্লাইটে ফিরে যেতে হবে কিরীটীবাবু, কাজেই আপনার যা বক্তব্য তা যদি একটু তাড়াতাড়ি সেরে নেন—বসতে বসতে সজল চক্রবর্তী বললে।

নিশ্চয়ই—বেশী সময় নেবো না—কয়েকটি প্রশ্নের আমি জবাব চাই মাত্র—

বলুন।

মিত্রানীদের পিকনিকের ব্যবস্থা আপনারই আগ্রহে করা হয়েছিল বিশেষ করে, তাই না?

হ্যাঁ—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার পিকনিকে যাওয়া হয়নি—

এবং মর্নিং ফ্লাইটে আপনার যাওয়া হয়নি; তাই না?

হ্যাঁ—মানে—বিশেষ একটা কাজে সেক্রেটারিয়েটে আটকা পড়ে—

কি কাজ হঠাৎ পড়েছিল সেদিন আপনার সেক্রেটারিয়েটে এবং কার সঙ্গে কাজ ছিল—

ঐ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারছি না—আই অ্যাম সরি।

খুব গোপনীয়—সিক্রেট বুঝি ব্যাপারটা?

ধরে নিন তাই—

পরের দিনও আপনি যাননি সকালে, তাই না—

না—যেতে পারিনি—

তাহলে নিশ্চয়ই মিত্রানীকে হত্যা করা হয়েছে, সে সংবাদটা আপনি পেয়েছিলেন?

না—না—

কিন্তু সংবাদপত্রে খবর বের হয়েছিল—একদল তরুণ-তরুণী বটানিক্যাল গার্ডেনে পিকনিক করতে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে এক তরুণী রহস্যজনকভাবে নিহত হয়েছে।

হবে—আমার চোখে পড়েনি—

হ্যাঁ—আপনি কবে প্রথম সংবাদটা পান?

পরশুর আগের দিন—সজল চক্রবর্তী বললে।

কি করে পেলেন? মিত্রানীদের বাড়িতে ফোন করেছিলেন?

হ্যাঁ—ফোন করতেই প্রণবেশবাবুর মুখ থেকে সংবাদটা পাই।

তা হঠাৎ সেখানে ফোন করতে গিয়েছিলেন কেন?

ওদের পার্টি কেমন হলো সেটা জানবার জন্য—

কিরীটী মৃদু হেসে বললো, কিন্তু আমি যদি বলি মিঃ চক্রবর্তী, ব্যাপারটা আপনি ঘটনার দিনই জানতে পেরেছিলেন—

না, না—কি বলছেন আপনি!

হ্যাঁ—কারণ ছদ্মবেশে পিকনিকের দিন ইউ ওয়্যার প্রেজেন্ট অন দি স্পট।

আপনি কি পাগল হয়েছেন কিরীটীবাবু? সারাদিন আমি চীফ সেক্রেটারির কাছে ব্যস্ত ছিলাম, তাঁর ঘরেই আমি লাঞ্চ পর্যন্ত করেছি—

একটা কথা আপনাকে আমার জানানো কর্তব্য—আপনাদের বর্তমান চীফ সেক্রেটারী আমার বিশেষ বন্ধু—

আ—আপনি—

হ্যাঁ—কাজেই ব্যাপারটা সত্য-মিথ্যা এখুনি আমার কাছে যাচাই করা হয়ত খুব একটা অসুবিধা হবে না—নাউ টেল মি—বলুন কোথায় ছিলেন আপনি সারাটা দিন—

ক্ষমা করবেন—আমি বলতে পারবো না।

পারবেন না! ঠিক আছে—তবে জানবেন আপনার ঐ ইচ্ছাকৃত গোপনতা হয়ত আপনাকে ফাঁসির দড়ির দিকে ঠেলে দিতে পারে।

সজল তথাপি মুখ খুললো না। চুপ করে রইলো সে।

আর একটা প্রশ্নের জবাব দিন?

সজল চক্রবর্তী কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল নিঃশব্দে।—আপনি সেবার অনেক দিন পরে কলকাতায় এসে মিত্রানীর ওখানে গিয়ে তাকে বিয়ের প্রোপাজাল দিয়েছিলেন?

কে বললে আপনাকে?

মিত্রানীর ডাইরীতে তাই লেখা আছে।

হ্যাঁ, দিয়েছিলাম। আমি জানতাম না যে সে সুহাসকে ভালবাসে মনে মনে—তাহলে কখনোই তাকে ঐ ধরনের প্রোপোজাল দিতাম না।

আপনি জানলেন কি করে সে কথা যে মিত্রানী মনে মনে সুহাসকে ভালবাসত?

জানতে পেরেছি—

কি করে জানলেন? মিত্রানী কি সে কথা আপনাকে বলেছিলেন সেদিন?

না।

তবে?

জেনেছিলাম।

তাকে ফোন করেছিলেন পরের দিন, তাই না?

ফোন?

হ্যাঁ। ফোন করেছিলেন আপমি তাকে—সুহাসের নাম করে—মানে যে সন্দেহটা আপনার জেগেছিল সেটা মেটাবার জন্য।

সুহাসের নাম করে আমি তাকে ফোন করতে যাবো কেন?

করেছিলেন—তাই বলছি বলুন, কেন নিজের নাম না করে সুহাসের নাম করেছিলেন—

বললাম তো—সুহাসের নাম করে তাকে আমি ফোন করিনি।

সজলবাবু, আপনি সাপ নিয়ে খেলা করছেন—

ভয় দেখাচ্ছেন?

না, ভয় না। আদালতে যা সত্য তা যখন প্রমাণ হবে—

আপনার আর কোন কথা আছে?

না। কিন্তু সজলবাবু এখনো আপনি ভেবে দেখুন, মিত্রানীর হত্যার ব্যাপারে আপনি বিশ্রীভাবে জড়িয়ে পড়ছেন—এখনো যা সত্য, অকপটে তা বলুন—নচেৎ আপনার চাকরি তো যাবেই—অপমানের চূড়ান্ত হবেন।

ঠিক আছে—ধরুন আমিই না হয় ফোন করেছিলাম—

আসল ব্যাপারটা জানার জন্য—

ধরুন তাই—

কোথা থেকে ফোনটা করেছিলেন—

পাবলিক বুথ থেকে—

না। আচ্ছা আর একটা কথা—

আমি আর আপনার কোন কথার জবাব দেবো না। দরকার যদি হয়ই তো আদালতেই দেবো—

তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে—

আমি উঠলাম—বলে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সজল এবং আর দ্বিতীয় কোন বাক্য উচ্চারণ না করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে একটা স্তব্ধতা ভঙ্গ করে সুশীল নন্দীই কথা বললেন, আশ্চর্য! ভদ্রলোক একজন দায়িত্বশীল অফিসার হয়ে এমন ব্যবহার করলেন কি করে—আগাগোড়া একেবারে মিথ্যা স্টেটমেন্ট দিয়ে গিয়েছেন—

আরো কিছু আছে সুশীলবাবু, মিত্রানীর হত্যাকারীকে কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করাতে গেলে আমাকে আরো কিছু প্রমাণ জোগাড় করতে হবে।

আপনি মিত্রানীর হত্যাকারীকে তাহলে ধরতে পেরেছেন?

পেরেছি সুশীলবাবু। তবে প্রমাণ, আরো কিছু প্রমাণ চাই—কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে অত বড় অভিযোগটা একজনের উপর চাপানো যায় না। তাছাড়া আপনি তো জানেন—আদালত অনুমান চায় না—চায় প্রমাণ—অকাট্য প্রমাণ।

pathagar.net

আচ্ছা কিরীটীবাবু, আপনার কি ধারণা সেদিন গার্ডেনে সজলবাবু উপস্থিত ছিলেন?

শুধু উপস্থিত থাকলেই তো হবে না সুশীলবাবু—ঘটনার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও সক্রিয় যোগাযোগ থাকা চাই—সে-রকম কিছু যতক্ষণ না আপনার হাতের মুঠোয় আপনি পাচ্ছেন, তাকে আপনি স্পর্শ করতে পারবেন না। আইনের ফাঁক দিয়ে তিনি গলে বের হয়ে যাবেন।

আমার কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কিরীটীবাবু—সুশীল নন্দী বলতে গিয়ে যেন কেমন ইতস্তত করেন।

কি মনে হচ্ছে সুশীলবাবু?

সেই চোখে রঙিন চশমা, মুখে দাড়ি, হাতে বায়নাকুলার, মাথায় বেতের টুপি, পরনে কালো প্যান্ট ও স্ট্রাইপ দেওয়া হাওয়াই শার্ট—যাকে সুহাসবাবু সেদিন দেখেছিলেন গার্ডেনে তাঁদের কিছু দূরে—

আমি যদি বলি সুহাসবাবু যাকে সেদিন দেখেছিলেন গার্ডেনে অল্প দূরে, সে ব্যক্তির সঙ্গে মিত্রানীর হত্যাকাণ্ডের কোন সম্পর্ক নেই—

সম্পর্ক নেই!

না।

কিন্তু তাহলে অকুস্থানে ঐ বেতের টুপি ও বায়নাকুলার যা পাওয়া গিয়েছে—সেটা ব্যাখ্যা কি করবেন কিরীটীবাবু?

হয়ত ঘটনাচক্রে ঐ হঠাৎ ধুলোর ঘূর্ণিঝড়ে বায়নাকুলারটা তার হাত থেকে পড়ে যায় ও সেই সঙ্গে মাথার বেতের টুপিটা—

সুব্রত ঐ সময় বললে, কিন্তু এমনও হতে পারে কিরীটী—

কি? কিরীটী সহাস্যে সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল—

সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তি একজন সেদিন ঐ গার্ডেনে ওদেরই মত হাজির হয়েছিল, তারপর বিকেলের দিকে অকস্মাৎ ধুলোর ঘূর্ণিঝড় ওঠায় দৈবক্রমে ঐ দলের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে—

বল্—থামলি কেন? তারপর?

তারপর হয়ত মিত্রানীর মৃত্যুর ব্যাপারটা জানতে পেরে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা পলিসি নিয়েছে—কে চায় ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে বল্?

আমারও অনুমান ঠিক তাই সুব্রত—কাজেই ঐ ব্যক্তিটির আদি মধ্য ও শেষ জানতেই হবে যেমন করে হোক এবং সেইটাই আমার তৃতীয় জট মিত্রানীর হত্যা-রহস্যের।

সুশীল নন্দী কোন কথা বলেন না। কেমন যেন একটু বিব্রতভাবেই চুপ করে বসে থাকেন।

সুশীলবাবু—

বলুন—কিরীটীর ডাকে সুশীল নন্দী ওর দিকে তাকালেন।

আমাদের দৃঢ় ধারণা ওদের মধ্যে কেউ না কেউ ঐ ব্যক্তিটির **পরিচয় ও সমস্ত রহস্য** জানেন—

তাহলে ওদের সকলকে ডেকে আবার **জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়**—

হবে না। কোন ফল হবে তাতে করে—

তাহলে?

তা হলেও ভয় নেই! তাকে আমরা খুঁজে বের করবোই।

কেমন করে?

আপাতত এই মুহূর্তে সেটা আপনাকে বলতে পারছি না। তবে একটা কথা এর মধ্যে আছে—একমাত্র সুহাসবাবু ছাড়া কেউ তাকে দেখেননি অথচ সুহাসবাবুর চোখের দৃষ্টি তেমন প্রখর ছিল না—তাঁর চোখের ব্যাধির জন্য—কাজেই আমার মনে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সুহাসবাবু নয়—অন্য কেউ লোকটিকে দেখেছিল—সে-ই এক সময় সুহাসবাবুকে কথাটা বলায় সুহাসবাবু হয়ত তাকিয়ে দেখেছিলেন—

কিন্তু কথাটা তাহলে সুহাসবাবু একবারও বললেন না কেন?

সুহাসবাবুকে যতটুকু আমি স্টাডি করতে পেরেছি সুশীলবাবু, যাকে বলে সত্যিকারের ভদ্রলোক, তাই তিনি—তিনি হয়ত পরে ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে মুখটা বন্ধ করে রেখেছেন, পাছে কেউ বিশ্রীভাবে জড়িয়ে পড়ে ঐ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে। কিন্তু আমি বের করে নেবো তাঁর মুখ থেকে কথাটা—তারপর একটু থেমে বললে কিরীটী, ঐ রুমাল-রহস্যটা আমার কাছে অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে—

রুমাল রহস্য? শুধালেন সুশীল নন্দী।

হ্যাঁ, যে রুমালের সাহায্যে মিত্রানীকে সেদিন হত্যা করা হয়েছিল।

রুমালটা একমাত্র সুহাসবাবুকে কাজল বোস প্রেজেন্ট করেছিল, তারপর রুমালটা খোয়া যায়, এইটুকুই তো মাত্র আমরা জানতে পেরেছি আজ পর্যন্ত—

ঐটুকুই নয়—আরো কিছু আছে, যদি সেই ব্যক্তি ওদের কারো পরিচিত জনই হয় তাহলে আমাদের একান্তই জানা দরকার কেন সেদিন সে ঐখানে এসেছিল—তার আসার কি উদ্দেশ্য ছিল।

সমস্ত ব্যাপারটা যেন ক্রমশ আরো জটিল হয়ে উঠছে কিরীটীবাবু—সুশীল নন্দী বললেন।

ভয় নেই সুশীলবাবু, জটিলতা যাই হোক, আশা করছি সুহাসবাবুর সাহায্য আমরা পাবো। আপনি কাল বাদে পরশু আসবেন—বোধ হয় সে সময় এ রহস্যের মেঘনাদকে আপনার সামনে উপস্থাপিত করতে পারবো—

সুশীল নন্দী অতঃপর বিদায় নিলেন।

কিরীটী সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, শুভস্য শীঘ্রম—চল্ সুব্রত একটু ঘুরে আসা যাক—

কোথায় যাবি?

সুহাসবাবুর ওখানে—এখন হয়ত তাকে তার অফিসেই পাওয়া যাবে—

কিন্তু সেখানে—

সে একটা ব্যবস্থা হবে, চল্—ওঠ্।

॥ বাইশ ॥

সুহাস মিত্রকে তার অফিসে পাওয়া গেল না। সুহাস সেদিন অফিসেই আসেনি। কিরীটী আর সুব্রত তখন সোজা তার কলুটোলার বাড়িতে গেল।

সুহাস বাড়িতেই ছিল। বাইরের ঘরে জানালা দরজা সব বন্ধ করে একটা টেবিল ফ্যান চালিয়ে দিয়ে—পরনে একটা লুঙ্গি আর ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি—সুহাস শুয়ে ছিল।

বাচ্চা চাকরটা খবর দিতে তাড়াতাড়ি সে উঠে বসল—আসুন—কে!

চশমাটা চোখে ছিল না, পাশেই ছিল, তাড়াতাড়ি চশমাটা তুলে সুহাস চোখে পরে নিল, কিরীটীবাবু, সুব্রতবাবু—আপনারা—

আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম সুহাসবাবু, কিরীটী বললে।

না, না, বিরক্তির কি আছে, বসুন। কিন্তু হঠাৎ আমার কাছে—

কিরীটী আর সুব্রত বসলো চৌকিটার উপরেই, কারণ বসবার আর কোন জায়গা ছিল না।

বলুন কি ব্যাপার?

সেই পুরোনো প্রশ্নটাই আবার করছি সুহাসবাবু, কিরীটী বললে, কার কাছে আপনি শুনেছিলেন মিত্রানী অন্য কাউকে ভালবাসে? আপনাদের বন্ধু সজল চক্রবর্তী কি?

না।

তবে?

সে কথা আর কেন কিরীটীবাবু, যা চিরদিনের মতই চুকেবুকে গিয়েছে—যা অতীত, তাকে আজ আর বর্তমানে টেনে এনে লাভ কি?

লাভ আপনার দিকে কিছু না হলেও, ব্যাপারটা জানতে পারলে আমার পক্ষে মিত্রানীর হত্যা-রহস্যের শেষ জটটি খুলতে হয়ত অনেকটা সুবিধা হতে পারে। তাছাড়া মিত্রানীকে তো আপনি সত্যিই ভালবাসতেন সুহাসবাবু, আপনি কি চান না তার হত্যাকারী শুধু হত্যাকারীই নয়, যে তার মৃতদেহটার উপর জঘন্য অত্যাচার করতে পর্যন্ত এতটুকু দ্বিধা বোধ করেনি সে ধরা পড়ুক!

সুহাস চুপ করে রইলো।

বলুন সুহাসবাবু, মিত্রানীর প্রতি আপনার ভালবাসার কি কোন দায়িত্বই নেই?

কিরীটীবাবু, আমাকে অনুরোধ করবেন না—

বেশ—একখণ্ড কাগজে আমি নামটা লিখে এনেছি সেটা দেখুন একটিবার—বলতে বলতে কিরীটী পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা ছোট কাগজ বের করে সুহাসের দিকে এগিয়ে দিল, দেখুন তো নামটা—মেলে কিনা—

সুহাস কাগজের ভাঁজ খুলে নামটা পড়ে যেন একেবারে বোবা হয়ে বসে রইলো, তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হয় না। কাগজটা হাতেই ধরা থাকে তার।

বুঝেছি আর আপনাকে বলতে হবে না—দিন কাগজটা—বলে সুহাসের হাত কাগজটা নিয়ে কিরীটী কাগজটা সুব্রতর দিকে এগিয়ে দিল, পড়ে দেখ্ সুব্রত নামটা—এই মিত্রানীর হত্যাকারী—

সুব্রতও যেন নামটা পড়ে একেবারে বোবা হয়ে যায়।

সে শুধু অস্ফুট কণ্ঠে একটি মাত্র শব্দই উচ্চারণ করলো, আশ্চর্য!

ভাবতেই পারিসনি বোধ হয় ব্যাপারটা—কিরীটী বললে—

না।

কিন্তু তিনটি কারণে তোরও সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল—প্রথমত ঝড় ঠিক ওঠবার মুখে ঐ লোকটিই ছিল মিত্রানীর একেবারে কাছের জন—দুই রুমালটা—তিন ওরই পরামর্শে সম্ভব সজল চক্রবর্তী সেদিন সুহাসের পরিচয়ে মিত্রানীকে ফোন করেছিল। আর সর্বশেষ যেটা, কেউ ভাবেনি কখনো—মিত্রানীর প্রতি মানুষটার লোভ থাকতে পারে—সে যে কথাটা প্রকাশ করেনি, কারণ সে ভাল ভাবেই জানত মিত্রানী সুহাসবাবুকে গভীরভাবে ভালবাসে—তাই নিজেকে কখনো প্রকাশ করেনি মিত্রানীর কাছে যেমন—তেমনি শেষ চালে সুহাসবাবুকেও ধ্বংস করতে চেয়েছিল।

সুহাস কথা বললে, সত্যি—সত্যি বলছেন আপনি কিরীটীবাবু!

হ্যাঁ।

আশ্চর্য—এখনো যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না—

শুনলে ব্যাপারটা আপনাদের মত সকলেই বিস্মিত হবে—কিন্তু জানেন তো ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন বলে একটি চলতি প্রবাদ আছে! কিন্তু সে যাই হোক, সত্যটা জানবার পর এখন তো বুঝতে পারছেন, আপনাদের দুজনার প্রতিই তার প্রচণ্ড ঘৃণা কি ভাবে এক নিষ্ঠুর আক্রোশে পরিবর্তিত হয়েছিল, যে আক্রোশের জন্য মিত্রানীকে নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে এবং আপনিও এগিয়ে এসেছিলেন ফাঁসির দড়ির দিকে!

সুহাস স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

কিরীটী আবার বললে, এবারে বলুন তো সুহাসবাবু, আপনি কি সেদিন সত্যি সত্যিই স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন, সেই বেতের টুপি মাথায়—মুখে দাড়ি—চোখে রঙিন চশমা লোকটাকে, না কেউ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় সেদিকে আপনার নজর পড়েছিল!

সুহাস চুপ করে থাকে।

আমার অনুমান কিন্তু, আপনার নজরে আসেনি প্রথমে এবং আপনার ঐ বন্ধুই সেই দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—তাই নয় কি?

হ্যাঁ।

এখন তো বুঝতে পারছেন, সকলের মধ্যে বিশেষ করে আপনারই তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার পিছনে তার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল—

পারছি বৈকি! কিন্তু এখনো বুঝতে পারছি না—মিত্রানীকে তার যদি প্রয়োজনই ছিল তো সে অমন বাঁকা পথে গেল কেন?

আকর্ষণটা হয়ত ভালবাসা নয়—একটা জৈবিক আকর্ষণ মাত্র—রিপুর তাড়না!

মনে হচ্ছে—সুহাস বললে, মিত্রাণীও বোধ হয় ব্যাপারটা কখনো এতটুকু আঁচ করতে পারেনি!

আঁচ করতে পারলে তার ডাইরীতেই হয়ত থাকতো। কি জানেন সুহাসবাবু—আপনাদের ঐ বন্ধুটি কেবলমাত্র যে আপনার বন্ধুত্বেরই সুযোগ নিয়েছে তাই নয়—

আপনার চোখের ক্ষীণ দৃষ্টিরও সুযোগ নিয়েছে—

কি বলছেন আপনি?

ঠিকই বলছি, এবং আপনার রুমালটার ব্যাপারেও আমার অনুমান—সেদিন অফিসে আপনাকে পিকনিকের কথা বলতে গিয়ে আপনার রুমালটা হাতসাফাই করেছিল—চোখের ক্ষীণ দৃষ্টির জন্য হয়ত ব্যাপারটা আপনার নজরে আসেনি—

ঐ রুমালটা তাহলে—

হ্যাঁ সুহাসবাবু—আপনার প্রতি পুলিসের সন্দেহটা যাতে আরো বেশী ঘনীভূত হয়—সেই কারণেই রুমালটা হাতসাফাই করেছিল—

সুব্রত এতক্ষণে কথা বললে, সবই করেছিল—প্ল্যানটা তার সাকসেসফুলও হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য ভদ্রলোকের যে মিত্রানী কিরীটী রায়ের মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে—

কিরীটীবাবু—

বলুন—

এখন কি তাহলে ওকে আপনি পুলিসের হাতে তুলে দেবেন?

সমাজের মধ্যে বাস করে একজন দেশের নাগরিকের সাধারণ কর্তব্যবুদ্ধি তো তাই বলে সুহাসবাবু, তবে যে মুহূর্তে আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে—তখুনি মনে হয়েছে ফাঁসির দড়ি বোধ হয় ওর যোগ্য শাস্তি নয়—এক মুহূর্তেই তো সব শেষ হয়ে যাবে—এবং সেটা ওর প্রতি অনুকম্পাই প্রকাশ করা হবে—তা আমি ঠিক চাই না—

আপনি তাহলে—

দেখি, এখনো ঠিক ভেবে উঠতে পারিনি—

কিন্তু ফাঁসিই তো ওর যোগ্য শাস্তি কিরীটীবাবু—সুহাস বললে।

ঠিক—কিন্তু প্রমাণ করবেন কি করে যে ও-ই হত্যাকারী! আদালত চায় প্রমাণ—আইন চায় প্রমাণ, কাজেই ওর তখুনি ফাঁসি হতে পারে যদি ওর স্বীকারোক্তি পাই আমরা!

তা কি ও দেবে?

দেবে না সহজে জানি, কিন্তু তবু শেষ চেষ্টা আমি করবোই—আপনার কাছে আমার একটা বিশেষ অনুরোধ সুহাসবাবু—

বলুন—

ঘুণাক্ষরেও যেন ও নামটা কেউ না এখন জানতে পারে—

না কিরীটীবাবু, আমি কারো কাছে বলবো না।

ঠিক আছে—আমরা তাহলে এবার উঠবো।

সুহাস মিত্র কোন কথা বললো না। ওরা দুজনে উঠে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

দুটো দিন তারপর কিরীটী আর কোথাও বের হলো না। তবে মধ্যে মধ্যে দু-একজনকে ফোন করল। কয়েক জায়গা থেকে ফোনও এলো।

সুব্রত আর ফিরে যায়নি—সর্বক্ষণ কিরীটীর পাশে পাশেই রয়েছে।

কিরীটীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেনি—নিজেও কোন কথা বলেনি। প্রতীক্ষা করেছে

কেবল কিরীটী কখন মুখ খুলবে!

তৃতীয় দিন দ্বিপ্রহরে হঠাৎ কিরীটী মুখ খুললো। বললে, পেয়েছি রে সুব্রত—পথ খুঁজে পেয়েছি—

কি—সুশীল নন্দীকে সব জানাবি?

হ্যাঁ জানাবো, তবে—

তবে?

সোজাসুজি নয়—

কিভাবে তাহলে তাকে ব্যাপারটা জানাবি?

একটা চিঠি—

চিঠি! চিঠি সুশীল নন্দীকে?

না—সুশীল নন্দীকে নয়—

তবে কাকে?

হত্যাকারীকে একটা চিঠি দেবো—

হত্যাকারীকে চিঠি! কিন্তু সে চিঠি পাবার পর যদি লোকটা একেবারে উধাও হয়ে যায়?

আমার বিশ্বাস যাবে না—আর যদি যায়ই আমাদের উদ্দেশ্য পুরোপুরিই সফল হবে—

সফল হবে।

নিশ্চয়ই। সে-ই যে অপরাধী সেটা তার ঐ পলায়ন থেকে প্রমাণিত হয়ে যাবে—তখনই পুলিস তাকে অনায়াসে হত্যাকারী বলে চিহ্নিতও করতে পারবে।

কিন্তু চিঠি লিখবো বললেও কিরীটী ঠিক করে উঠতে পারে না—কিভাবে চিঠিটা লিখবে—কোথায় তার শুরু, কোথায় তার শেষ।

মনে মনে অনেক মুসাবিদা করে কিরীটী কিন্তু কোনটাই যেন পছন্দ হয় না।

ঐদিনই মধ্যরাত্রে কিরীটী লেখার প্যাড ও কলম নিয়ে বসলো, তারপর শুরু করলো তার চিঠি—

কি ভাবে আপনাকে সম্বোধন করবো চিঠির শুরুতে তা অনেক ভেবেও স্থির করতে পারলাম না। প্রিয়বরেষুও লিখতে পারি না—সবিনয় নিবেদন দিয়েও শুরু করতে পারি না—তবু লিখতেই হবে চিঠিটা আপনাকে—তাই কোন সম্বোধন না করেই শুরু করছি চিঠি।

চিঠিটা আমি ডাকে দেবো না—কারো হাত দিয়ে পৌঁছে দেবো, যাতে পথে না মারা যায় চিঠিটা।

কিরীটী লিখতে লাগল।

BanglaBook.org

॥ তেইশ ॥

চিঠিটা আমার পড়তে বসে চিঠির শেষে প্রেরকের নামটা যে আপনি শুরুতেই পড়ে দেখবার কৌতূহলটা দমন করতে পারবেন না সেটা আমি জানি বলেই নামটা শুরুতেই আমার জানিয়ে দিচ্ছি—আমি কিরীটী রায়।

এবারে বোধ হয় বুঝতে আর আপনার কোন অসুবিধা হবে না, হঠাৎ কিরীটী রায়ের আপনাকে চিঠি লিখবার কি এমন প্রয়োজন হলো! আর কেনই বা এই চিঠি।

চিঠির শুরুতেই আরো একটা কথা আপনার অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি, এই চিঠির অন্য দুটি কার্বন কপির একটি শিবপুর থানার ও. সি. সুশীল নন্দী ও অন্যটি কলিকাতার পুলিস কমিশনারের কাছে একই সঙ্গে যাচ্ছে। অবশ্যই স্বীকার করবো, সুশীলবাবুর সক্রিয় সাহায্য না পেলে এত তাড়াতাড়ি আপনাকে হয়ত চিহ্নিত করতে পারতাম না।

অস্বীকার করবো না, আপনার হত্যা করবার প্ল্যান বা পরিকল্পনাটা আপনি সুনিপুণভাবে নিখুঁত করবার চেষ্টা করেছিলেন একই ঢিলে দুই পাখী মারতে। এক—মিত্রানীকে হত্যা করতে ও দুই—সেই হত্যার অপরাধটা সম্পূর্ণ নির্দোষ এক তৃতীয় ব্যক্তির কাঁধে চাপিয়ে দিতে। যদিও প্রধানত উদ্দেশ্য ছিল আপনার মিত্রানীকে হত্যা করা।

হত্যার উদ্দেশ্য বা মোটিভ কিন্তু পোস্টমর্টেম বা ময়না তদন্তের রিপোর্টটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

মৃতদেহের উপরে হত্যাকারী তার যৌন লালসা মিটিয়েছে যখনই জানতে পারলাম তখন আর বুঝতে আবার বাকী ছিল না—হত্যাকারীর মিত্রানীর দেহকে ঘিরে ছিল একটা দীর্ঘদিন ধরে যৌনলালসা—যেটা পরিতৃপ্তির কোন পথ না খুঁজে পেয়ে তার রক্তের মধ্যে যেমন একটা ঘূর্ণি সৃষ্টিই যে করেছিল তা নয়, সেই সঙ্গে ঐ নিষ্কলঙ্কতাকে ঘিরে জন্মেছিল একটা দুর্নিবার আক্রোশ এবং ঐ দুটিরই বহিঃপ্রকাশ প্রথমে হত্যা ও পরে ধর্ষণের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হয়তো আপনার পরিকল্পনা বা প্ল্যানটা এত সহজে বানচাল হয়ে যেতো না, যদি না আপনার ক্রুয়েল ডেস্টিনির অলিখিত নির্দেশ আমাকে ঘটনাচক্রে টেনে না নিয়ে আসতো মিত্রানীর হত্যার ব্যাপারে। মিত্রানীর বাবা আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই শ্রীযুক্ত অবিনাশ ঘোষালের মুখের দিকে তাকিয়েই আমি হত্যা-রহস্যের মীমাংসার ব্যাপারটা হাতে তুলে নিয়েছিলাম।

আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না—সেই নিরীহ, একান্ত শান্তিপ্রিয় অজাতশত্রু বৃদ্ধ মানুষটির বুকে কি নির্মম আঘাতই না আপনি হেনেছেন, মিত্রানীর দেহকে ঘিরে আপনার দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত লালসা ও তাকে পরিতৃপ্ত করবার কোন পথ না খুঁজে পেয়ে সেই আক্রোশে অন্ধ হয়ে।

আপনাকে আমি সত্যি বলছি, যে মুহূর্তে হত্যার মোটিভটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম এই কথা ভেবে যে মানুষ তার গোপন লালসার

তাগিদে কোন্ গভীর ভয়াবহ অন্ধকারে নেমে যেতে পারে।

সত্যি আমার ভাবতেও দুঃখ লাগে, মিত্রানীর মত অমন একটি মেয়ের মধ্যে আর কিছুই আপনি খুঁজে পেলেন না—পেলেন কেবল তার দেহটাকে ঘিরে একটা জঘন্য কুৎসিত যৌনলালসা দীর্ঘদিনের পরিচয়ে! একবারও কি আপনার মনে হয়নি, তার দেহের স্থূল যৌন আকর্ষণের চাইতে তার সুন্দর পবিত্র মনের আকর্ষণ অনেক বেশী—সুষমাকে ছেড়ে আপনি নরকের দুর্গন্ধ কাদা নিয়ে ঘাঁটলেন।

যখনই ভাবি মানুষ কোন্ স্তরে নামলে ঐভাবে একজনের কোমল গলায় রুমালের মৃত্যু-ফাঁস দিতে পারে, আমি যেন ক্ষমার কথাই ভুলে যাই।

মিত্রানীকে যে আপনি কোনদিনই পাবেন না, সে সুহাসকে ভালবাসে এবং সুহাসও তাকে ভালবাসে বুঝতে পেরেই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন—

কিন্তু সেই সঙ্গে যখন ভাবি নিরপরাধ সুহাসকে আপনি ফাঁসিকাঠের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছিলেন, একটা প্রায় দৃষ্টিহীন লোককে আপনি কি চরম দুর্গতির দিকে ঠেলে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন—তখন আপনার যোগ্য বিশেষণ কি খুঁজে পাই না—

(১) আপনি ভেবেছিলেন সুহাস জীবনে যখন কখনো মিত্রানীকে ফোন করেনি, সে সুনিশ্চিত তার গলাটা চিনতে পারবে না—অন্যের গলাকে ফোনে সুহাসের গলা বলেই ভুল করবে—তাতে করে আপনার উদ্দেশ্যও সফল হবে—সজলকে দিয়ে মিত্রানীকে ফোন করালে।

অস্বীকার করবো না—সফল হয়েছিলেন—মিত্রানীও ভুলই করেছিল, কিন্তু অমন সুষ্ঠু প্ল্যানটা বানচাল হয়ে গেল মিত্রানীর ডাইরী থেকে। সে ডাইরীতে ঐ ফোনের কথা লিখে রাখবে আপনি কল্পনাও করতে পারেননি। আর সেই ডাইরীটা আবার একদিন আপনার মৃত্যুবাণ হয়ে আমারই হাতে আসবে—

(২) তারপর ঐ সিল্কের রুমালটা। সুহাসবাবুর যে ক্ষীণদৃষ্টির সুযোগ নিয়ে সেদিন তাঁর অফিসে পিকনিকের কথা বলতে গিয়ে নিঃশব্দে হাতসাফাই করেছিলেন—আপনি কল্পনাও করতে পারেননি সুহাসবাবুর সেই ক্ষীণদৃষ্টিই আপনার মৃত্যুবাণ হয়ে আপনার দিকেই ফিরে আসবে। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

(৩) সুহাসবাবুর দু'চোখের ঐ ক্ষীণদৃষ্টি আপনার পরিকল্পনার বা সুষ্ঠু প্ল্যানের আরো একটা ব্যাপার বানচাল করে দিয়েছে—সেটা হচ্ছে সেই চোখে চশমা, মুখে দাড়ি, মাথায় বেতের টুপি পরা ভদ্রলোকটি—যাকে আপনিই সাজিয়ে এনেছিলেন ঐদিন বটানিক্যাল গার্ডেনে এবং সম্ভবত আপনার ইচ্ছা ছিল সেই লোকটির প্রতি সুহাসবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কানের কাছে কথাটা বলে করেওছিলেন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ।

কেবলমাত্র দলের মধ্যে সুহাসবাবুকেই সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পিছনে আপনার প্ল্যান ছিল—পুলিসের দৃষ্টি যাতে সেই অজ্ঞাত পরিচয়নামার প্রতি পড়ে। সকলকে সে কথা বলেননি—ঝামেলা এড়াবার জন্য—আপনার কথামতই সুহাসবাবু পুলিসের কাছে লোকটির বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাও প্রথমটায় নয়, আমার প্রশ্নের জবাবে সেদিন থানায়। কাজেই বুঝতে পারছেন সুহাসবাবুর ব্যাপারটা মনে ছিল না—মনে থাকবার কথাও নয়।

কিন্তু আপনি আবারও ভুল করে বসলেন—মারাত্মক ভুল, যেটা আমার কাছে অস্পষ্ট

থাকেনি—সুহাসবাবুর দৃষ্টি এত ক্ষীণ ছিল যে দূর থেকে সেই আপনার সাজানো ব্যক্তিকে দেখে তার নিখুঁত একটা বর্ণনা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না—তিনি যা বলেছেন আমার কাছে সেটা আপনারই লোকটির সম্পর্কে বিবরণের কেবল পুনরাবৃত্তি মাত্র। তারপর সেই টুপি ও বায়নাকুলার—আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় সেও আপনিই লোকটিকে সাপ্লাই করেছিলেন। আপনি একজন ফিল্মের নামী ডিরেক্টরের প্রধান অ্যাসিস্ট্যান্ট—অনেক একস্ট্রা নিয়ে আপনার কাজ-কারবার যেমন, তেমনি অনেকেই ফিল্মে একটু চান্স পাওয়ার জন্য হয়ত আপনার আশেপাশে ঘুরঘুর করে তোষামোদ করে, তাদেরই একজনকে ঐভাবে সেদিন মেকআপ দিয়ে বেগার দেওয়াতে আপনার অসুবিধা হবার কথা নয়—কিন্তু সেখানেও আবার ভুল করলেন আপনি, অকুস্থানে তার টুপি ও বায়নাকুলারটা তাকে দিয়ে ফেলে রেখে। সে আপনার কথা মতই কাজ করেছে—সেগুলো ফেলে পালিয়েছে—আর অন্য দিকে আপনার তৈরী ফাঁদে আপনিই আটকা পড়ে গেলেন।

তার নিজের যদি ঐ বায়নাকুলারটা হতো—তাহলে সে অত দামী জিনিসটা ঐভাবে ফেলে পালাত না—তাছাড়া লোকটা পরে নিজের বিপদের সম্ভাবনা দেখেই থানায় সুশীলবাবুর কাছে অকপটে সেদিনকার কথাটা প্রকাশ করে দিত না, বুঝেছেন তো—আবার সেই ভাগ্যের পরিহাস!

(৪) এবারে আসবো সেই মুহূর্তের ঘটনায়। এ কথা সত্যি, আপনি একটা সুযোগ পেয়ে তা ব্যবহার করেছেন এবং সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য দুই বলবো আপনার—সেদিনকার সংবাদপত্রের ফোরকাস্ট-মত ঠিক সময়ে ধুলোর ঝড় উঠলো—আপনার হাতের মধ্যে এসে গেল সুযোগ—আপনি হত্যা করলেন মিত্রানীকে—

(৫) কিন্তু আপনার প্রতিদিনকার লালসা, মিত্রানীকে ঘিরে যা আপনাকে ক্ষিপ্ত করেছিল—সেই লালসাতেই আপনি সেই মৃতদেহের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মার্ডারার সাধারণত দুই রকমের হয়—একটা হয় হ্যাবিচুয়াল মার্ডারার—যারা কোন স্বার্থে বা উদ্দেশ্যে হত্যা করে—আর এক শ্রেণীর খুনী হচ্ছে যারা লুনাটিক ম্যানিয়াক—আপনি শেষোক্ত শ্রেণীর—লালসা আপনাকে উন্মাদ করে তুলেছিল।

(৬) প্রোবাবিলিটি ও চান্সের দিক দিয়ে আপনাকেই আমি চিহ্নিত করেছি, কারণ আপনিই ছিলেন ধুলোর ঘূর্ণিঝড় ওঠবার পূর্বমুহূর্তে মিত্রানীর একেবারে ঠিক পাশেই এবং মোটিভের কথা তো আগেই বলেছি আপনার। তবু অদৃষ্টের পরিহাস আপনাকে দিয়ে মোক্ষম ভুলটি করিয়ে নিয়েছিল—আপনার মাথার চুলই দলের মধ্যে একমাত্র কটা—সেই রকম একটি চুলই নিহত ও পরে ধর্ষিতা মিত্রানীর ব্লাউজের মধ্যে আটকে ছিল। কাজেই হত্যা করবার পর যদি তাকে না ধর্ষণের চেষ্টা করতেন, ঐ চুলটা তার ব্লাউজে যদি না আটকে থাকতো—আপনাকে সনাক্ত করা কিছুটা কঠিন হতো। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তো, ধর্ষণটা আপনার কত বড় মারাত্মক ভুল হয়েছিল এবং যেটা আপনার আসল এবং আদি ও অকৃত্রিম চেহারাটা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলেছে!

॥ চব্বিশ ॥

থানায় বসে সুশীল নন্দীও ঐ রাত্রেই কিরীটীর লোক মারফৎ প্রেরিত চিঠিটা পড়ছিলেন। চিঠি যত এগিয়ে চলেছে ততই যেন তাঁকে কি এক আকর্ষণে টেনে নিয়ে চলছে।

বস্তুত কিরীটী যে জোর গলায় বলেছে অনেকবার, মিত্রানীর হত্যাকারী তাদের দলেরই একজন—পরিচিতদেরই একজন—তিনি যেন ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি, কিন্তু আজ কিরীটীর চিঠিখানা পড়তে পড়তে বিস্ময়ের সঙ্গে যেন বিশ্বাস তাঁর মনের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠছে।

সুশীল নন্দী পড়তে লাগলেন—

তবে ঐ সঙ্গে এও আমি স্বীকার করবো, সেদিনকার ফোরকাস্ট আবহাওয়া সম্পর্কে ঠিকমত সত্য হয়ে যাওয়ায় আপনি যে সুযোগটা পেয়েছিলেন সেটা আপনার নির্দোষিতার পক্ষেই গিয়েছিল। আকাশের চাঁদ হঠাৎ ঢাকা পড়লে অন্ধকার হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু পরমুহূর্তেই মেঘ অপসারিত হলে যেমন আবার আলো দেখা দেয়—আপনার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ধুলোর ঘূর্ণিঝড় ওঠা সত্ত্বেও আপনার অপকীর্তি চাপা থাকেনি। আপনার ভুলগুলো—যা মরা পাখীর পালকের মত চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল, সেগুলোই আপনার মিত্রানীকে হত্যার সাক্ষী দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলোর কথা আগেই বলেছি, এবার শেষ কথায় আসছি।

(৭) আমার প্রথম থেকেই ধারণা হয়েছিল এবং আপনাদেরও বলেছি যে আপনাদের মধ্যেই কেউ সেদিন ঐভাবে মিত্রানীকে হত্যা করেছেন—কিন্তু কেন—কেন আমার এ ধারণা হলো! প্রথমত আপনারা যে সেদিন গার্ডেনে পিকনিক করতে যাবেন—বাইরের কেউ সে কথা জানত না একমাত্র আপনারা কজন ছাড়া—দ্বিতীয়ত সেই চশমাধারী দাড়িওয়ালাকে দিয়ে যে গোলকধাঁধার সৃষ্টি করেছিলেন—সেটা তাহলে একমাত্র ক্ষীণদৃষ্টি সুহাসবাবুরই নজরে পড়তো না এবং সেটা পড়েছিল আপনিই সে কথাটা একসময় সুহাসবাবুকে বলায়—আর আপনি জানতেন সুহাসবাবুর ক্ষীণদৃষ্টির কথা। তৃতীয়ত ঝড় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আপনি মিত্রানীকে অনুসরণ করেন এবং যেতে যেতে দুজনকে আপনি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন—সুহাসবাবু ও কাজল বোসকে। চতুর্থত আপনিই মিত্রানীর মৃতদেহটার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—যেহেতু আপনিই একমাত্র ব্যাপারটা তখন পর্যন্ত জানতেন। এবং সেটা অবিলম্বে প্রকাশ হওয়ার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

(৮) আপনার এটাও নিশ্চয়ই ভুল হবে না—মিত্রানীর মৃত্যুটা যে স্বাভাবিক নয় তখনো সেটা কেউ জানতে পারেনি এবং মৃতদেহ তোলবার সময় আপনিই তার গলায় রুমালের ফাঁসটা প্রথমে দেখতে পেয়ে অস্ফুট চিৎকার করে ওঠেন সকলের জবানবন্দী মতো।

দেখুন কেমন করে আবার অদৃষ্টের পরিহাস আপনাকে দিয়েই আপনার পাপাচারের কথাটা ঘোষিত করালো! একবারও তখন আপনার মনে হয়নি বিদ্যুৎবাবু—

ধক্ করে উঠলো যেন সুশীল নন্দীর এতক্ষণ পরে চিঠির মধ্যে ঐ নামটা পড়ে। বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎ সরকারই তাহলে?

কয়েকটা মুহূর্ত বিহ্বল বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকেন সুশীল নন্দী। তারপর আবার পড়তে শুরু করেন—

হ্যাঁ একবারও আপনার ঐ মুহূর্তে মনে হয়নি সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে তার গলায় চেপে বসা রুমালের ফাঁসটা অত সহজে কারো চোখে পড়ার কথা নয়, তাছাড়া আপনিই মাথার দিকটা ধরেছিলেন তার ইচ্ছা করে—ঐ কথাটা সকলকে জানাবার জন্য—আবার সেই অদৃষ্টের পরিহাস, আপনি টর্চের আলোয় ব্যাপারটা সকলের দৃষ্টিগোচর করলেন! আপনি একবারও হয়ত ভাবেননি বিদ্যুৎবাবু, হত্যা মানেই পুলিস অনুসন্ধান ও সর্বশেষে আদালতের কাঠগড়া!

যাক—আমার যা বলবার ছিল বললাম। এবার আপনি কি করবেন না করবেন নিজেই ভেবে দেখবেন—তবে জানবেন—ভোর হওয়ার আগেই হয়ত পুলিস আপনার ওখানে হানা দেবে, কারণ আমি তো আগেই বলেছি—আপনাকে লেখা এই চিঠির আরো দুটো কপি একটি সুশীল নন্দীকে ও অন্যটি পুলিস কমিশনারকে একই সঙ্গে পাঠালাম।

আমার কাজ শেষ।

আপনাদের কিরীটী রায়।

তখনো ভাল করে প্রথম ভোরের আলো ফুটে ওঠেনি—শেষ রাতের আকাশে তখনও চাঁদের আলোর খানিকটা আভাস লেগে আছে।

পর পর দুখানা পুলিসের জীপ সেই বিরাট বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল।

বাড়ির লোকজনদের জাগিয়ে পুলিস অফিসারদের ভিতরে ঢুকতে কিছুটা সময় লাগলো। বাড়ির লোক সকলে স্তম্ভিত—বিমূঢ়।

দোতলার একটা ঘর বাড়ির লোকেরা অফিসারদের দেখিয়ে দিল—দরজাটা বন্ধ ছিল—

ধাক্কা দেওয়া সত্ত্বেও যখন ভিতর থেকে কেউ খুললো না—দরজা ভেঙে ফেলল। এবং ঘরে পা দিয়েই ওরা থমকে দাঁড়াল।

মানুষটি বসে আছে চেয়ারে—হাতে ধরা তার কিরীটীর চিঠির শেষ পৃষ্ঠাটা ও বাকী দুটো পায়ের কাছে পড়ে আছে।

বিদ্যুৎবাবু—আমরা থানা থেকে আসছি!

কেমন যেন শূন্য বোবা দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ তাকাল অফিসারের মুখের দিকে।

pathagar.net

নগরনটী

॥ এক ॥

আজকাল আর সুরজিৎ সন্ধ্যার কিছু পরেই ঠিক বাঁধা টাইমে আসছে না—আগে তো নয়ই বরং আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার কখনো কখনো এক ঘণ্টা পরেও আসে। তবে আসে ঠিকই। একদিনও আসা তার বাদ যায় না।

আর সেই কারণেই সন্ধ্যা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মালঞ্চকে প্রস্তুত হয়েই থাকতে হয়—এই সময়টা কোথাও সে বেরুতে পারে না।

মালঞ্চ শোবার ঘরে বড় আয়নাটার সামনে একটা ছোট টুলের উপর বসে সাদা হাতীর দাঁতের চিরুনিটা দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল।

দীর্ঘ কেশ মালঞ্চর। এত দীর্ঘ যে কোমর ছাড়িয়ে যায়। একসময় কেশের দৈর্ঘ্য তার আরো বেশী ছিল—এখন অনেকটা কম। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে অন্যমনস্কভাবে মালঞ্চ সামনের মসৃণ আরশির গায়ে প্রতিফলিত তার নিজের চেহারাটার দিকে তাকাচ্ছিল।

নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখতে ভাল লাগে বেশ মালঞ্চর, বয়স তার যা-ই হোক—দেহের বাঁধুনি আজও তার বেশ আঁটসাঁটই আছে। গালে ও কপালে অবিশ্যি দু'চারটে বক্ররেখা পড়েছে, তা সেগুলো ফেস্ ক্রিমের প্রলেপ পড়লে চট্ করে তেমন ধরা যায় না। মালঞ্চ অবিশ্যি বুঝতে পারে, তার বয়স হচ্ছে আর সেই কারণেই বোধ হয় নিজের দেহচর্চা সম্পর্কে সর্বদাই সজাগ থাকে।

কিছুক্ষণ আগে শহরের বুকে সন্ধ্যা নেমেছে তার ধূসর আঁচলখানি বিছিয়ে। জুন মাস শেষ হতে চলল—এখনও বৃষ্টির চিহ্নই নেই। সারাটা দিন ভ্যাপসা গরম। দুপুরে এখানে ওখানে খানিকটা মেঘ জমেছিল, মনে হয়েছিল বুঝি বিকেলে বা সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি নামতে পারে, কিন্তু নামল না।

সুরজিতের আজকাল আসার কোন সঠিক নির্দিষ্ট সময় নেই, তাহলেও সে আসবেই একবার, আর সেই কারণেই প্রতি সন্ধ্যায় মালঞ্চকে সেজেগুজে প্রসাধন করে প্রস্তুত থাকতে হয়।

অনেক সময় মালঞ্চর নিজেকে যেন কেমন ক্লান্ত লাগে।

আজকাল কিছুদিন ধরে মালঞ্চ যেন লক্ষ্য করছে সুরজিতের মধ্যে একটা পরিবর্তন। কেমন যেন একটু গম্ভীর-গম্ভীর মনে হচ্ছে—বালিগঞ্জের বনেদী পাড়ায় দোতলার একটা ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা চুলের মধ্যে সাদা হাতীর দাঁতের চিরুনিটা চালাতে চালাতে ভাবছিল মালঞ্চ। একঝলক মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা দিল মালঞ্চর।

মালঞ্চর বুঝতে কষ্ট হয় না, ওটা বেলফুলের গন্ধ।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ভীরু গলায় ডাক ভেসে এলো পশ্চাৎ থেকে—মালা!

মালঞ্চ গলা শুনেই বুঝতে পেরেছে কার গলা। মালঞ্চ ফিরেও তাকাল না। যেমন চিরুনিটা দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল তেমনি আপন মনে আঁচড়াতেই লাগল।

মালা! আবার সেই ভীরু ডাক।

এবারও মালঞ্চ ফিরে তাকাল না এবং আগের মতই আরশির সামনে চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে সাড়া দিল, কি চাই?

যে লোকটি একটু আগে হাতে একটা বেলফুলের মালা নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল সে এবার কুণ্ঠিত ভাবে বললে, খুব ব্যস্ত, না?

না, বল কি বলবে? মালঞ্চ বললে।

তোমার জন্যে একটা বেলফুলের মালা এনেছি, গলায় পরবে!

পিছনে ফিরে না তাকিয়েই মালঞ্চ নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল, রেখে যাও ঘরের মধ্যে।

কোন সাড়া এলো না অন্য দিক থেকে।

দরজার ওপরেই দাঁড়িয়ে লোকটি, বয়স ৪৫ থেকে ৫০-এর মধ্যে। সমস্ত শরীরটাই মানুষটার কেমন বুড়িয়ে গিয়েছে, চুলে পাক ধরেছে। ভাঙা গাল, সরু চোয়াল, কোটরগত দুটি চক্ষু। পরিধানে একটা ময়লা পায়জামা, গায়ে একটা হাফ-হাতা সস্তা দামের শার্ট, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দু'তিন দিন বোধ হয় লোকটা ক্ষৌরকর্ম করে নি।

লোকটা নিঃশব্দে অল্পদূরে দাঁড়িয়েই আছে।

কি হল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন! মালঞ্চ বলল, বললাম তো মালাটা ঘরে রেখে যাও।

দাও না গলায় মালাটা, মোড় থেকে দু টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে এলাম!

কে বলেছিল তোমাকে দুটাকা খরচ করে বেলফুলের মালা আনতে?

কেউ বলেনি, আমারও তো ইচ্ছা যায়—

তাই নাকি! ফিরে তাকাল মালঞ্চ এতক্ষণে।

হ্যাঁ, তাছাড়া সে-সব দিনগুলো ভুলতে পারি কই, রোজ অফিস থেকে ফেরার পথে তোমার জন্যে এমন দিনে মালা নিয়ে আসতাম, তুমি খোঁপায় জড়াতে।

—দেখ সুশান্ত, বাজে কথা রেখে তোমার আসল কথাটা খুলে বল তো এবার।

—আসল কথা আবার কি—সুশান্ত মৃদু গলায় বলল।

—কি ভাবো তুমি যে, আমি এতই বোকা, কিছু বুঝি না?

নির্লজ্জর মত হাসতে থাকে সুশান্ত।

—বোকার মত হেসো না, তোমার ঐ হাসি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়—ঘেন্না করে—ভনিতা রেখে আসল কথাটা বলে ফেল।

সুশান্ত কোন জবাব দেয় না।

—আমি জানি তুমি কেন এসেছ, কেন ঐ মালা এনেছ।

—কেন?

—টাকা চাই, তাই না?

—না, মানে—

—পরশু চল্লিশ টাকা দিলাম, এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেল? আমার আজ স্পষ্ট কথা, টাকা তুমি পাবে না।

—পাবো না! কেমন যেন একটা করুণ আর্তি সুশান্তর কণ্ঠে বেজে উঠল। হাসিটা নিভে গেল।

—না, তোমার মদের খরচা রোজ রোজ আমি দিতে পারব না। লজ্জা করে না

তোমার, এ বাড়িতে নিচের তলায় চাকরের মত পড়ে আছ, আর একজনের দু'মুঠো কৃপার অন্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করছ, গলায় দড়ি জোটে না তোমার—

—দড়ি জুটলে সে দড়ি গলায় দেবার সাহস হত না—তা না হলে সুরজিতের রক্ষিতার কাছে আমি হাত পাতি—

—ঘেন্না পিত্তি বলে একটা সাধারণ বস্তু, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থাকে, তাও কি তোমার নেই?

—সব—সবই ছিল মালা, ঐ যে তোমার ঘেন্না, পিত্তি, লজ্জা, সবই ছিল—কিন্তু তুমিই আমার বস্ত্রহরণ করেছ—

—আমি?

—হ্যাঁ, তুমি—তুমি ছাড়া আর কে?

—থাম! ঘৃণা-মিশ্রিত একটা গর্জন করে ওঠে মালঞ্চ।

—একটু আগে গলায় দড়ি দেবার কথা বলছিলে না মালা—অন্য কেউ হলে হয়তো এতদিনে দিত, কিন্তু আমি—

—তুমি দিতে পারলে না। তাই না?

—প্রশ্নটা যে নিজেকেও নিজে অনেকবার করিনি তা নয়। জানি সব দোষ আমারই।

—সেটা বোঝ?

—হয়তো বুঝি বা বোঝবার চেষ্টা করি, ভাবি—

—আর বুঝবার চেষ্টা করো না! বুঝেছ?

—একটা কথা বলব মালা?

—জানি কি বলবে, আমি শুনতে চাই না।

—আচ্ছা—আবার কি আমরা আমাদের পূর্বের জীবনে ফিরে যেতে পারি না?

—কি বললে?

—জানি তা আর কোন দিনও সম্ভব নয়—আজকের মালঞ্চ আর মালা হতে পারে না। অনেক পথ হেঁটে আমরা দুজনা দুজনার থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছি। আজ তোমায় দেওয়া সুরজিৎবাবুর এই বাড়িটা, এর সব দামী দামী আসবাব-পত্র, এই প্রাচুর্য জানি আমার ঘরে থাকলে এসব কিছুই তোমার হত না, কিন্তু—

—বল। থামলে কেন?

—সেদিনও বোধহয় আমি তোমাকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই যথাসাধ্য রাখবার চেষ্টা করেছি—

—কি বললে, স্বাচ্ছন্দ্য! একটা ভাল কাপড়—একটা গয়না কখনো তুমি দিতে পেরেছ?

—তবু তুমি একদিন আমার সবকিছু জেনে শুনেই আমার ঘরে এসে উঠেছিলে—

—ভুল—ভুল করেছিলাম। নিত্য ভাত ডাল আর চচ্চড়ি—মাসান্তে একটা মিলের শাড়ি—

—তুমি তো জানতে আমার মাইনে কি ছিল—কিছুই তোমার অজ্ঞাত ছিল না—কিন্তু তাহলেও বোধহয় তোমার সম্মান ছিল, ইজ্জত ছিল। সেদিন কারো রক্ষিতা হতে হয়নি তোমাকে।

জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল, আর কোন কথা বলতে পারে না মালঞ্চ।

—তুমি বুঝবে না মালা, মানুষ কত বড় অপদার্থ হলে তার নিজের স্ত্রীকে অন্য এক পুরুষের রক্ষিতা হয়ে থাকতে দেয়,—কথাগুলো বলে মালাটা সামনের টেবিলের ওপর রেখে সুশান্ত ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্যে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

—দাঁড়াও, কত টাকার দরকার তোমার। শ'দুই হলে চলবে?

সুশান্ত থমকে তাকায় স্ত্রীর মুখের দিকে। হাত পেতে চাইলেও যে কখনো চল্লিশ-পঞ্চাশটার বেশী টাকা দেয় না, সে কিনা আজ দুশো টাকা দিতে চায়!

—শোন, আমি তোমাকে আরো বেশি টাকা দিতে পারি, তবে একটি শর্তে—

—শর্তে?

—হ্যাঁ। এ বাড়ি ছেড়ে তুমি চলে যাবে, আর কখনো এ বাড়িতে আসবে না। লেখাপড়া তো শিখেছ, একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারো না আবার—

—একবার চাকরি ছেড়ে দিয়েছি, তাও আজ পাঁচ বছর, তাছাড়া বয়সও হয়েছে, এ বয়সে আর কে চাকরি দেবে!

—বল তো আমি সুরজিতকে বলে দেখতে পারি। সে অত বড় অফিসের ম্যানেজার—

—জানি মালা, সুরজিতবাবু হয়তো চেষ্টা করলেই তার রক্ষিতার প্রাক্তন স্বামীকে যে কোন একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু না, থাক মালা, তোমাকে আমার জন্যে কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি চললাম।

—টাকা নেবে না—এই যে টাকা চাইছিলে?

—না মালা, আচ্ছা চলি। সুশান্ত ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

বারান্দা পার হয়ে মোজেইক করা সিঁড়ির ধাপগুলো অতিক্রম করে নিঃশব্দে নেমে এলো। কোনদিকেই আর তাকাল না, সোজা গেট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

হাঁটতে শুরু করে সুশান্ত। সন্ধ্যার তরল অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে, পথের দু'পাশে আলোগুলো যেন সেই অন্ধকারকে যতটা তরল করা উচিত ততটা পারছে না।

তবে কি আকাশে মেঘ নামছে? সত্যি কি মেঘ জমছে, এবার বৃষ্টি নামবে—বাতাসে একটা ঠাণ্ডা ভাব, ভিজে ভিজে ভাব!

নামে—নামুক বৃষ্টি।

হঠাৎ যেন যে ঘেন্না বা লজ্জা এতদিন তার মনের মধ্যে জাগেনি সেটাই যেন তার সারা মনকে এই মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

সত্যিই তো—সে কি মারা গেছে? একটা মৃত মানুষ সে? নচেৎ নিজের স্ত্রী আর একজনের রক্ষিতা হয়ে যেখানে আছে সেখানে সে কেমন করে পড়ে আছে! শুধু পড়ে থাকাই নয়—দু'বেলা আহার করছে আর নেশার টাকা হাত পেতে নিচ্ছে। হ্যাঁ, মালঞ্চ ঠিকই বলেছে—তার গলায় দড়ি দেওয়াই উচিত ছিল।

বৃষ্টিটা বোধ হয় সত্যি সত্যিই নামবে। নামলে ভিজতে হবে—যে বাড়ি থেকে এই মাত্র সে বের হয়ে এলো সেখানে বোধ হয় আর সে ফিরতে পারবে না।

একটু মদ হলে বোধ হয় সে অনেকটা সুস্থ বোধ করতে পারত।

আগে কোন দিন মদ স্পর্শও করেনি সুশান্ত, কিন্তু ঐ মালঞ্চই একদিন তার হাতে মদের গ্লাস তুলে দিয়েছিল।

—না। সুশান্ত বলেছিল।

—খাও, দেখ তোমার মাথার ভূতটা নেমে যাবে। নিজেকে অনেকটা হালকা মনে করতে পারবে।

—তোমার ইচ্ছা আমি খাই?

—হ্যাঁ, খাও।

—বেশ, দাও—

সেই শুরু—তারপর চলেছে—এখন আর না হলে চলে না।

আবার ভাবে সুশান্ত, আর সে হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে ফিরে যাবে না। পাঁচ পাঁচটা বছর সে কেমন করে ছিল বালিগঞ্জের হিন্দুস্থান রোডের ঐ বাড়িটায়? সত্যিই তার মনে কোন ঘৃণা নেই, লজ্জা নেই।

সুরজিতের রক্ষিতার বাড়িতে একতলার একটা ঘরে কেমন করে কাটাল সুশান্ত এত দীর্ঘ দিন ও রাত্রিগুলো? মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যা হলে মালঞ্চর কাছ থেকে পঁচিশ-তিরিশটা টাকা নিয়ে বের হয়ে পড়ত; তারপর ঢাকুরিয়া ব্রীজের নিচে যে লিকার শপটা খুলেছে সেখান থেকে একটা রামের বোতল কিনে লেকের কোন নির্জন জায়গায় গিয়ে বসত।

বোতলটা শেষ হলে অনেক রাত্রে টলতে টলতে সুরজিতের রক্ষিতার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াত। নীচের তলার জানালাটার সামনে মৃদুকণ্ঠে ডাকত—রতন, এই রতন, দরজাটা খোল্ বাবা।

—দাঁড়াও খুলছি। বলে রতন দরজাটা খুলে দিত। তারপর প্রতি রাতের মতন বলত, বাবু, মানদা তোমার খাবার তোমার ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছে। বলেই রতন তার ঘরে চলে যেত। আর সেও তার ঘরে গিয়ে ঢুকত।

বেশীর ভাগ রাত্রেই খেত না সুশান্ত, কেন যেন গলা দিয়ে ভাত, ডাল, মাছ, দুধ, মিষ্টি নামতে চাইত না।

প্রথম প্রথম রতনের কেমন যেন কৌতূহল হত সুশান্ত সম্পর্কে—কে লোকটা? কিন্তু না পারত গিন্নীমাকে শুধোতে, না পারত বাড়ির অন্য কাউকে শুধাতে।

বাবু আসেন রোজ বিকেলে, রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটা নাগাদ আবার তার গাড়িতে চেপে চলে যান। ঝক্‌ঝকে গাড়িটা ঠিক সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। উর্দি পরা ড্রাইভার নেমে গাড়ির দরজা খুলে দেয়। সুরজিৎ ঘোষাল গাড়ি থেকে নেমে কোন দিকে না তাকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যান। জুতোর শব্দটা সিঁড়ির মাথায় মিলিয়ে যায়।

আবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ জুতোর শব্দ শোনা যায়। রতন বুঝতে পারে সুরজিৎ ঘোষাল বের হয়ে যাচ্ছেন। ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দেয়। সুরজিৎ ঘোষাল গাড়িতে উঠে বসলে গাড়িটা হুস করে বের হয়ে যায়।

তার প্রশ্নের জবাব একদিন গিন্নীমার ঝি মানদাই দিয়েছিল। রতন প্রশ্ন করেছিল, হ্যাঁ গা মানদা, রোজ রাত্রে বাবু চলে যান কেন বলতে পারো?

ফিক্ করে হেসে ফেলেছিল মানদা। বলেছিল ওসব লোকেরা তাদের মেয়েমানুষের ঘরে রাত কাটায় নাকি! আসে চলে যায়।

—কি বলছ! মেয়েমানুষ! উনি তো বাবুর স্ত্রী, গিন্নীমা—

মৃদু হেসে মানদা বলেছিল, এ পাড়ার সকলে তাই জানে বটে, তবে উনি তো কর্তার বিয়ে করা ইস্ত্রী নন—

রতন কল্পনাও করতে পারেনি, যে, গিন্নীমা সুরজিৎ ঘোষালের বিয়ে করা স্ত্রী নয়। তাই সত্যিই অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে ছিল মানদার মুখের দিকে।

—সত্যি?

—তবে কি মিথ্যে!

—কি করে জানলে? কে বললেন?

—কে আবার বলবে, আমি জানি। উনি বাবুর রক্ষিতা, রক্ষিতাকেই বাবু এ বাড়ি করে দিয়েছেন।

—বল কি! ভদ্রপাড়ায় বাবু তার রক্ষিতাকে রেখেছেন! পাড়ার লোকেরা কেউ কিছু বলে না?

—এই কলকাতা শহরে পাশের বাড়ির লোকও পাশের বাড়ির খোঁজ রাখে না। আর রাখলেই বা কি, জানলেও কেউ উচ্চবাচ্য করে না। এনারা সব সভ্য ভদ্রলোক যে গো। তাছাড়া কে কার রক্ষিতা জানাটা এত সহজ নাকি! এ কি সেই সব পাড়ার মেয়েছেলে, একেবারে চিহ্নিত করা—

সত্যি! রতনের যেন কথাটা শুনে বিস্ময়ের অবধি ছিল না প্রথম দিন।

মানদা তখনো বলে চলেছে, এ শহরে কত ভদ্রলোকের মেয়েদেরকেই তো দেখলাম, কত যে অমন দেহ-ব্যবসা চালাচ্ছে তা জানবারও উপায় নেই—

মানদার কথাগুলো শুনলেও কিন্তু সেদিন পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি রতন। তবে তা নিয়ে আর বেশী মাথাও ঘামায়নি। ঘামাতেই বা যাবে কেন, চাকরি করতে এসেছে সে, চাকরিই করবে। কত্তা-গিন্নীর হাঁড়ির খবর দিয়ে তার প্রয়োজন কি।

কিন্তু যেদিন রতন জানতে পেরেছিল নীচের তলার ঐ বাবুটিই গিন্নিমার স্বামী, রতন যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিল সেদিন। ঐ সংবাদটিও মানদাই পেশ করেছিল তার কাছে।

—আচ্ছা মানদা, নীচের তলায় যে বাবুটি থাকেন, উনি কে? মধ্যে মধ্যে দেখি গিন্নীমার ঘরে যান—

মুচকি হেসে মানদা বলেছিল, উনিই তো আমাদের গিন্নীমার স্বামী—

—উনিই গিন্নীমার স্বামী!

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, সুরজিৎ ঘোষালই এ বাড়ির আসল মালিক হলেও গিন্নীমার স্বামী হচ্ছে ঐ নীচের তলার বাবুটি। এ পাড়ার সবাই জানে ওটা সুশান্ত মল্লিকের বাড়ি।

সুশান্ত মল্লিক ব্যবসা করেন। পাড়ার লোকেরা মধ্যে মধ্যে আসে, গল্পগুজবও করে। সুশান্ত মল্লিক হেসে হেসে তাদের সঙ্গে কথাও বলে। কিন্তু তারা কেউই অনুমান করতে পারে না ভিতরের ব্যাপারটা।

॥ দুই ॥

সুশান্ত হাঁটতে হাঁটতে এসে লেকে ঢুকল। এখন আর লেকে অত মানুষজনের ভিড় নেই, জলের ধার ঘেঁষে গাছতলার নীচে অন্ধকার একটা বেঞ্চে বসল সুশান্ত।

বুকের ভেতরটা আজ এত বছর পরে যেন কি এক জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে। নিরুপায় আক্রোশে যেন নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতে চায়।

এত বড় লজ্জাটা সে বহন করছে এই সাত বছর ধরে, হ্যাঁ, সাত বছরই হবে—বালিগঞ্জের হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে আসার আগে যখন তারা হেদুয়ার কাছে একটা গলিতে ছোট দোতলা একটা বাড়ির একতলায় থাকত, তখন থেকেই তো মালঞ্চর অফিসের ম্যানেজার সুরজিৎ ঘোষাল সেখানে যাতায়াত শুরু করেছিল।

মালঞ্চ সুরজিৎ ঘোষালের অফিসে তার পার্সোন্যাল স্টেনো টাইপিস্ট ছিল। সেখান থেকেই দুজনের আলাপ।

বালিগঞ্জের বাড়িতে উঠে আসবার মাস দুই আগেই মালঞ্চ চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। না, বাধা দেয়নি সুশান্ত। সুরজিৎ ঘোষাল এলেই সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেত। আর বাধা দিয়েই বা সে কি করত, মালঞ্চ কি শুনত তার কথা।

স্বামী স্ত্রী, সুশান্ত আর মালঞ্চ দুজনেই দুটো অফিসে চাকরি করত, হঠাৎ কেন যেন চাকরিটা ছেড়ে দিল সুশান্ত। মালঞ্চ প্রথমটায় বুঝতে পারেনি যে তার স্বামী চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

আর বুঝবেই বা কি করে, সুশান্তর সঙ্গে তখন তার সম্পর্কই বা কতটুকু। সুরজিৎ ঘোষালের অনুগ্রহে তখন তার নিত্য নতুন দামী দামী শাড়ি আসছে, দু-একটা অলংকারও সেই সঙ্গে গায়ে শোভা পেতে শুরু করেছে।

সুশান্ত নীরেট বোকা, তাই প্রথমটায় ধরতে পারেনি, ধরতে পেরেছিল অনেক দেরিতে, যখন সুরজিৎ ঘোষাল তাদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছিল, তার আগে মধ্যে মধ্যে অফিস থেকে তার ফিরতে দেরি হলে মালঞ্চ সুশান্তকে বলেছে, অফিসে কাজের চাপ।

নীরেট বোকা সুশান্ত সরল মনেই কথাটা বিশ্বাস করেছে। চোখ থেকে পর্দাটা সরে যাওয়া পর্যন্ত তাদের অন্তরঙ্গতা বুঝতে পারেনি, কিন্তু যখন বুঝল তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেল একদিন।

—মালা, আমি অন্ধ নই, বলেছিল সুশান্ত।

—অন্ধ হবার তো কোন প্রয়োজন নেই, আর দু'জোড়া চোখ থাকতে অন্ধ হতে যাবেই বা কেন—বলেছিল মালা।

—তুমি তাহলে সুরজিৎ ঘোষালের রক্ষিতা হয়েই থাকতে চাও?

মালঞ্চ বোধহয় বুঝতে পারেনি কথাটা অমন স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবে সুশান্ত উচ্চারণ করতে পারে। মুহূর্তের জন্য সে স্তব্ধ হয়ে থাকে, তারপর বলে, সুরজিৎকে আমি ভক্তি করি।

—তাই নাকি! তাহলে তোমার আজ প্রয়োজন ডিভোর্সের—কিন্তু শুনে রাখ মালঞ্চ—তা আমি হতে দেবো না।

—বাধা দিতে পারবে?

—দেবো, আর আমি দেখব আমার এ বাড়িতে যেন সে আর না আসে—।

—তোমার বাড়ি! কিন্তু গত সাত মাস ধরে এ বাড়ির ভাড়া কে দিয়েছে জানো—ঐ সুরজিৎ ঘোষালই।

—মালা!

—হ্যাঁ, আমারও স্পষ্ট কথা শোন, তোমার অসুবিধা হলে তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারো।

কথাটা শুনে সুশান্ত যেন কিছুক্ষণ পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর বলে, কি বললে?

—বললাম তো তোমার এখানে না পোষালে তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারো।

—আর যদি না যাই?

—তাহলে বুঝব লজ্জা ঘেন্না বলে কিছুই তোমার নেই—

—তোমাকে আমি খুন করব—বেশ্যা—চরিত্রহীন—

অতঃপর মালঞ্চ শান্ত গলায় বলেছিল, Dont shout! আজ পর্যন্ত কি দিয়েছ তুমি আমায়—আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ চার বছর, ক'টা শাড়ি গয়না দিয়েছ বলতে পারো? একটা অন্ধকার গলির মধ্যে এই একতলার স্যাঁতসেঁতে ঘরে মানুষ কোন দিন সুস্থ থাকতে পারে? এরই নাম জীবনধারণ! ভুলে যেও না, আমি চাকরি না করলে তোমার ঐ দুশো টাকায় আজকের দিনে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াই জুটত না। শোন, গোলমাল চেঁচামেচি করো না, তোমার প্রাপ্য থেকেও তোমাকে আমি বঞ্চিত করছি না, তবে এত বড় সুযোগটা যখন হাতে এসেছে ছেড়ে দেব কেন?

কি হল সুশান্তর, তারপর আর একটি কথাও সে বলতে পারেনি। অফিস যাওয়া তার বন্ধ হয়ে গেল অতঃপর, কেবল রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। কেটে গেল আরো দু'মাস—

একদিন মালঞ্চ বললে, সুরজিৎ বালিগঞ্জে আমাকে একটা বাড়ি করে দিয়েছে, সামনের মাসে আমরা সেখানে উঠে যাব।

সুশান্তর চাকরিটি তখন আর নেই, সে কেবল স্ত্রীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

মালঞ্চ উঠে এল একদিন বালিগঞ্জের হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে। আর আশ্চর্য, সুশান্তও সেই বাড়িতে এসে উঠল। মালঞ্চর সঙ্গে মদ্যপান করে করে সুশান্ত তখন যেন কেমন ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।

দোতলায় ঘর থাকা সত্ত্বেও নীচের তলারই একটা ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করে নিল সে। মালঞ্চ বলেছিল, নীচে কেন, ওপরের তলায় ঘর রয়েছে আরও। সুশান্ত মল্লিক কোন জবাব দেয়নি। মদ্যপানের মাত্রা বেড়ে গেল সুশান্তর, আর সে মদের খরচা মালঞ্চই দিত।

অন্ধকার বেঞ্চের ওপরে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল সে খুন করবে মালঞ্চকে, কিন্তু কেমন করে খুন করবে? কেন, বিষ দেবে সে। বিষ!

বি. এস.-সিতে কেমিস্ট্রিতে অনার্স ছিল তার, অনেক ইনরগ্যানিক মেটালের নাম জানে সে, যার সামান্য ডোজই মৃত্যু আনে। মালঞ্চর আর বাঁচা চলে না, তাকে মরতেই হবে। ভদ্র গৃহস্থ ঘরের বধূ আজ এক বারবধূর রূপ নিয়েছে। হ্যাঁ, ওর মরাই উচিত। মালঞ্চকে মরতেই হবে, মাথার মধ্যে সুশান্তর আগুন জ্বলতে থাকে।

সে রাত্রে জানতেও পারেনি মালঞ্চ, সুশান্ত বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। জানতে পারল পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ, যখন রতন এসে খবর দিল, মা, নীচের বাবু সেই যে কাল সন্ধ্যার পর বের হয়ে গেছেন আর ফিরে আসেননি—

সেদিনও এল না, পরের দিন রাত্রেও ফিরে এল না সুশান্ত। মালঞ্চ সত্যিই এবার যেন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, মানুষটা গেল কোথায়? চাকরিবাকরি করে না, হাতে পয়সা নেই, মাথা গোঁজবারও যে কোন ঠাঁই নেই তা সে ভাল করেই জানে, তবে গেল কোথায় মানুষটা? সত্যি সত্যিই তবে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল নাকি!

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে দীর্ঘদিন আগেই চিড় ধরেছিল যেদিন থেকে মালঞ্চ সুরজিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে—তথাপি সুশান্ত যেমন লজ্জা ও অপমান সহ্য করেও ঐ গৃহেই পড়েছিল তেমনি মালঞ্চরও রীতিমত একটা দুর্বলতা ছিল তাঁর স্বামীর প্রতি। শুধু দুর্বলতা কেন, মালঞ্চর মনের মধ্যে বোধহয় কিছুটা মমত্ব ছিল ঐ মানুষটার জন্য।

মালঞ্চ ভাবে এর আগেও তো সে মানুষটাকে কত রূঢ় কথা বলেছে, কিন্তু কখনও তো বাড়ি ছেড়ে চলে যায়নি সে, বরং পরের দিন সন্ধ্যাতেই আবার এসে তার কাছে হাত পেতেছে। অথচ সে রাত্রে টাকাও নিল না, তার ওপর ঘর থাকে বের হয়ে গেল।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে পথের দিকে চেয়ে থেকে মালঞ্চ শূন্য দৃষ্টি মেলে। হঠাৎ মালাটার দিকে নজর পড়ল মালঞ্চর, যে মালাটা সুশান্ত দু'দিন আগে রেখে গিয়েছে। মালা দুটো মালঞ্চ স্পর্শও করেনি, মনেও ছিল না তার মালা দুটোর কথা। মালঞ্চ পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ছোট টেবিলটার দিকে—মালা দুটো এখনও পড়ে আছে, কিন্তু শুকিয়ে গিয়েছে।

ঘরের ব্র্যাকেটের ওপর রক্ষিত টেলিফোন বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং করে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মালঞ্চ ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। ওপাশ থেকে আওয়াজ ভেসে এলো পুরুষ কণ্ঠে, হ্যালো—

—কে?

—মালঞ্চ? আমি দীপ্তেন।

—বল।

—তুমি কোথাও বেরুচ্ছ নাকি?

—না।

—তাহলে আমি আসছি, বুঝলে, এখুনি আসছি—

মালঞ্চ কোন সাড়া দিল না। অন্য প্রান্তে ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হল—মালঞ্চ ফোনটা নামিয়ে রাখল।

অলস ভাবেই তাকাল দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে। সবে পৌনে সাতটা। বাইরে সন্ধ্যার ঘোর নেমেছে। সুরজিৎ এখন আসবে না, আজ দু'দিন ধরেই মালঞ্চ লক্ষ্য করছে

সুরজিতের আসতে সেই নটা সোয়া নটা বাজছে।

সব বুঝেই মালঞ্চ দীপ্তেনকে আসতে মানা করল না।

॥ তিন ॥

আজ এক বছর ধরে দীপ্তেনের সঙ্গে মালঞ্চর আলাপটা জমে উঠেছে। গত বছর মার্চে সে আর সুরজিৎ পুরী গিয়েছিল কয়েক দিনের জন্যে, সেই সময়ই একদিন সী বীচে দীপ্তেনের সঙ্গে মালঞ্চর আলাপ হয়।

বছর বত্রিশ তেত্রিশ বয়স হবে দীপ্তেনের, লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা। এখনো বিয়ে-থা করেনি, ব্যাচেলার। বিলেত থেকে কি সব ম্যানেজমেন্ট না কি পড়ে এসেছে। একটা বড় ফার্মে বেশ মোটা মাইনের চাকরি করে।

দীপ্তেন ভৌমিককে দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিল মালঞ্চ, দীপ্তেনও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। আলাপ ঘনীভূত হয় কলকাতায় এসে, আজ প্রায় মাস ছয়েক হল। দুপুরে মাঝে মধ্যে তার ওখানে আসতে শুরু করে দীপ্তেন।

একদিন দীপ্তেন হাসতে হাসতে বলেছিল, তোমার স্বামী যদি টের পেয়ে যান?

—এ সময় তো সে থাকে না।

—আরে সেইজন্যেই তো আমি এ সময় আসি, তাহলেও টের পেয়ে গেলে—

—সুরজিৎ আমার স্বামী নয় দীপ্তেন—

দীপ্তেন তো কথাটা শুনে একেবারে বোকা। বলেছিল, কি বলছ তুমি।

—ঠিকই বলছি—

—তবে সুরজিৎ ঘোষালের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

—We are friends. Just friends!

—ফ্রেন্ডস্!

—হ্যাঁ।

—তাহলে তোমার স্বামী? তুমি তো বিবাহিতা?

—তাই, কিন্তু সে থেকেও নেই।

—এ বাড়িটা তবে কার?

—সুরজিৎ আমাকে কিনে দিয়েছে। আমার।

দীপ্তেন মৃদু হেসেছিল মাত্র, তারপর একটু থেমে প্রশ্ন করেছিল, সুরজিৎ ঘোষালের সঙ্গে তোমার আলাপ হল কি করে?

—হয়ে গেল।

—কত দিন হবে?

—তা অনেক দিন হল। তারপরই মালঞ্চ বলেছিল, ও একটা ফার্মের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। ওর স্ত্রী আছে, দুটি ছেলে আছে। বড় ছেলে যুধাজিতের বয়সই তো প্রায় ছাব্বিশ—কথাগুলো বলে হাসতে থাকে মালঞ্চ।

—যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল—দীপ্তেন বলেছিল।

দীপ্তেনের একটা তীব্র আকর্ষণ আছে, সে আকর্ষণকে এড়াতে পারেনি মালঞ্চ। তাছাড়া মালঞ্চ নিশ্চিত ছিল সুরজিৎ ব্যাপারটা কিছুতেই জানতে পারবে না। মানদা বা রতন কিছু বলবে না, কারণ যাতে না বলে সে ব্যবস্থা মালঞ্চ করেছিল আর নীচের তলায় থাকলেও স্বামী সুশান্ত কিছুই বলবে না। কারণ সুরজিতের সঙ্গে সে কথাই বলে না।

তবু দীপ্তেন একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, ঐ বুড়ো ভাল্লুকটাকে তুমি কি করে সহ্য কর মালঞ্চ?

—ছিঃ, ও কথা বলতে নেই।

—ও তো তোমার বাপের বয়সী।

—তাহলেও সব কিছু আমাকে সে-ই দিয়েছে।

—এ সব ছেড়ে দাও, চলে এসো তুমি আমার পাশের ফ্ল্যাটে, ফ্ল্যাটটা খালি আছে।

—কেন, তোমার কি কোন অসুবিধা হচ্ছে এখানে?

—অসুবিধা হচ্ছে বৈকি। আমি তোমাকে একান্ত ভাবে পেতে চাই মালা, একমাত্র আমারই হয়ে থাকবে তুমি।

—সেটা কি নিদারুণ একটা বিশ্বাসঘাতকতা হবে না দীপ্তেন? যে লোকটা এত দিন ধরে আমাকে এত সুখ, প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রেখেছে, বাড়ি গাড়ি সব কিছু দিয়েছে—

—আপাতত বাড়ি গাড়ি না দিতে পারলেও, স্বাচ্ছন্দ্য আর আরাম আমিও তোমাকে দিতে পারব মালঞ্চ। চল তুমি আমার সঙ্গে, অবিশ্যি সুরজিৎবাবুকে বলেই যাবে, না বলে তোমাকে যেতে বলছি না আমি।

—সেটা কি ভাল হবে দীপ্তেন?

—কেন ভাল হবে না? জানি না কি পেয়েছ তুমি ঐ বুড়ো ভাল্লুকটার মধ্যে।

দীপ্তেন জানত না এ সংসারে এমন মেয়েমানুষও আছে যাদের কাছে দৈহিক আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য ও সাচ্ছল্যটাই সব কিছু এবং তার জন্যে নিজেদের বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা বোধ করে না। স্বামীর কাছ থেকে সেটা পাবার কোন আশা ছিল না বলেই মালঞ্চ সুরজিৎকে আঁকড়ে ধরেছিল। দেহ ও রূপ যৌবন তাদের কাছে কিছুই না, উচিত মূল্য পেলে তারা সবকিছুই করতে পারে।

মিনিট কুড়ির মধ্যে দীপ্তেন এলো। রাত তখন পৌনে আটটা।

—একটা প্রেজেন্টেশন এনেছি তোমার জন্যে—দীপ্তেন হাসতে হাসতে বলল।

—সত্যি কি?

—Just guess, বল তো কি হতে পারে?

—কেমন করে বলব বল।

পকেট থেকে দীপ্তেন একটা মরক্কো লেদারের ছোট বাক্স বের করল। বোতাম টিপতেই বাক্সের ডালাটা খুলে গেল—ভিতরে একটা মুক্তোর নেকলেস।

—দেখি, দেখি—how lovely! দাও, পরিয়ে দাও।

দীপ্তেন মুক্তোর নেকলেসটা মালঞ্চর শঙ্খের মত গ্রীবায় পরিয়ে দিল।

—You are really sweet দীপ্তেন। মালঞ্চ দু'হাতে দীপ্তেনকে জড়িয়ে ধরল। ঐ সময় সুরজিতের গাড়ির হর্ন শোনা গেল।

—সর্বনাশ! সুরজিতের গাড়ির হর্ন! মালঞ্চ বলল, দীপ্তেন, শীঘ্রি তুমি বাথরুমের পিছনের দরজা খুলে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাও।

—আসতে দাও সুরজিৎবাবুকে। তুমি তো পারবে না, আজ আমিই এর চূড়ান্ত ফয়সালা করে নেব—

—না না, তুমি যাও। কেন বুঝতে পারছ না দীপ্তেন, সুরজিৎ তোমাকে এখানে দেখলেই—

—দেখুক না। তোমার ওপর তারও যেমন অধিকার আছে, আমারও ঠিক তেমনি অধিকার আছে।

—দীপ্তেন, কি করছ! যাও প্লীজ।

—ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। কিন্তু একজনকে তোমাকে বেছে নিতে হবে মালঞ্চ—হয় সুরজিৎ ঘোষাল, না হয় দীপ্তেন ভৌমিক—দুজনের সঙ্গে তুমি খেলা চালিয়ে যাবে তা দীপ্তেন হতে দেবে না, বুঝেছ? কথাগুলো বলে দীপ্তেন বাথরুমের মধ্যে ঢুকে গেল। যাওয়ার সময় হাতের সিগ্রেটটা অ্যাশট্রের মধ্যে ঘষে দিয়ে গেল। সিঁড়িতে তখন সুরজিতের জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মালঞ্চ সুরজিৎ সম্পর্কে একটু ভুল করেছিল। সে ভেবেছিল তার আর দীপ্তেনের গোপন মিলনের ব্যাপারটা সুরজিৎ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না। জানবার একমাত্র উপায় মানদা আর রতন, কিন্তু টাকার লোভে তারা সুরজিতের কানে কথাটা তুলবে না।

কিন্তু তার ঐখানেই হিসেবে ভুল হয়েছিল। রতন বলেনি কিন্তু মানদা সুরজিতের কানে কথাটা আকারে ইঙ্গিতে তুলে দিয়েছিল, সুরজিতের ইদানীং ভাবান্তরের কারণও তাই। সেটা মালঞ্চ অনুমানও করতে পারেনি।

কিন্তু সুরজিৎ মুখে কিছু প্রকাশ করেনি, তক্কে তক্কে ছিল সুযোগের অপেক্ষায়। তবু দীপ্তেনকে ধরতে পারেনি সুরজিৎ, কারণ দীপ্তেন এমনই সময় আসত যখন সুরজিতের আসার সম্ভাবনা নেই। দু-একবার তথাপি সে surprise visit দিয়েছে, তবু দীপ্তেনকে ধরতে পারেনি মালঞ্চরই সাবধানতার জন্য।

আজ ঘরে ঢুকেই সুরজিৎ থমকে দাঁড়াল। মালঞ্চ সুরজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে মদির কটাক্ষে মুখে মৃদু হাসি টেনে বলল, কি সৌভাগ্য, আজ একেবারে নির্ধারিত সময়ের আগেই?

—আগে এসে পড়ে তোমার অসুবিধা ঘটালাম মালঞ্চ?

—কি যা-তা বলছ সুরজিৎ! জানো, আজ মার্কেট থেকে মটন এনে আমি নিজে স্টু রেঁধেছি তোমার জন্যে, সঙ্গে কি খাবে বল—পরটা না লুচি? কি হল, অমন ভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন—পোশাক ছাড়বে না?

—বাঃ, তোমার হারটা তো চমৎকার—সুরজিৎ ঘোষাল বলে ওঠে।

—আমার গলায়! সঙ্গে সঙ্গে হারটার কথা মনে পড়ে যায় মালঞ্চর, মুখের হাসি তার উবে যায়।

—তা কিনলে বুঝি হারটা—না কোন প্রেমিকের প্রেমোপহার?

—ছিঃ সুরজিৎ, তোমার মন এত ছোট! হারটা আমি আজই কিনে এনেছি।

—কোন্ দোকান থেকে কিনলে? সাচ্চা মুক্তো বলেই যেন মনে হচ্ছে—বলতে বলতে হঠাৎ সুরজিতের নজর পড়ে সামনের ত্রিপয়ে অ্যাশট্রেটার ওপর।

এগিয়ে গেল সুরজিৎ—অর্ধদগ্ধ, দুমড়ানো সিগ্রেটটা অ্যাশট্রে থেকে তুলে নিল। তারপর শান্ত গলায় সুরজিৎ বলল, দীপ্তেন ভৌমিক কখন এসেছিল মালঞ্চ?

—দীপ্তেন ভৌমিক!

—আকাশ থেকে পড়ার ভাব কোরো না মালঞ্চ, ব্যাপারটা আমার কাছে আর গোপন নেই।

—কি গোপন নেই।

—তুমি যে বেশ কিছুকাল ধরেই দীপ্তেন ভৌমিকের সঙ্গে মাতামাতি করছ—আমি সেটা জানি।

হঠাৎ সোজা ঋজু হয়ে দাঁড়াল মালঞ্চ। বলল, হ্যাঁ, এসেছিল।

—কেন, কেন সে এখানে আসে?

—কৈফিয়ৎ চাইছ?

—চাওয়াটা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়।

—কিন্তু ভুলো না সুরজিৎ, আমি তোমার বিয়ে করা স্ত্রী নই।

—জানি, তুমি আমার রক্ষিতা।

—ভদ্রভাবে কথা বল সুরজিৎ।

—ভদ্রভাবে কথা বলব কার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে—একটা হার্লটের সঙ্গে?

—Shut up!

—হারামজাদী, তুই আমারই খাবি, আমারই ঘরে থাকবি, আর—

—বের হয়ে যাও—মালঞ্চ চিৎকার করে ওঠে, এই মুহূর্তে এ বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও সুরজিৎ—এটা আমার বাড়ি।

সুরজিতের বোধহয় মনে পড়ে যায় যে বৎসর খানেক পূর্বে পাকাপোক্তভাবে বাড়িটার দলিল রেজিস্ট্রি করা হয়ে গিয়েছে মালঞ্চর নামে।

তাই বলে, ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। কিন্তু তোকেও আমি ছেড়ে দেব না হারামজাদী, গলা টিপে তোকে আমি শেষ করে দেব—মুহূর্তে সুরজিৎ ঘর থেকে হনহন করে বের হয়ে গেল।

রাগে মালঞ্চ তখন ফুঁসছে।

একটু পরেই মানদা এসে ঘরে ঢুকল।—কি হয়েছে মা, বাবু চলে গেলেন?

—নীচের দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা আমায় এনে দে মানদা!

—কিন্তু নীচের বাবু যদি ফিরে আসেন?

—ঠিক আছে, যা। আর হ্যাঁ, শোন্, ঐ নীচের বাবু এলে আমাকে জানাবি।

॥ চার ॥

ব্যাপারটা পরে জানা যায়—আগের দিন অর্থাৎ শুক্রবারের সন্ধ্যার ঘটনা।

পরের দিন শনিবার, মানদা সকাল পৌনে সাতটা নাগাদ চা নিয়ে এসে দরজা ঠেলে দেখে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ।

প্রথমে ডাকাডাকি করে মানদা, পরে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে, কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে মালঞ্চর কোন সাড়া পাওয়া যায় না। মানদা ভয় পেয়ে রতনকে ডেকে আনে। দুজনে তখন আরো জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দেয় আর চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করে, তবু কোন সাড়া নেই—

মানদা ভয় পেয়ে গিয়েছে তখন রীতিমত। কাঁপা কাঁপা গলায় রতনকে বলল, ব্যাপার কি বল তো রতন?

ঠিক ঐ সময় সিঁড়িতে স্যান্ডেলের শব্দ পাওয়া গেল।

মানদা বলল, এ সময় কে এলো আবার?

মালঞ্চর স্বামী সুশান্ত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলো। মাথার চুল রুক্ষ, একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনের প্যান্ট আর শার্টটা আরো ময়লা হয়ে গিয়েছে।

মানদা সুশান্তকে দেখে বলে, বাবু, মা ঘরের দরজা খুলছে না।

—খুলবেও না আর কোন দিন—

—সে কি বাবু! কি বলছেন আপনি।

—আমি জানি, শেষ হয়ে গেছে—আমি চললাম—থানায় খবর দাও—তারাই এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকবে—বলে যেমন একটু আগে এসেছিল সুশান্ত, তেমনি ভাবেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

সুশান্ত কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল না, সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের তলায় নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘণ্টা দুই পরে থানার অফিসার নীচের ঘরে ঢুকে দেখতে পেয়েছিলেন তক্তোপোষের ওপর সুশান্ত গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

সুশান্ত কথাগুলো বলে যাবার পর রতন কিছুক্ষণ ঘরের সামনে বারান্দাতে দাঁড়িয়েই থাকে, তারপর মানদার দিকে কেমন যেন বিহ্বল বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মানদাও চুপচাপ দাঁড়িয়ে, তারও মুখে কোন কথা নেই।

কিছুক্ষণ পর রতনের যেন বিহ্বলতাটা কাটে। সে বলে, তুই কোথাও যাস নে মানদা, আমি থানাতে চললাম—

—থানায়, কেন রে?

—কি বোকা রে তুই। সত্যিই যদি মা মারা পড়ে থাকেন তাহলে ঘরের দরজা ভেঙে কি আমরা খুনের দায়ে পড়ব?

—খুন! অস্ফুট কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে মানদা।

—কে জানে! হতেও তো পারে! কাল এগোরাটা পর্যন্ত যে মানুষটা বেঁচে ছিল হঠাৎ

সে যদি রাত্রে ঘরের মধ্যে মরে পড়ে থাকে! উঁহু বাবা, আমার ভাল ঠেকছে না। নিশ্চয়ই কোন গোলমাল আছে—আমি চললাম থানায় খবর দিতে—বলতে বলতে রতন সিঁড়ির দিকে এগুলো।

—এই রতন, আমাকেও তাহলে তোর সঙ্গে নিয়ে চল্—মানদা চেঁচিয়ে ওঠে।

—আমাকে সঙ্গে নে! মানদাকে খিঁচিয়ে উঠল রতন, তুই কচি খুকীটি নাকি!

—মাইরি বলছি রতন, আমি এর কিছু জানি না।

—জানিস না তো থানার লোক এসে যখন জিজ্ঞাসা করবে তখন তাই বলবি।

—আমি কাল রাত এগারোটার সময় যখন নীচে চলে যাই মা তখন চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছিল। জলজ্যান্ত মানুষটা—

—তাহলে তাই বলবি, আমি আসছি—বলে রতন সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

স্থানীয় থানার দারোগা সুশীল চক্রবর্তীর বয়স খুব বেশী নয়, বছর চল্লিশেক হবে। রতনের মুখে সংবাদটা পেয়েই জনা-দুই সেপাই সঙ্গে নিয়ে তিনি হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে চলে এলেন।

মানদা তখনও বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখমুখ ফ্যাকাশে। একটা অজ্ঞাত ভয় যেন মানদাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

সুশীল চক্রবর্তী মানদাকে দেখিয়ে রতনকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে?

—আজ্ঞে বাবু, ও এই বাড়িব ঝি, মানদা।

—হুঁ। কোন্ দরজা?

—ঐ যে দেখুন না—

—সুশীল চক্রবর্তী দরজাটা একবার ঠেললেন—দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। জোরে জোরে দরজার গায়ে কয়েকবার ধাক্কা দিলেন—ভিতর থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

—বিক্রম সিং!

—জি হুজুর!

—দরজা ভেঙে ফেল।

কিন্তু ঘরের দরজা ভাঙা অত সহজ হল না। মজবুজ কাঠের দরজা, দরজার গায়ে ইয়েল লক সিস্টেম। অনেক কষ্টে প্রায় আধ-ঘণ্টা ধরে চেষ্টার পর বিক্রম সিং আর হরদয়াল উপাধ্যায় দরজাটা ভেঙে ফেলল।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই সুশীল চক্রবর্তী থমকে দাঁড়ালেন।

ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে তখনো, সব জানলা বন্ধ। মালঞ্চ চেয়ারের ওপর বসে—মাথাটা ঈষৎ বুকের ওপর ঝুঁকে আছে, আর হাত-পাঁচেক দূর থেকেই সুশীল চক্রবর্তী স্পষ্ট দেখতে পেলেন, একটা পাকানো রুমাল মহিলাটির গলায় চেপে বসে আছে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে উপবিষ্ট ঐ দেহটার দিকে তাকিয়ে থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন সুশীলবাবু।

চোখ দুটো বিস্ফারিত, মুখটা ঈষৎ হাঁ হয়ে আছে, এবং মুখের ভিতর থেকে জিহ্বাটা সামান্য বের হয়ে আছে। গায়ে হাত দিলেন—শরীর ঠাণ্ডা এবং শক্ত কাঠ। সুশীল চক্রবর্তীর বুঝতে কষ্ট হল না, মহিলাটি অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছেন।

মাথার কেশ বিপর্যস্ত কিছুটা। হাত দুটো দু'পাশে ছড়ানো। গলায় একটা সোনার হার, হাতে পাঁচগাছি করে বর্ফি প্যাটার্নের সোনার চুড়ি ঝক্‌ঝক্ করছে, কানে নীল পাথরের দুটো টাব। পরনে একটা জামদানী ঢাকাই শাড়ি, বুক পর্যন্ত ব্লাউজের বোতামগুলো ছেঁড়া, খালি পা—

হঠাৎ নজর পড়ল সুশীলবাবুর—ঘরময় কতকগুলো বড় বড় মুক্তো ছড়ানো, নীচু হয়ে মেঝে থেকে একটা মুক্তো তুলে নিয়ে হাতের পাতায় মুক্তোটা পরীক্ষা করলেন, একটা বড় মটরের দানার মত মুক্তোটা—ভিতর থেকে একটা নীলাভ দ্যুতি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। দামী সিংহলী মুক্তো মনে হয়।

স্পষ্ট বোঝা যায়, কেউ গলায় রুমাল পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে ভদ্রমহিলাকে হত্যা করেছে। মানদা আর রতন ঢোকেনি, তারা বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। সুশীল চক্রবর্তী ডাকলেন, ওহে রতন না কি তোমার নাম, ভিতরে এসো।

রতন প্রায় কাঁপতে কাঁপতে এসে ঘরে ঢুকল আর ঢুকেই গৃহকর্ত্রীকে ঐ ভাবে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে অস্ফুট একটা ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল।

—এ কে?

—আজ্ঞে উনিই আমাদের মা, এই বাড়ির কর্ত্রী।

—তা তোমাদের বাবু—মানে কর্তাবাবু কই, তাকে ডাক তো একবার।

—বাবু তো এখানে থাকেন না আজ্ঞে।

—থাকেন না মানে?

—আজ্ঞে রেতের বেলায় থাকেন না। সন্ধ্যার পর আসেন আর রাত এগারোটা সোয়া এগারোটা নাগাদ চলে যান।

—দেখ বাপু, তোমার কথার তো আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। বাবু এখানে থাকেন না—মানে তোমাদের গিন্নীমা একা একা এ বাড়িতে থাকেন?

—আজ্ঞে একা না, মানদা আর আমি থাকি, আর নীচের ঘরে একজন বাবু থাকেন।

—বাবু! কে বাবু?

—তা তো জানি না আজ্ঞে, উনি তিনদিন ছিলেন না, আজ সকালেই আবার ফিরে এসেছেন। তিনিই তো বললেন আজ্ঞে, আমাদের মা বেঁচে নেই, তিনি মরে গেছেন।

সুশীল চক্রবর্তীর কেমন যেন সব গোলমাল ঠেকে। এবং বুঝতে পারেন ব্যাপারটার মধ্যে সত্যিই গোলমাল আছে।

—যাকে ওরা এ বাড়ির মালিক বা বাবু বলছে—তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যায় আসেন, আবার রাত্রি এগারোটা সোয়া এগারোটায় চলে যান, অথচ নীচে আর এক বাবু থাকে—মানে কি?

সুশীলবাবু প্রশ্ন করলেন, এ বাড়ির আসল মালিক কে?

—আজ্ঞে বললাম তো, তিনি এখানে থাকেন না!

BanglaBook.org

—তার নামটা জানো? কি নাম তার?

—আজ্ঞে শুনেছি সুরজিৎ ঘোষাল।

—আর নীচে যে বাবু থাকেন, তার নাম?

—তা তো জানি না।

—সে বাবুটি কে?

—তা জানি না।

—তবে তুমি জানলে কি করে যে এ বাড়ির আসল মালিক সুরজিৎ ঘোষাল।

—আজ্ঞে মানদার মুখে শুনেছি।

—ডাক তোমার মানদাকে। সুশীলবাবু বললেন।

—এই মানদা, ঘরে আয়, দারোগাবাবু কি শুধাচ্ছেন। রতন মানদাকে ডেকে আনল।

মানদা এসে ঘরে ঢুকল। একটু মোটার দিকে চেহারাটা, বয়সে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। মনে হয় মাথার চুল পরিপাটী করে আঁচড়ানোই ছিল, এখন একটু বিপর্যস্ত। পরনে একটা ভেলভেটপাড় মিলের মিহি শাড়ি, গলায় একগাছা সরু হার, হাতে সোনার রুলি। চোখমুখের চেহারাটা বেশ সুশ্রী।

—তোমার নাম মানদা?

—আজ্ঞে বাবু।

—ইনি তোমাদের গিন্নীমা?

—আজ্ঞে—কাঁপা কাঁপা গলায় বলল মানদা। ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা নজরে পড়েছিল তার।

—তোমাদের কর্তাবাবুর সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ছিল?

—আজ্ঞে ইনি সুরজিৎবাবুর বিয়ে করা ইস্ত্রী নন।

—বিয়ে করা স্ত্রী নন।

—আজ্ঞে না।

এবার সুশীলবাবু বুঝতে পারেন মহিলাটি সুরজিৎ ঘোষালের রক্ষিতা ছিল। বলেন, তার মানে উনি সুরজিৎবাবুর রক্ষিতা ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—এঁর কোন আত্মীয়স্বজন আছে?

—আছে।

—কে?

—ওঁর স্বামী।

—স্বামী! কোথায় থাকেন তিনি? তাঁর নাম জানো?

—জানি, সুশান্তবাবু—এই বাড়িরই নীচের তলায় থাকেন।

—এখানেই থাকেন?

—হ্যাঁ।

—কোথায় তিনি?

—বোধ হয় নীচে।

—কাল রাত্রে বাড়ি ছিলেন সুশান্তবাবু?

—আজ্ঞে তিনদিন ছিলেন না, আজ সকালেই এসেছেন—

ব্যাপারটা সুশীল চক্রবর্তীর কাছে তখনো পরিষ্কার হয় না। সুশীল চক্রবর্তী আবার প্রশ্ন করলেন, সুরজিৎবাবু কি রোজ আসতেন এখানে?

—তা আসতেন বৈকি।

—আর ওঁর স্বামী?

—এই তো একটু আগে বল্লু, সে মানুষটার সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই ছিল না।

—উনি ওপরে আসতেন না?

—না। তবে মাঝে-মধ্যে টাকার দরকার হলে, মানে মদ খাবার পয়সা চাইতে আসতেন।

—কত দিন এ বাড়িতে আছ তুমি?

—তা বছর চারের বেশীই হবে।

—আর উনি?

—উনি কতদিন এ বাড়িতে আছেন জানি না বাবু, তবে শুনেছি এই বাড়িটা সুরজিৎবাবুই ওঁকে কিনে দিয়েছিলেন।

—গ্যারেজে একটা গাড়ি দেখলাম—

—সুরজিৎবাবু গিন্নীমাকে ওটা কিনে দিয়েছিলেন।

—ড্রাইভার নেই?

—আজ্ঞে না, মা নিজেই গাড়ি চালাতেন।

—রতন কতদিন আছে?

—ও আমার মাস দুই পরে আসে। তার আগে এক বুড়ো ছিল—ভৈরব, সে কাজ ছেড়ে দেবার পর রতন আসে।

—সুরজিৎবাবু কোথায় থাকেন জানো?

—আজ্ঞে কোথায় থাকেন জানি না, তবে ফোন নাম্বারটা জানি।

সুশীল চক্রবর্তী মানদার কাছ থেকে ফোন নাম্বারটা নিয়ে ঘরের কোণে দেওয়ালের ব্র্যাকেটের ওপরে রক্ষিত ফোনটার কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে নম্বর ডায়াল করলেন। একজন ভদ্রমহিলা ফোন ধরলেন।

—এটা কি সুরজিৎবাবুর বাড়ি?

—হ্যাঁ।

—তিনি বাড়িতে আছেন?

—আছেন, ঘুমোচ্ছেন—আধ ঘণ্টা বাদে ফোন করবেন।

—তাঁকে একটিবার ডেকে দিন, আমার জরুরী দরকার।

—কে আপনি? কোথা থেকে বলছেন?

—আপনি কে কথা বলছেন?

—আমি তাঁর স্ত্রী।

—শুনুন, বিশেষ জরুরী দরকার, আমি পুলিস অফিসার—একবার তাঁকে ডেকে দিন।

BanglaBook.org

একটু পরেই অন্য প্রান্ত থেকে ভারি গলা শোনা গেল। সুরজিৎ ঘোষাল বলছি!

—আমি বালিগঞ্জ থানার ও.-সি. সুশীল চক্রবর্তী, আপনাদের হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি থেকে বলছি, এখুনি একবার এখানে চলে আসুন।

—কি ব্যাপার?

—এ বাড়িতে একজন খুন হয়েছেন, যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে আসুন। বলে সুশীল চক্রবর্তী ফোন রেখে দিলেন।

—ওঁর স্বামী নীচের ঘরে থাকেন বলছিলে না? সুশীলবাবু আবার মানদাকে প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ।

—চল তো নীচে।

একজন সেপাইকে ঘরের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে সুশীল চক্রবর্তী মানদাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলেন। বাড়িটি দোতলা, ওপরে তিনখানা ঘর, নীচেও তিনখানা ঘর, আর আছে দেড়তলায় একটা ঘর, তার নীচে গ্যারেজ।

সুশীলবাবু যখন ঘরে ঢুকলেন সুশান্ত তখন ঘুমে অচেতন।

সুশীল চক্রবর্তী একবার ঘরটার চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। একটা বেতের চেয়ার, একটা খাট। এক কোণে দড়ির আলনায় খানকয়েক ময়লা প্যান্ট, শার্ট, লুঙ্গি ঝুলছে আর এক কোণে ছেঁড়া ময়লা কাবুলী চপ্পল, কাচের গ্লাস চাপা দেওয়া একটা জলের কুঁজো। লোকটা শার্ট আর প্যান্ট পরেই ঘুমোচ্ছে।

—শুনছেন, ও মশাই—

কয়েকবার ডাকেও ঘুম ভাঙল না, শেষ পর্যন্ত ধাক্কা দিয়ে সুশান্তর ঘুম ভাঙাতে হল।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে সুশান্ত উঠে বসল, কে?

—আমি থানা থেকে আসছি, কি নাম আপনার?

—আমার নাম দিয়ে কি হবে আপনার?

—যা জিজ্ঞাসা করছি জবাব দিন—ধমকে উঠলেন সুশীল চক্রবর্তী, কি নাম বলুন?

—সুশান্ত মল্লিক।

—এ বাড়ি আপনার?

—আজ্ঞে না?

—তবে এ বাড়ি কার?

—কে জানে কার।

—জানেন না, অথচ এ বাড়িতে থাকেন, ভারি আশ্চর্য তো! সুরজিৎ ঘোষালকে চেনেন?

—চিনব না কেন?

—কে লোকটা?

—ওপরে গিয়ে মালঞ্চ দেবীকে শুধান না, তিনিই আপনার সব প্রশ্নের জবাব দেবেন।

—মালঞ্চ দেবী কে?

হাসল সুশান্ত, বলল, সুরজিৎ ঘোষালের মেয়েমানুষ।

BanglaBook.net

—আপনি কে হল মালঞ্চ দেবীর?

—কেউ না।

—মিথ্যে কথা বলছেন, মানদা বলছিল উনি আপনার স্ত্রী।

—বাজে কথা, আপনি নিজেই গিয়ে শুধান না ওকে।

—কাকে শুধাব—she is dead.

—তাহলে সত্যি সত্যিই she is dead! জানেন মশাই, ভেবেছিলাম আমিই ঐ মহৎ কর্মটি করব। অর্থাৎ একদিন হত্যা করব ওকে। কিন্তু তা আর হল না, দেখছি, মাঝখান থেকে হার্লটটাকে আর একজন এসে হত্যা করে গেল। However I am really glad it is don!

—আপনিও এই বাড়িতেই থাকেন?

—হ্যাঁ, মালঞ্চ দেবীর দয়ায়।

—এ বিষয়ে আপনি কিছু জানেন, মানে কে বা কারা তাঁকে হত্যা করতে পারে?

—না মশাই, আমি আদার ব্যাপারী, আমার জাহাজের সংবাদে কি প্রয়োজন। দেখুন স্যার, তিন রাত আমি ঘুমোইনি। ঘুমে শরীর আমার ভেঙে আসছে, Please, আমাকে একটু ঘুমোতে দিন। বলতে বলতে সুশান্ত আবার খাটের ওপর গা ঢেলে শুয়ে পড়ল।

ঠিক ঐ সময় বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ শোনা গেল। সুশীল চক্রবর্তী বাইরে এসে দেখলেন, সৌম্য, সুন্দর, হৃষ্টপুষ্ট এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বিরাট একটা ইমপোর্টেড কার থেকে নামছেন। পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি, পায়ে চপ্পল।

সুশীল চক্রবর্তী এগিয়ে বললেন, আপনি বোধ হয় সুরজিৎ ঘোষাল?

—হ্যাঁ। ফোনে বলেছিলেন কে যেন খুন হয়েছে। রীতিমত উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ল সুরজিৎ ঘোষালের কণ্ঠে।

—হ্যাঁ, ওপরে চলুন মিঃ ঘোষাল। আসুন।

সুশীল চক্রবর্তীর পিছনে পিছনে ওপরে উঠে মালঞ্চর শয়নকক্ষে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন সুরজিৎ ঘোষাল, এ কি! মালা নেই!

—না মিঃ ঘোষাল, she is dead.

—সত্যি সত্যিই মৃত?

—হ্যাঁ ঐ দেখুন, গলায় রুমাল পেঁচিয়ে ওঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে।

—হত্যা করা হয়েছে!

—হ্যাঁ।

—কে—কে হত্যা করল?

—সেটা এখনো জানা যায়নি?

—মালঞ্চকে হত্যা করা হয়েছে! সুরজিৎ ঘোষাল যেন কেমন বিমূঢ় অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকেন মালঞ্চর মৃতদেহটার দিকে।

—মিঃ ঘোষাল!

সুশীল চক্রবর্তীর ডাকে কেমন যেন বোবাদৃষ্টিতে সুরজিৎ তাকালেন তাঁর মুখের দিকে।

—এ বাড়িটা কার? সুশীল চক্রবর্তীর প্রশ্ন।

—এই বাড়িটা—এটা—

—কার এ বাড়িটা? এ বাড়ির মালিক কে?

—ঐ মালঞ্চ।

—কিন্তু আপনিই এ বাড়িটা কিনে দিয়েছিলেন ঐ মালঞ্চ মল্লিককে, তাই নয় কি?

—কে বলল আপনাকে?

—আমি জেনেছি।

সুরজিৎ ঘোষাল বোবা।

—আর উনি আপনার keeping-য়ে ছিলেন, এটা কি সত্যি?

—হ্যাঁ—সুরজিৎ ঘোষাল কুণ্ঠার সঙ্গে মাথা নীচু করে বললেন।

—কত বছর উনি আপনার কাছে ছিলেন? সুশীল চক্রবর্তীর আবার প্রশ্ন।

—তা বোধ হয় বছর সাতেক হবে।

—Quite a long period, তা কখনও মনোমালিন্য বা ঝগড়া-টগড়া হয়নি আপনাদের দুজনের মধ্যে?

—ঝগড়া? না। তবে ইদানীং কিছুদিন ধরে আমি ওর ওপরে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলাম। She was playing double role with me!

—অন্য কোন পুরুষ?

—হ্যাঁ!

—কি নাম তার?

—দীপ্তেন ভৌমিক?

—তিনি বুঝি এখানে যাতায়াত করতেন?

—হ্যাঁ এবং আমার অগোচরে।

—কথাটা কি করে জানতে পারলেন—if you don't mind মিঃ ঘোষাল!

—Somehow firt I smelt it. আমার কেমন সন্দেহ হয়—বুঝতেই পারছেন I became alert—এবং ক্রমশ সবই জানতে পারি একটু একটু করে।

—আচ্ছা ঐ যে দীপ্তেন ভৌমিক, তিনি কি করেন, কোথায় থাকেন জানেন নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ, শুনেছিলাম তিনি বালিগঞ্জেই লেক রোডে থাকেন। বিলেত থেকে ম্যানেজমেন্ট না কি সব পাস করে এসে বছর তিনেক হল একটা ফার্মে কাজ করছেন। মোটা মাইনে পান।

—তা দীপ্তেনবাবুর সঙ্গে মালঞ্চদেবীর আলাপ হল কী করে?

—বলতে পারেন আমারই নির্বুদ্ধিতায়।

—কি রকম?

—গত বছর আমরা পুরী বেড়াতে যাই, সেখানেই আলাপ।

—তাঁর বাড়ির ঠিকানাটা জানেন?

—জানি।

সুরজিৎ ঘোষালের কাছ থেকে ঠিকানাটা শুনে সুশীল চক্রবর্তী লিখে নিলেন তাঁর নোটবইয়ে।

—আচ্ছা মিঃ ঘোষাল, তিনি কি ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন?

—না, ওটা একটা মাল্‌টি-স্টোরিড বিলডিংয়ের চারতলার ফ্ল্যাট, মনে হয় ফ্ল্যাটটা তিনি কিনেছেন।

বিক্রম সিং ঐ সময় একটা কাগজে করে কতকগুলো মুক্তো এনে সুশীল চক্রবর্তীর হাতে দিয়ে বলল, স্যার, ঘরের মধ্যে এই পঞ্চাশটা মুক্তো পাওয়া গিয়েছে। আর এই ছেঁড়া সিল্কের সুতোটা।

সুশীল চক্রবর্তী কাগজটা সবসমেত মুড়িয়ে পকেটে রেখে বললেন, আপনি কাল এখানে এসেছিলেন, মিঃ ঘোষাল?

—এসেছিলাম।

—কখন?

—রাত্রি সোয়া আটটা নাগাদ।

—তারপর কখন চলে যান?

—আধঘণ্টা পরেই।

—অত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন যে?

—কাজ ছিল একটা।

—আচ্ছা মালঞ্চদেবীর স্বামী তো এই বাড়িতেই থাকেন। আপনি কোন আপত্তি করেননি?

—না।

—আপনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে?

—থাকবে না কেন—

—লোকটিকে কি রকম মনে হয়?

—Most non-interfering, শান্তশিষ্ট টাইপের মানুষ।

—Naturally!

—আমি কি এখন যেতে পারি মিঃ চক্রবর্তী?

—হ্যাঁ পারেন, তবে আপনাকে আমার হয়তো পরে দরকার হতে পারে।

—সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর ফোন করলেই আপনি আমাকে বাড়িতে পাবেন।

সুরজিৎ ঘোষালকে বিদায় দিয়ে রতনকে আবার ডাকলেন সুশীল চক্রবর্তী। প্রশ্ন করলেন—তোমার নাম রতন—কি?

—আজ্ঞে রতন সাঁপুই।

—তোমার দেশ কোথায়?

—মেদিনীপুর জেলায় আজ্ঞে—পাঁশকুড়ায়।

—আচ্ছা রতন, ঐ সুরজিৎবাবু ছাড়া অন্য একজন বাবুও এখানে আসতেন, তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দীপ্তেনবাবু।

—কাল রাত্রে দীপ্তেনবাবু এসেছিলেন?

—হ্যাঁ, সন্ধ্যার মুখেই এসেছিলেন।

pathagar.net

—কখন চলে গেলেন?

—আজ্ঞে কখন গিয়েছিলেন বলতে পারব না—তাঁকে আমি যেতে দেখিনি।

—হুঁ। আচ্ছা দীপ্তেনবাবু থাকতে থাকতেই কি সুরজিৎবাবু এসেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তাহলে তো দুজনে দেখাও হতে পারে—

—বলতে পারব না আজ্ঞে—দেখা হয়েছিল কিনা—

—হুঁ। কাল কত রাত পর্যন্ত তুমি জেগে ছিলে?

—আজ্ঞে মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল, তাই সদরে তালা দিয়ে দশটা নাগাদ শুয়ে পড়েছিলাম। তারপরই ঘুমিয়ে পড়েছি।

—আজ সকালে কখন ঘুম ভাঙল?

—ভোর ছটা সাড়ে ছটায় মা চা খেতেন এবং মার হাতমুখ ধোয়া হয়ে গেলেই রান্না-ঘরের বেলটা বেজে উঠত, তখন মানদা চা নিয়ে ওপরে যেত।

—এ বাড়িতে রান্নাবান্না কে করে, তুমি না মানদা?

—আজ্ঞে আমিই।

—তারপর বল—

—সাতটা বেজে যেতেও যখন বেল বাজল না তখন মানদা চা নিয়ে ওপরে যায়, তারপর তো যা ঘটেছে আপনি সব শুনেছেন।

—হুঁ। তোমার মাইনে কত—কত পেতে এখানে?

—আজ্ঞে একশো টাকা, তাছাড়া দু-তিন মাস পর পর জামাকাপড় পেতাম, মাঝে-মধ্যে বকশিসও—

—দীপ্তেনবাবু যে এখানে যাতায়াত করতেন সে কথাটা তুমিই বোধ হয় সুরজিৎবাবুকে জানিয়েছিলে?

—ছিঃ বাবু, চুকলি কাটা আমার অভ্যাস নয়—এ ঐ মানদার কাজ। ঐ মানদাই বলেছে, বুঝলেন বাবু, নচেৎ সুরজিৎবাবু জানলেন কি করে, আর তাইতেই তো এই বিভ্রাট হল।

—তোমার ধারণা তাহলে দীপ্তেনবাবুর ব্যাপার নিয়েই—

—ঠিক জানি না বাবু, তবে আমার তো তাই মনে হয়।

—হুঁ। ঠিক আছে, যাও। মানদাকে এ ঘরে পাঠিয়ে দাও। আর শোন, এখন এ বাড়িতে পাহারা থাকবে, তুমি কিন্তু এ বাড়ি ছেড়ে যাবে না।

—আজ্ঞে আমি তো ভেবেছিলাম আজই দেশে চলে যাব।

—না, এখন তোমার যাওয়া হবে না। পালাবার চেষ্টা করলে কিন্তু বিপদে পড়বে—বুঝেছ? যাও, মানদাকে পাঠিয়ে দাও—

মানদা এলো।

আর একবার মানদার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলেন সুশীল চক্রবর্তী, তারপর জেরা শুরু করলেন।

—মানদা, কাল তোমার সুরজিৎবাবু কখন এখানে আসেন?

—তা ঠিক বলতে পারব না বাবু, ঘড়ি দেখিনি। তবে দীপ্তেনবাবু আসার ঘণ্টাখানেক পরেই বাবুর গাড়ি এসে থামে।

—দীপ্তেনবাবু তখন কোথায় ছিলেন?

—এই ঘরে।

—তাহলে তোমার বাবুর সঙ্গে দীপ্তেনবাবুর কাল রাত্রে দেখা হয়েছিল বল?

—তা বলতে পারব না বাবু।

—কেন, দীপ্তেনবাবু তো তখন এই ঘরেই ছিলেন বলছ!

—ছিলেন, তবে দেখা হয়েছিল কিনা জানি না। কারণ পরে বাবু চেঁচামিচি করে যখন বের হয়ে গেলেন তখন ঘরে ঢুকে আমি দীপ্তেনবাবুকে দেখতে পাইনি।

—এ বাড়ি থেকে বেরুবার আর কোন দ্বিতীয় রাস্তা আছে?

—না তো।

—বলছিলে বাবু চেঁচামেচি করছিলেন—কেন চেঁচামেচি করছিলেন তা জানো?

—বোধ হয় ঐ দীপ্তেনবাবুর ব্যাপার নিয়েই—

—দীপ্তেনবাবু যে তোমার বাবুর অনুপস্থিতিতে এই বাড়িতে আসতেন তোমার বাবু জানলেন কি করে—তুমি বলেছিলে?

—আজ্ঞে না। মা আমাকে মানা করে দিয়েছিলেন, আমি বলতে যাব কেন?

—মিথ্যে কথা। সত্যি বল, তুমিই—

—মা কালীর দিব্বি বাবু, আমি চুকলি কাটিনি।

—তুমি মাইনে কত পেতে?

—দেড়শো টাকা।

—বল কি! তা মাইনেটা কে দিত?

—মা-ই দিতেন।

—হুঁ। আচ্ছা তুমি যেতে পারো। আর একটা কথা শুনে রাখ, এ বাড়ি থেকে এখন তুমি বা রতন কেউ কোথাও বেরুবে না।

—বেশ, আপনি যা বলবেন তাই হবে।

—ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো।

মানদা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

মালঞ্চর মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন সুশীল চক্রবর্তী, ঐখান থেকেই ফোন করলেন।

মৃতদেহের ব্যবস্থা করে সুশীল চক্রবর্তী ঘরটা আর একবার ভালো করে পরীক্ষা করতে শুরু করলেন।

বেশ বড় সাইজের ঘর, মেঝেতে সুন্দর ডিজাইনের টালি পাতা। একধারে একটি খাটো মোটা ডানলোপিলোর গদির ওপর বিছানা পাতা। দামী একটা বেডকভার দিয়ে তখনো শয্যাটি ঢাকা, বোঝা যায় গতরাত্রে ঐ শয্যা কেউ ব্যবহার করেনি।

একধারে একটা স্টীলের আলমারি, তারই গা ঘেঁষে বিরাট একটা ড্রেসিং টেবিল তার সামনে বসবার একটা গদি-মোড়া কুশন। ড্রেসিং টেবিলের ওপর নানাবিধ দামী দামী প্রসাধন দ্রব্য সাজানো। সবই ফরেন গুডস্। প্রসাধন দ্রব্যগুলো দেখলে মনে হয় মালঞ্চ রীতিমত শৌখিন ছিল।

ঘরে অন্যদিকে একটা ওয়ারড্রোব, তার ওপরে সুন্দর সোনালী ফ্রেমে পাশাপাশি দুটো ফটোই বোধ হয় একসময় ছিল, এখন একটাই মাত্র দেখা যাচ্ছে—মালঞ্চর ফটো।

ফটো-ফ্রেমের সামনে একগোছা চাবিসমেত একটা রুপোর চাবির রিং, এবং তার পাশে রয়েছে একটা দামী লেডিজ রিস্টওয়াচ। ঘড়িটা তখনও চলছে।

ঘরের অন্য কোন সুদৃশ্য জয়পুরী ফ্লাওয়ার ভাসে একগোছা বাসী রজনীগন্ধার স্টিক। তার পাশে একটা মাঝারি সাইজের রেডিওগ্রাম।

ঘরটা দেখা শেষ করে সুশীল চক্রবর্তী ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের দরজা ঠেলে বাথরুমে প্রবেশ করলেন।

দীপ্তেন ভৌমিক কাল সন্ধ্যায় এখানে এসেছিল, কিন্তু তাকে রতন বা মানদা কেউই এই বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে দেখেনি। তবে কোথা দিয়ে লোকটা বের হয়ে গেল কাল রাত্রে? প্রশ্নটা সুশীল চক্রবর্তীর মাথার মধ্যে তখনো ঘোরাফেরা করছে।

ঘরের দরজায় ইয়েল-লক্ করা ছিল, সেই দরজা ভেঙে ওঁরা ঢুকেছেন মালঞ্চর শোবার ঘরে। বাথরুমে দেখা গেল আর একটা দরজা আছে কিন্তু সে দরজাটা বন্ধ। সুশীল চক্রবর্তী আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন এ বাড়িতে ঢোকার সময়—সদরের দরজাতেও ইয়েল-লক্ সিস্টেম।

বাথরুমের দরজা বন্ধ, ঘরের দরজাও বন্ধ ছিল—তবে কোথা দিয়ে কোন্ পথে দীপ্তেন ভৌমিক এ বাড়ি থেকে গত রাত্রে বের হয়ে গিয়েছিল? তবে কি সকলের অজ্ঞাতে এক সময় ঐ সদর দিয়েই বের হয়ে গিয়েছিল?

বাথরুমে দেখবার বিশেষ কিছু ছিল না, ঝক্‌ঝকে আয়না লাগানো, বেসিন, ব্র্যাকেটের সঙ্গে লিকুইড সোপ কেস লাগানো, গোটা দুই টুথব্রাশ, টুথ পেস্ট, একটা ট্যালকম পাউডারের কৌটো, সাবানের কেস, তাতে সাবান রয়েছে। দেওয়ালের র‍্যাকে ঝুলছে একটা টাওয়েল আর সিল্কের নাইটি।

বাথরুমের পিছনের দরজাটা খুলে ফেললেন সুশীল চক্রবর্তী। একটা ঘোরালো লোহার সিঁড়ি নীচের গলিপথে নেমে গিয়েছে। মেথরদের যাতায়াতের ব্যবস্থায় ঐ সিঁড়ি। দরজাটা বন্ধ করে সুশীল চক্রবর্তী আবার ঘরে ফিরে এলেন।

মর্গে বডি নিয়ে যাবার জন্য একটা কালো ভ্যান এসে গিয়েছে।

ডেড-বডি নিয়ে যাবার পর সুশীল চক্রবর্তী ঘরের মধ্যেকার আলমারিটা খুললেন—ঐ চাবির রিংয়ের একটা চাবির সাহায্যে।

হ্যাঙারে নানা রঙের সব দামী দামী শাড়ি ও ব্লাউজ সাজানো। চাবি দিয়ে আলমারির ড্রয়ার খুললেন—একটা চন্দন কাঠের বাক্স—বেশ ভারী—তালা লাগানো ছিল না বাক্সটায়, ডালা তুলতেই দেখা গেল অনেক সোনার গহনা—ডালা বন্ধ করে বাক্সটা আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন।

ড্রয়ারের মধ্যে একটা প্লাস্টিকের বাক্সের মধ্যে একগাদা একশো টাকার নোট বাণ্ডিল বাঁধা, কিছু দশ টাকা ও পাঁচ টাকার নোট, খুচরো পয়সা। আন্দাজে মনে হল একশো টাকার নোট প্রায় হাজার দুই টাকার হবে। আলমারিটা বন্ধ করে, ঘরে ইয়েল-লক্ টেনে দিয়ে চাবিটা সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে এলেন সুশীল চক্রবর্তী।

বাইরে মানদা দাঁড়িয়ে ছিল। মানদাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই চাবি কি তোমার মার কাছেই থাকত?

—আজ্ঞে একটা চাবি বাবুর কাছে আর অন্যটা মার কাছে থাকত, মানদা বলল।

—সদরের চাবি তো তাহলে তাঁর কাছেও একটা থাকত?

—হ্যাঁ।

অতঃপর বিক্রম সিংকে বাড়ির প্রহরায় রেখে বাইরে এসে জীপে উঠে বসলেন সুশীল চক্রবর্তী। আসবার সময় আর একবার উঁকি দিলেন নীচের তলায় সুশান্ত মল্লিকের ঘরে—সুশান্ত মল্লিক ঘুমোচ্ছে।

আকাশ কালো হয়ে উঠেছে তখন। গতরাত থেকেই মধ্যে মধ্যে মেঘ জমেছে আকাশে কিন্তু বৃষ্টি নামেনি। পথে যেতে যেতেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল।

সুরজিৎবাবুর বড় ছেলে যুধাজিৎ পরের দিন তার মার কাছ থেকেই সব ব্যাপারটা জেনেছিল। স্বামীর যে একটা রক্ষিতা আছে, আর তাকে বাড়ি গাড়ি করে দিয়েছেন সুরজিৎ তাঁর স্ত্রী স্বর্ণলতা জানতেন। প্রথম প্রথম স্বামীকে ফেরাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন স্বর্ণলতা, অনেক কান্নাকাটিও করেছিলেন, কিন্তু স্বামীকে ঐ ডাইনীর কবল থেকে উদ্ধার করতে পারেননি। অবশেষে চুপ করে গিয়েছিলেন।

ঐ দিন সুরজিৎবাবু ফিরতেই স্বর্ণলতা শুধালেন, কোথায় গিয়েছিলে এই সাত সকালে?

—কাজ ছিল?

—কি এমন কাজ যে ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটেছিলে গাড়ি নিয়ে?

—মালঞ্চকে কে যেন খুন করে গিয়েছে—

—সে কি! অস্ফুট একটা আর্তনাদ স্বর্ণলতার কণ্ঠ চিরে বের হয়ে এলো।

—হ্যাঁ। থানার লোক এসে দরজা ভেঙে তাকে মৃত অবস্থায় দেখেছে।

—তা কি ভাবে মারা গেল গো?

—গলায় রুমাল পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে।

—কি সর্বনাশ! কে—কে করল?

—তা আমি কি করে বলব?

—তুমি জানো না কিছু? প্রশ্নটা করে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন স্বর্ণলতা—সত্যি সত্যিই তুমি জানো না?

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে তাকালেন সুরজিৎ। কয়েকটা মুহূর্ত স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর শান্ত গলায় স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে সুরজিৎ বললেন, কি বলতে চাও তুমি?

—তুমি তো কাল রাত্রেও সেখানে গিয়েছিলে?
—তাই কি? স্পষ্ট করে বল, কি বলতে চাও তুমি?
—তুমি কিছুই জানো না?
—কি জানব?
—কে তাকে হত্যা করল?
—জানি না।
—জানো না! তাহলে কাল অত রাত করে বাড়ি ফিরেছিলে কেন?

॥ ছয় ॥

শনিবার সকালে হিন্দুস্থান রোডের বাড়ির দোতলার দরজা ভেঙে মালঞ্চর মৃতদেহ পুলিস আবিষ্কার করল এবং পরের শুক্রবার মানে ঠিক পাঁচদিন পরে যেন সমস্ত ব্যাপারটা নাটকীয় একটা মোড় নিল। সুরজিৎ ঘোষাল যা স্বপ্নেও ভাবেননি তাই হল। সংবাদপত্র ব্যাপারটা ফ্লাশ করল।

"বালিগঞ্জ হিন্দুস্থান রোডের এক দ্বিতল গৃহে, রুমালের সাহায্যে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে এক মহিলাকে। শোনা যাচ্ছে ঐ মহিলাটি কোন একটা নামকরা ফার্মের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের নাকি রক্ষিতা ছিল। সেই রক্ষিতাকে ভদ্রলোকটি ওই বাড়িটি কিনে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক নিয়মিত সন্ধ্যায় ঐ রক্ষিতার গৃহে যেতেন এবং রাত্রি এগারোটা সাড়ে এগারোটা অবধি থেকে আবার চলে আসতেন।

পুলিস বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছে যে যেদিন রাত্রে হত্যা সংঘটিত হয়, সেই দিন সন্ধ্যায়ও অর্থাৎ শুক্রবার সন্ধ্যাতেও ঐ ভদ্রলোক তার গৃহে গিয়েছিলেন। পুলিস জোর তদন্ত চালাচ্ছে। ঘরের মেঝেতে একটি বহুমূল্য মুক্তোর মালা ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। আরো সংবাদ যে, যে রুমালের সাহায্যে গলায় ফাঁস দিয়ে ওই স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করা হয়েছে সেই রুমালের এক কোণে নাকি লাল সুতোয় ইংরেজী আদ্যক্ষরে 'S' লেখা আছে। এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।"

আগের দিন সন্ধ্যার কিছু পরে, অর্থাৎ সোমবার সুশীল চক্রবর্তী এসেছিলেন পার্ক স্ট্রীটে সুরজিৎ ঘোষালের গৃহে।

সুরজিৎ ঘোষাল সবেমাত্র অফিস থেকে ফিরেছেন তখন। জামা কাপড়ও ছাড়েননি। ভৃত্য সনাতন এসে জানাল, বালিগঞ্জ থানার ও.-সি. সুশীলবাবু দেখা করতে এসেছেন।

সুশীল চক্রবর্তী। চমকে ওঠেন সুরজিৎ।

পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন স্ত্রী স্বর্ণলতা। তিনি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালেন, বালিগঞ্জ থানার ও. সি. আবার কেন এলো গো?

—কি করে জানব! দেখি—সুরজিৎ ঘোষাল উঠে পড়লেন।

নীচের পার্লারে সুশীল চক্রবর্তী অপেক্ষা করছিলেন। সুরজিৎ ঘোষাল নীচে এসে পার্লারে প্রবেশ করলেন।

—মিঃ ঘোষাল, এ সময় আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি সত্যই দুঃখিত।

—কি ব্যাপার মিঃ চক্রবর্তী?

—এই রুমালটা দেখুন তো—বলে কাগজে মোড়া একটা রুমাল পকেট থেকে বের করে সুরজিৎ ঘোষালের সামনে ধরলেন সুশীল চক্রবর্তী।

—রুমাল! কেমন যেন অসহায় ভাবে কাগজের মোড়কটার দিকে তাকালেন সুরজিৎ ঘোষাল!

—এই রুমালটার সাহায্যেই সেদিন মালঞ্চ মল্লিককে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল! দেখুন তো, এই রুমালটা চিনতে পারেন কি না—

সুরজিৎ ঘোষালের সমস্ত দেহটা কেমন যেন অবশ হয়ে গেল। মুখে একটিও কথা নেই। কেমন যেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তিনি রুমালটার দিকে। রুমালটার এক কোণে লাল সুতো দিয়েই ইংরেজী 'S' লেখা।

—চিনতে পারছেন, কার রুমাল এটা?

—রুমালটা মনে হচ্ছে আমারই—

—এই রুমালটা সম্পর্কে আপনার কিছু বলবার আছে?

সুরজিৎ ঘোষাল একেবারে যেন বোবা, পাথর।

—আচ্ছা, সে রাত্রে আপনি হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে ঠিক কতক্ষণ ছিলেন?

—আধঘণ্টা মত হবে।

—তারপর সেখান থেকে বের হয়ে আপনি কোথায় যান?

—কেন, আমি—আমি তো সোজা এখানেই, মানে বাড়িতেই চলে আসি—

—না, আপনি তা আসেন নি। রাত সাড়ে এগারোটার সময় আপনাকে বালিগঞ্জের হরাইজন ক্লাবে ড্রিংক করতে দেখা গিয়েছে।

—কে—কে বললে?

—আমরা সংবাদ পেয়েছি। আপনি যেখানে যেখানে যেতেন সব জায়গাতেই আমরা খোঁজ নিয়েছি—আপনি হরাইজন ক্লাবে প্রায়ই যেতেন, আপনি সেখানকার মেম্বার। সে রাতে আপনি পৌনে এগারোটা নাগাদ সেই ক্লাবে যান। সুতরাং রাত আটটা নাগাদ যদি আপনি হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে থাকেন তাহলে ঐ সময়টা—মানে রাত আটটা থেকে পৌনে এগারোটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?

—I was feeling very much disturbed—মনটার মধ্যে একটা অস্থিরতা, তাই আমি গাড়ি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

—আপনার ড্রাইভার সঙ্গে ছিল?

—না, হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে বরাবর আমি নিজেই ড্রাইভ করে যেতাম। কিন্তু মিঃ চক্রবর্তী, আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না—!

—নিহত মালঞ্চ মল্লিকের গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় এই রুমালটা পাওয়া গিয়েছে, আর আপনি স্বীকার করছেন এ রুমালটা আপনারই, আপনি সে রাত্রে সেখানে গিয়েছিলেন, মানে দুর্ঘটনার রাত্রে। তাছাড়া একমাত্র আপনার কাছেই মালঞ্চর ঘরের দরজার এবং বাড়ির সদর দরজার ডুপলিকেট চাবি থাকত। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আমি কি বলতে চাইছি।

—তাহলে আপনার কি ধারণা আমিই সে রাত্রে মালঞ্চকে হত্যা করেছি?

—সেটা এখনো প্রমাণ না হলেও ঐ হত্যার ব্যাপারে একজন suspect হিসাবে আপাতত আপনাকে আমি arrest করতে এসেছি। আমার সঙ্গে আপনাকে থানায় যেতে হবে।

—বেশ চলুন। লম্বা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে সুরজিৎ বললেন।

দশ মিনিট পর সুশীল চক্রবর্তী তাঁর জীপে সুরজিৎ ঘোষালকে তুলে নিয়ে লালবাজারের দিকে চলে গেলেন।

সুরজিৎ ঘোষালকে থানা অফিসার গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে এই সংবাদটা সনাতনই ওপরে এসে কাঁদতে কাঁদতে স্বর্ণলতাকে জানাল। স্বর্ণলতা সংবাদটা শুনে যেন পাথর হয়ে গেলেন। সুরজিতের বড় ছেলে যুধাজিৎ আরো আধঘণ্টা পরে এলো ইউনিভারসিটি থেকে। সনাতনই তাকে প্রথম সংবাদটা দিল। যুধাজিৎও সংবাদটা শুনে একেবারে স্তম্ভিত। সে তাড়াতাড়ি মার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

—এসব কি শুনছি মা?

সাশ্রুনয়নে স্বর্ণলতা নিঃশব্দে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন।

—বাবাকে arrest করে নিয়ে গিয়েছে। মা—মাগো, কথা বলছ না কেন?

স্বর্ণলতা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কেবল ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন। কেলেঙ্কারির কিছুই আর বাকী থাকবে না—কাল সকালেই সংবাদপত্রে নামধাম দিয়ে সব কথা হয়তো ছেপে দেবে। তারপর তিনি মুখ দেখাবেন কি করে?

—কেঁদো না মা, I don't believe, আমি বিশ্বাস করি না বাবা ঐ কাজ করতে পারেন। আমি এক্ষুনি আমাদের সলিসিটার মিঃ বোসের কাছে যাচ্ছি—বলে যুধাজিৎ দাঁড়াল না। বের হয়ে গেল গাড়ি নিয়ে।

সলিসিটার মিঃ নির্মল বসু সব কিছু শুনে বললেন, সর্বাগ্রে সুরজিতের জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে হত্যার সন্দেহে তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিস, হয়তো জামিন দিতে চাইবে না, ৩০২ ধারার কেস। তবু চলুন, একবার অ্যাডভোকেট মিঃ ভাদুড়ীর কাছে যাওয়া যাক।

সোমনাথ ভাদুড়ী ক্রিমিন্যাল সাইডের আজকের সব চাইতে নামকরা অ্যাডভোকেট। তিনি ব্যাপারটার আদ্যোপান্ত নীরবে শুনলেন যুধাজিতের কাছ থেকে, কেবল তাঁর হাতের মোটা লালনীল পেনসিলটা দু-আঙুলের মধ্যে ঘুরতে লাগল।

সব শুনে তিনি বললেন, ব্যাপারটা বেশ জটিল বলেই মনে হচ্ছে নির্মলবাবু, কালই আদালতে মিঃ ঘোষালকে যখন হাজির করা হবে, তখন আমরা জামিনের জন্য আর্জি ফাইল করব। তারপর দেখা যাক কি হয়। একটু থেমে সোমনাথ ভাদুড়ী আবার বললেন, যুধাজিৎবাবু, আইনের দিক থেকে অতঃপর যা কিছু করবার আমরা করব, করতেও হবে আমাদের, এবং আইন আদালতের ব্যাপার তো বুঝতেই পারছেন, কতটা মন্দাক্রান্তা গতিতে চলে। ইতিমধ্যে আমার পরামর্শ যদি চান তো একটা কথা বলি।

—বলুন। যুধাজিৎ বলল।

—এদিকে যা হবার হোক, আপনারা ইতিমধ্যে একজনের সাহায্য নিলে বোধ হয় ভাল করতেন।

—কার সাহায্য?

—কিরীটী রায়ের নাম শুনেছেন?

সঙ্গে সঙ্গে নির্মল বসু বললেন, নিশ্চয়, শুনেছি বৈকি।

—চলুন না, তাঁর কাছে একবার যাওয়া যাক। বিচার বিশ্লেষণের অদ্ভুত ক্ষমতা মশাই ভদ্রলোকটির। দুটো কেসের ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে আমি কাজ করে ওঁর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী মনের পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়েছি। তবে ভাবছি তিনি রাজী হবেন কি না—

—কেন, রাজী হবেন না কেন, যা ফিস্ লাগে—Whatever amount he wants, যুধাজিৎ বলল, I am ready to pay.

সোমনাথ ভাদুড়ী হাসলেন, টাকার অঙ্ক দিয়ে তাঁকে রাজী করাতে পারবেন না যুধাজিৎবাবু। টাকা তিনি অবিশ্যি নেন, কিন্তু আসলে গোয়েন্দাগিরি করা ওঁর একটা নেশা। এককালে রহস্য উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে নেশা ছিল ভদ্রলোকের কিন্তু ইদানীং আর তেমন যেন কোন উৎসাহ দেখি না। রহস্যের ব্যাপারে যেন মাথাই ঘামাতে চান না, তাছাড়া ভদ্রলোক প্রচণ্ড খেয়ালী।

—আপনি যদি একবার অনুরোধ করেন মিঃ ভাদুড়ী—যুধাজিৎ বলল।

সোমনাথ ভাদুড়ী প্রত্যুত্তরে যুধাজিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমিই যখন তাঁর নাম করেছি তখন আমি অবশ্যই বলব।

—তাহলে আর দেরি করে লাভ কি, চলুন না এখনই একবার তাঁর কাছে যাই—

—এখন না, কাল বিকেলের দিকে আসুন, যাওয়া যাবে। সকালটা আমায় জামিনের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতে হবে।

নির্মল বসু বললেন, মিঃ ভাদুড়ী, আমিও কি আসব?

—আসতে পারেন, তবে না এলেও চলে, আমিই যুধাজিৎবাবুকে নিয়ে যাব।

—তাহলে সেই কথাই রইল, আমি না এলে যুধাজিৎবাবুই আসবেন। আজ উঠি—

পরদিন আদালতে পুলিস সুরজিৎ ঘোষালকে হাজির করল।

কিন্তু সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা কি করে জানি সংবাদটা ঠিক পেয়ে গিয়েছিল, ঐদিনকার সংবাদপত্রে সুরজিৎ ঘোষালের গ্রেপ্তারের কাহিনী ছাপা হয়ে গিয়েছে দেখা গেল। সারা কলকাতা শহরে যেন একটা সাড়া পড়ে যায়। এত বড় একজন মানী লোক,—জনসাধারণের কৌতূহল যেন সীমা ছাড়িয়ে যায়।

আদালতে কিন্তু জামিন পাওয়া গেল না, সরকার পক্ষের কৌঁসুলি মিঃ চট্টরাজ তীব্র ভাষায় জামিন দেওয়ার ব্যাপারে বিরোধিতা করলেন।

সোমনাথ ভাদুড়ী যদিও বললেন, তাঁর ক্লায়েন্ট সমাজের একজন গণমান্য ও প্রতিষ্ঠিত লোক, তাঁকে জামিনে খালাস দেওয়া উচিত। কিন্তু তার উত্তরে চট্টরাজ বললেন, জামিন দিলে তদন্তের অসুবিধা হবে, চার্জ গঠন করা যাবে না।

জজসাহেব উভয়পক্ষের সওয়াল শুনে সুরজিৎকে আরো দশদিন হাজতে থাকবার

নির্দেশ দিলেন। আরো দশদিন পরে ধার্য হল শুনানির দিন, পুলিসের তদন্তের সাহায্য করবার জন্য।

বলাই বাহুল্য, পরের দিনের সংবাদপত্রে সমস্ত ব্যাপারটা বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়ে গেল। সুরজিৎ ঘোষালকে জামিন দেননি জজ, আরো তদন্ত সাপেক্ষে জেল হাজতে থাকবার হুকুম দেওয়া হয়েছে। দুশ্চিন্তার একটা কালো ছায়া গ্রাস করল সুরজিৎ ঘোষালের গৃহকে।

॥ সাত ॥

কিরীটী কিন্তু প্রথমটা রাজী হয়নি।

রাত আটটা নাগাদ সোমনাথ ভাদুড়ী তাঁর গড়িয়াহাটার বাড়িতে একাই এসেছিলেন কিরীটীর সঙ্গে দেখা করতে। কিরীটী বলেছিল, না ভাদুড়ীমশাই, ওসব ঘাঁটাঘাঁটি করতে এ বয়সে আর ভাল লাগে না, আপনারা বরং সুব্রতর কাছে যান। আমার মনে হয় সে কেসটা ঠিক ট্যাক্‌ল করতে পারবে।

—তা জানি, মৃদু হেসে সোমনাথ বললেন, তবু কিরীটীবাবু আপনি হলে—

—আমিও বিশ্বাস করি অ্যাড্‌ভোকেট সোমনাথ ভাদুড়ী যখন এ মামলা হাতে নিয়েছেন তখন কোন অবিচার হবে না, দোষী ঠিকই চিহ্নিত হবে।

হাসতে হাসতে সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন, কিন্তু আপনি ছাড়া মামলার সমস্ত সূত্র গুছিয়ে আমার হাতে তুলে দেবে কে—কারণ ব্যাপারটা সত্যিই আমার কাছে জটিল মনে হচ্ছে রায়মশাই। তাছাড়া সুরজিৎ ঘোষাল সমাজের একজন গণমান্য ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। অবিশ্যি রক্ষিতার ব্যাপারটা তাঁর জীবনে একটা কলঙ্ক। কিন্তু আজকের দিনে হাতে যাদের প্রয়োজনের বেশী পয়সা আছে, প্রায়ই তাদের মধ্যে ঐ ধরনের vice দেখা দেয়।

কিরীটী এবারে হেসে উঠল।

—হাসছেন রায়মশাই, আমার ঐসব সো-কলড্ হাই সোসাইটির কিছু কিছু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার কিছু কিছু ব্যাপার-স্যাপার জানবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যা-ই বলুন হয়েছে, এমন demoralised হয়ে গেছে সব—

—আস্তে ভাদুড়ী মশাই, আস্তে। কিরীটী পূর্ববৎ হাসতে হাসতেই বলল, আপনি যাঁদের কথা বলছেন তাঁরা ওই সব ব্যাপারকে কোন ব্যাধি, পাপ বা অন্যায় কিছু বলে মনে করেন না। তাছাড়া ওটা এ যুগের একটা কালচারের সামিল।

—কালচারই বটে। সে যাক, আপনাকে কিন্তু সুরজিৎ ঘোষালের কেসটা হাতে নিতে হবে।

—আপনার কাছ থেকে রেহাই পাবো না বুঝতে পেরেছি, বলুন সব ব্যাপারটা —আপনি যতদূর জানেন।

সোমনাথ ভাদুড়ী বলে গেলেন সব কথা। কিরীটী নিঃশব্দে শুনে গেল, কোন মন্তব্য করল না। সোমনাথ ভাদুড়ীর কথা শেষ হলে পাইপে টোবাকো ঠাসতে ঠাসতে কিরীটী বলল, তাহলে এখানেও সেই এক নারী ও তিনটি পুরুষের সংযোজন। ট্রায়াঙ্গুলার

ব্যাপার। মালঞ্চ দেবীর স্বামী সুশান্ত মল্লিক আর দুজন—সুরজিৎ ঘোষাল ও দীপ্তেন ভৌমিক। তিনজনই চাইত এক নারীকে। সুশান্ত মল্লিক মানে ঐ মালঞ্চর স্বামীটা তো একটা ফুল—নচেৎ স্ত্রীকে একজনের রক্ষিতা হিসাবে allow করে সেই রক্ষিতার আশ্রয়েই থাকতে পারে! তার পয়সায় নেশা করতে পারে! কে জানে, হয়তো সে সত্যি সত্যিই মালঞ্চকে ভালবাসত—

—ভালবাসত! না না, ও একটা অপদার্থ।

—তবু তাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেন না ভাদুড়ীমশাই, এবং বর্তমান মামলায় যে মোটিভ বা উদ্দেশ্য সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, সেটা ওর দিক থেকে বেশ strong থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। প্রত্যেক হত্যার ব্যাপারেই আপনি তো জানেন আমাদের সর্বাগ্রে তিনটি কথা চিন্তা করতে হয়। প্রথমত, হত্যার উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়ত, এক বা একাধিক ব্যক্তি সেই হত্যার আশেপাশে থাকলে হত্যা করার ব্যাপারে কার কতটুকু possibility বা সম্ভাবনা থাকতে পারে ও তৃতীয়ত, probability, ওদের মধ্যে কার পক্ষে হত্যা করার সবচাইতে বেশী সুযোগ ছিল।

—তাহলে তো রায়মশাই ওদের তিনজনই—

—সেইজন্যেই তো বলছিলাম ভাদুড়ীমশাই, যে বাড়িতে হত্যা সংঘটিত হয়েছে ওদের তিনজনের মধ্যে একজন সেখানে থাকত ও অন্য দুজনের সেখানে সর্বদা যাতায়াত ছিল। কাজেই ওদের তিনজনেরই মালঞ্চকে হত্যা করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল বলে ওদের যে কোন একজনের পক্ষে হত্যা করা সম্ভবও ছিল। আর এই মামলায় আপনার সর্বাপেক্ষা বড় সূত্র এইটিই হবে, তাই সর্বাগ্রে আপনাকে ঐ তিনটি মহাপুরুষের সমস্ত সংবাদ in details সংগ্রহ করতে হবে।

—আর কিছু?

—একটা কথা ভুলে যাবেন না ভাদুড়ীমশাই, দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে প্রথমে দীপ্তেন ভৌমিক ও তার পরে সুরজিৎ ঘোষাল মালঞ্চর কাছে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, আপাতত যা আমরা জেনেছি সুশান্ত মল্লিক সে রাত্রে ঐ বাড়িতে যে উপস্থিত ছিল না সেটা তার সম্পূর্ণ একটা মিথ্যে বয়ান যেমন হতে পারে তেমনি সেটা তার পক্ষে একটা alibiও হতে পারে।

কিরীটী বলতে লাগল, সুতরাং সন্দেহের তালিকা বা সম্ভাব্য হত্যাকারীর তালিকা থেকে ঐ তিন মহাত্মার একজনকেও আপনি বাদ দিতে পারছেন না আপাতত। All spotted, ওদের প্রত্যেকেরই মালঞ্চকে হত্যা করবার ইচ্ছা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, যদিও অবিশ্যি তার কারণটা একজন থেকে অন্যের পৃথক হতে পারে। তাহলেও একটা কথা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, যা কিছু ঘটেছে তা ঐ একটি নারীকেই কেন্দ্র করে। কি জানেন ভাদুড়ীমশাই, তাস খেলতে বসে রংয়ের টেক্কা কে হাতছাড়া করতে চায় বলুন। না, ভাদুড়ীমশাই, আমার তো মনে হচ্ছে আপনি যতটা ভাবছেন ব্যাপারটা হয়তো ততটা জটিল মানে complicated নয়।

—নয় বলছেন?

—হ্যাঁ। কারণ এ মামলায় মোটিভটা যেদিক থেকেই বিচার করুন না কেন, তিনজনের

যে কোন একজনের অ্যাঙ্গেল থেকেই, দেখবেন শেষটায় হয়তো এটাই প্রমাণিত হবে, পাল্লার কাঁটাটা একদিকেই ঝুঁকছে—towards that woman, আসলে কি জানেন ভাদুড়ী মশাই, সুরজিৎ ঘোষালের মত একজন মানী গুণী সমাজে প্রতিষ্ঠাবান পয়সাওয়ালা ব্যক্তি যদি এই হত্যার সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে জড়িত হয়ে না পড়তেন এবং তার সঙ্গে একটা কলঙ্কের ব্যাপার না থাকত তাহলে ব্যাপারটা নিয়ে যেমন এত হৈচৈ হত না, তেমনি সরকারও এত তেল পোড়াত না।

—কি বলছেন আপনি রায়মশাই?

—আমি মিথ্যা বলিনি ভাদুড়ীমশাই, একটু ভেবে দেখলেই আপনিও বুঝতে পারবেন—সমাজে কি আর কারও রক্ষিতা নেই—নাকি কারও রক্ষিতাকে হত্যা করা হয়নি ইতিপূর্বে? ব্যাপারটা সুরজিৎ ঘোষালের মত এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বলেই মনে হচ্ছে ব্যাপারটার মধ্যে না জানি কত রহস্যই আছে। অবিশ্যি এও আমি বলব, হত্যা হত্যাই, it's a crime and crime must be punished.

—রায়মশাই, যতটুকু শুনলেন তাতে করে সুরজিৎ ঘোষালকে আপনার—

—দোষী না নির্দোষী কি মনে হয়, তাই না আপনার প্রশ্ন ভাদুড়ীমশাই—সেটা তো এই মুহূর্তে কারও পক্ষেই বলা সম্ভব নয়, কারণ আমরা আপাতত যে মোটিভ ভাবছি হত্যার হয়তো সে মোটিভ আদৌ ছিল না। আর সেটার যদি কোন হদিস পাই তাহলে হয়তো দেখব তিনজনের মধ্যে দুজন সহজেই eliminated হয়ে গিয়েছে, আর সেরকম হলে হয়তো হত্যার ব্যাপারটাই একটা সম্পূর্ণ অন্য রূপ নেবে, কাজেই সবটাই এখন তদন্ত সাপেক্ষ।

—তা ঠিক, তবে আপনাকে ঐ কথাটা জিজ্ঞাসা করার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল—

—আপনি black sheep-কে ব্যাক করছেন কিনা, তাই না ভাদুড়ীমশাই?

—তাই—

কিরীটী বললে, সে আরো পরের কথা, আপনি ডিফেন্স কৌঁসুলী, এগিয়ে যেতে হবে, আপনি দিন কতক বাদে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। অবিশ্যি তেমন কিছু জানতে পারলে আমিও আপনার কাছে যেতে পারি।

—তাহলে আজ আমি উঠি—

—আসুন, আর যুধাজিৎবাবুকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

—ঠিক আছে।

কিছুদিন যাবৎ কিরীটীর মধ্যে যে নিষ্ক্রিয়তা চলছিল, সোমনাথ ভাদুড়ী চলে যাবার পর মালঞ্চর হত্যার ব্যাপারটা চিন্তা চিন্তা করতে করতে সেটা যেন তার অজ্ঞাতেই আপনা থেকে সক্রিয়তার দিকে মোড় নেয়। এবং প্রথমেই যেটা তার মনে হয়, আঞ্চলিক থানার ও. সি. সুশীল চক্রবর্তীর সাহায্যই তার সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

সুশীল চক্রবর্তী কিরীটীর একেবারে অপরিচিত নয়, তাছাড়া কিরীটী জানে তার মাথার মধ্যে কিছু বস্তু আছে, তার মস্তিষ্কের গ্রে সেলগুলো সাধারণের চাইতে একটু বেশীই সক্রিয়, তার প্রমাণও কিছুদিন আগে একটা হত্যা মামলার ব্যাপারে পেয়েছিল কিরীটী।

কিরীটী আর দেরী করে না, জংলীকে ডেকে হীরা সিংকে গাড়ি বের করতে বলে দিল।

গায়ে জামা চড়াচ্ছে কিরীটী, কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢুকল।—বেরুচ্ছ নাকি কোথাও?

রাত্রি তখন প্রায় দশটা। কিরীটী বললে, হ্যাঁ, একবার থানায় যাচ্ছি, সুশীল চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

—মালঞ্চর হত্যা মামলাটা তাহলে তুমি accept করলে?

—কি করি, ভাদুড়ীমশাইকে না করতে পারলাম না।

—তা কাল সকালে গেলেই তো হয়।

—তা হয়, তবে এখন হয়তো তাকে একটু ফ্রি পাবো।

আসলে কিন্তু কৃষ্ণা খুশিই হয়েছে। ইদানীং তার স্বামীর ঐ ধরনের নিষ্ক্রিয়তা কৃষ্ণার আদৌ যেন ভাল লাগছিল না। মানুষটার হাতে যখনই কোন কাজ থাকে না তখনই তার মুখে এক বুলি—কিরীটী রায় বুড়ো হয়ে গিয়েছে।

কৃষ্ণা প্রতিবাদ জানায়, চুল পাকলেই মানুষ কিন্তু বুড়িয়ে যায় না।

কিরীটী হাসতে হাসতে বলে, বয়স হলে বুড়িয়েই যায়।

—কত বয়েস হয়েছে তোমার?

—হিসাব করে দেখ সজনী, চৌষট্টি—সিক্সটি ফোর।

—তাহলে আমিও তো বুড়ি হয়ে গিয়েছি, আমারও তো বয়েস—

কিরীটী বলে উঠেছে, না, তোমার বয়স আমার চোখে বাড়েনি—

—আমার চোখেও তুমি বুড়ো হয়ে যাওনি, বুঝেছ—

কৃষ্ণা বললে, বেশী রাত কোরো না কিন্তু।

—না, তাড়াতাড়ি ফিরব।

॥ আট ॥

সুশীল চক্রবর্তী থানাতেই ছিলেন।

কয়দিন ধরে তিনি মালঞ্চর হত্যা ব্যাপারটা নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত, এখানে ওখানে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে তাঁকে। অফিস ঘরে বসে কতকগুলো কাগজপত্র দেখছিলেন সুশীল চক্রবর্তী। কিরীটীকে ঘরে ঢুকতে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে তিনি বললেন, একেই বলে বোধ হয় মনের টান দাদা, আসুন, আসুন।

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, তাই নাকি?

—হ্যাঁ, আজ দুদিন থেকে আপনার কথাই ভাবছিলাম দাদা।

—তাই বোধ হয় আমারও তোমার কথা মনে পড়ল। তা ব্যাপার কি বল তো, হিন্দুস্থান রোডের মার্ডার কেসটা না কি?

—হ্যাঁ দাদা—

—আমিও কিন্তু এসেছিলাম সেই ব্যাপারেই সুশীল।

—সত্যি! বসুন দাদা। তা আমাদের বড়কর্তাদের পক্ষ থেকে, না সুরজিৎ ঘোষালের পক্ষ থেকে?

—আপাতত বলতে পারো আমার নিজের পক্ষ থেকেই। এখনো কেসটা আমি কারো

পক্ষ থেকেই নিইনি ভায়া।

—কেসটা কিন্তু বেশ জটিলই মনে হচ্ছে দাদা—সুশীল চক্রবর্তী বললেন।

—সত্যিই জটিল কিনা সেটা জানবার জন্যই তো তোমার কাছে এসেছি ভায়া, তোমার দৃষ্টিকোণ থেকে যা তোমার মনে হয়েছে বা হচ্ছে সেটা আমায় বল তো।

সুশীল চক্রবর্তী কিরীটীর অনুরোধে সেই প্রথম দিন থেকে মালঞ্চর হত্যার ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গিয়ে যা যা জেনেছেন একে একে সব বলে গেলেন এবং বলা শেষ করে বললেন, কি রকম মনে হচ্ছে দাদা ব্যাপারটা, সত্যিই কি বেশ একটু জটিলই নয়?

—খুব একটা জটিল বলে কিন্তু মনে হচ্ছে না, ভায়া। কিরীটী বলল, আমি বুঝতে পারছি মালঞ্চ হত্যার বীজটা কোথায় ছিল—

—বুঝতে পারছেন?

—হ্যাঁ, তুমিও একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে। একটি নারীকে ঘিরে—যে নারীর মধ্যে মনে হয় তীব্র যৌন আকর্ষণ ছিল—এক ধরনের নারী, যারা সহজেই পুরুষের মনকে রিরংসায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে, সেইটাই এই হত্যার বীজ হয়ে ক্রমশ ডালপালা বিস্তার করেছিল বলেই আমার অনুমান।

—একটা বুঝিয়ে বলুন দাদা—সুশীল চক্রবর্তী বললেন।

—তিনটি পুরুষ এক্ষেত্রে—সুরজিৎ ঘোষাল ও দীপ্তেন ভৌমিক দুজনে বাইরের পুরুষ আর তৃতীয়জন মালঞ্চর হতভাগ্য স্বামী সুশান্ত মল্লিক ঘরের জন। মালঞ্চর যৌন আকর্ষণে ঐ তিনজন মালঞ্চকে ঘিরে ছিল।

—কিন্তু সুশান্ত মল্লিক তো তার স্ত্রীকে—

—ভুলে যেও না, স্ত্রী ভ্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও সুশান্ত তার আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারেনি আর পারেনি বলেই তার স্ত্রী অন্যের রক্ষিতা জেনেও সেই স্ত্রীর সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যেতে পারেনি, হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতেই পড়ে ছিল। তার স্ত্রী অন্যের রক্ষিতা জেনেও তারই হাত থেকে প্রত্যহ মদের পয়সা ভিক্ষা করে নিয়েছে।

তারপর—একটু থেমে কিরীটী বলতে লাগল, তার স্ত্রী তার কাছে অপ্রাপণীয়া জেনেও তার মনের রিরংসা তাকে সর্বক্ষণ পীড়ন করেছে। তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। এমনও তো হতে পারে ভায়া, সেই অবদমিত রিরংসা থেকেই কোন এক সময়ে একটা স্ফুলিঙ্গ তার মনের মধ্যে আকস্মিক আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল এবং যার ফলে শেষ পর্যন্ত ঐ হত্যাকাণ্ডটা ঘটে গিয়েছে।

—কিন্তু যতদূর জানা গিয়েছে ঐ ব্যাপারের তিন দিন আগে থাকতেই সুশান্তবাবু ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল—সুশীল চক্রবর্তী বললেন।

—হ্যাঁ গিয়েছিল, কিন্তু হত্যার পরের দিনই তার প্রত্যাবর্তন। চলেই যদি গিয়েছিল তো আবার ফিরে এলো কেন? এবং ফিরে এলো যে রাত্রে হত্যাটা সংঘটিত হয় তারই পরদিন প্রত্যুষে। এর মধ্যে দুটো কারণ কি থাকতে পারে না?

—দুটো কারণ?

—হ্যাঁ, প্রথমত, যারা কোন বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যে কাউকে হত্যা করে তাদের মধ্যে একটা সাইকোলজি থাকে, হত্যার আনন্দকে চরম আনন্দে তুলে দেবার জন্যে

আবার তারা অকুস্থলে ফিরে আসে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সকলের মধ্যে উপস্থিত থেকে সেই চরম আনন্দকে রসিয়ে রসিয়ে উপলব্ধি করবার জন্যে। এবং দ্বিতীয়ত, সুশান্ত মল্লিক হয়তো অকুস্থল থেকে ঘটনার সময় দূরে থেকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে তার নির্দোষিতাটুকুই, an alibi.

সুশীল চক্রবর্তী বললেন, আমি দাদা অতটা—

—তলিয়ে দেখনি, তাই না ভায়া, কিন্তু কথাটা ভাবা উচিত ছিল না কি তোমার?

—ভাবছি আপনি বুঝলেন কি করে যে সুশান্ত মল্লিককে আমি সত্যি কিছুটা eliminate করেছিলাম—

—সে তো তোমার কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম। তুমি যত গুরুত্ব দিয়েছ ঐ দুজনের ওপরেই—সুরজিৎ ঘোষাল আর দীপ্তেন ভৌমিক। কিন্তু খুনের মামলার তদন্তে অমন বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপারটা তোমার অবহেলা করা উচিত হয়নি।

—কোন্ ব্যাপারটার কথা বলছেন?

—ঐ যে তোমার ঐ সুশান্ত মল্লিকের হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে অকুস্থলে আবির্ভাব ও তার সেই কথাগুলো—'দরজা আর খুলবে না', রতন আর মানদা যখন কিছুতেই দরজা খোলাতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। কথাটা সে বলল কেন? এমনি একটা কথার কথা, না কি জেনেশুনেই সে মালঞ্চর মৃত্যুর ব্যাপারটা ঘোষণা করেছিল? যাকগে, rather late than never—তুমি দীপ্তেন ভৌমিকের সঙ্গে কথা বলেছ?

—বলেছি, গত পরশুই তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সে তো কাছাকাছিই লেক রোডে থাকে, কিন্তু দেখা পাইনি। অফিসের কাজে নাকি তিনি আগের দিন পাটনায় গিয়েছেন আর আজকালের মধ্যেই তাঁর ফেরার কথা। বলে এসেছি এলেই থানায় রিপোর্ট করতে—

ঐ সময়ে থানার সামনে একটা গাড়ি এসে থামার শব্দ পাওয়া গেল এবং একটু পরেই একজন সুশ্রী ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন।

—কি চাই? সুশীল চক্রবর্তীই প্রশ্ন করলেন।

—এখানকার ও. সি.-কে।

—আমিই—বলুন কি দরকার?

—আমার নাম দীপ্তেন ভৌমিক।

নাম কানে যেতেই কিরীটী দীপ্তেন ভৌমিকের দিকে তাকিয়ে দেখল। বেশ বলিষ্ঠ লম্বা চওড়া চেহারা, সুশ্রীও।

—বসুন মিঃ ভৌমিক—সুশীল চক্রবর্তী বললেন।

—আমার খোঁজে আপনি আমার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। দীপ্তেন বললেন।

—হ্যাঁ, আপনি জানেন নিশ্চয়ই, মালঞ্চদেবী খুন হয়েছেন—

—জানি। যেদিন আমি পাটনায় যাই, সেদিন পাটনাতেই সংবাদপত্রে newsটা পড়েছিলাম।

—আপনার সঙ্গে মালঞ্চদেবীর ঘনিষ্ঠতা ছিল?

—তা কিছুটা ছিল।

—যে রাত্রে মালঞ্চদেবী নিহত হন সেদিন সন্ধ্যারাত্রে আপনি ঐ মালঞ্চদেবীর হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে গিয়েছিলেন?

—গিয়েছিলাম।

—সেখান থেকে কখন চলে এসেছিলেন?

—আধঘণ্টাটাক পরেই, কারণ আমার ট্রেন ছিল রাত ন'টা চল্লিশে—

কিরীটী ঐ সময় বললে, কিন্তু মিস্টার ভৌমিক, আপনাকে ঐ বাড়ি থেকে বের হয়ে আসতে রতন বা মানদা কেউ দেখেনি—

—না দেখে থাকতে পারে।

আবার কিরীটীর প্রশ্ন ঃ সদর দিয়েই বের হয়ে এসেছিলেন বোধ হয়?

—তা ছাড়া আর কোথা দিয়ে আসব। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো? আপনাদের কি ধারণা ঐ জঘন্য ব্যাপারের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ আছে?

—মনে হওয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক মিঃ ভৌমিক? সুশীল চক্রবর্তী বললেন।

—How fantastic—তা হঠাৎ ঐ ধরনের একটা absurd কথা আপনাদের মনে হল কেন বলুন তো অফিসার?

কিরীটী বললে, যে স্ত্রীলোক একই সঙ্গে দুজন পুরুষের সঙ্গে প্রেমের লীলাখেলা চালাতে পারে এবং সেখানে যাদের যাতায়াত, তাদের প্রতি ঐ ধরনের সন্দেহ জাগেই যদি—

কিরীটীকে বাধা দিয়ে দীপ্তেন ভৌমিক বললেন, থামুন। একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, সে রাত্রে আমি ন'টা চল্লিশের ট্রেনে কলকাতা ছেড়ে যাই। আমি কি চলন্ত ট্রেন থেকে উড়ে এসে তাকে হত্যা করে হাওয়ায় উড়তে উড়তে আবার চলন্ত ট্রেনে ফিরে গিয়েছি? সত্যি মশাই, আপনাদের পুলিসের উর্বর মস্তিষ্কে সবই বোধ হয় সম্ভব। ঐ সব আবোল-তাবোল কতগুলো প্রশ্ন করার জন্যেই কি আমার বাড়িতে গিয়েছিলেন?

—Listen দীপ্তেনবাবু, যতক্ষণ না আপনি প্রমাণ করতে পারছেন, কিরীটী বললে, সে সত্যিই সে রাত্রে আপনি হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি থেকে আধঘণ্টার মধ্যে বের হয়ে এসেছিলেন, পুলিসের সন্দেহটা ততক্ষণ আপনার ওপর থেকে যাবে না।

—আমি একজন ভদ্রলোক, আমি বলছি, সেটাই কি যথেষ্ট নয় মশাই?

—না মিঃ ভৌমিক, যথেষ্ট নয়। যথেষ্ট হত যদি ঐ রাত্রেই আপনার বিশেষ ভাবে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ একজন ঐ ভাবে না নিহত হত।

—মালঞ্চর সঙ্গে আলাপ ছিল ঠিকই কিন্তু সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—আচ্ছা দীপ্তেনবাবু, কিরীটীর প্রশ্ন, আপনি জানতেন নিশ্চয়ই, যে মালঞ্চদেবী, অনেকদিন ধরে সুরজিৎ ঘোষালের রক্ষিতা হিসাবে ছিল—

—জানব না কেন? জানতাম।

—সে ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে মালঞ্চর ঘনিষ্ঠতাটা সুরজিৎ ঘোষাল যে ভাল চোখে দেখতে পারেন না সেটা তো স্বাভাবিক—

—আমি অতশত ভাবিনি মশাই, তাছাড়া ভাববার প্রয়োজনও বোধ করিনি।

—ভাবাটা বোধ হয় উচিত ছিল, যাক সে কথা। আপনি ভাল করে ভেবে বলুন, কখন কোন্ পথ দিয়ে সে রাতে আপনি সেই বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিলেন এবং কিসে করে ফিরেছিলেন?

—আমি ফিরেছিলাম ট্যাক্সিতে—

—কেন, আপনার তো গাড়ি আছে—

—গাড়ি আমি আগের দিন গ্যারাজে দিয়েছিলাম repair-এর জন্যে, আর আগেই বলেছি, আমি সদর দিয়েই বের হয়ে এসেছিলাম।

—দীপ্তেনবাবু, আপনি কি মালঞ্চদেবীকে একটা মুক্তোর হার দিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কত দাম সেটার? কিরীটী জেরা করতে থাকে।

—হাজার তিনেক—

—ঐ রকম দামী জিনিস আরো দিয়েছেন কি তাঁকে?

—দিয়েছি অনেক কিছু, কিন্তু অত দামী জিনিস আগে দিইনি।

—তা হঠাৎ অত দামী হার, অন্য একজনের রক্ষিতাকে দিতে গেলেন কেন?

—খুশি হয়েছিল দিয়েছি। আর কিছু আপনাদের জিজ্ঞাস্য আছে?

—আচ্ছা, আপনার নাম তো দীপ্তেন ভৌমিক, আর কোন নাম নেই আপনার?

—মানে?

—মানে অনেকের দুটো নাম থাকে, যেমন ডাকনাম, পোশাকী নাম, আলাদা আলাদা—

—আছে। আমার ডাকনাম সুনু, মা বাবা আমাকে সুনু বলে ডাকতেন, আর দাদাকে মনু বলে ডাকতেন।

—আপনার দাদা বেঁচে আছেন?

—হ্যাঁ, ইংলন্ডে সেটেল্‌ড—

—আপনি নিশ্চয়ই রুমাল ব্যবহার করেন?

—নিশ্চয় করি। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে আপনাদের? একটু যেন বিরক্তির সঙ্গেই কথাটা উচ্চারণ করলেন দীপ্তেন ভৌমিক।

—না, আপনি আপাতত যেতে পারেন মিঃ ভৌমিক। সুশীল চক্রবর্তী কিরীটীর চোখের ইশারা পেয়ে ভৌমিককে বললেন।

—ধন্যবাদ। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন দীপ্তেন, তারপর ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন একটু যেন দ্রুত পদেই।

ভদ্রলোক থানা থেকে বের হয়ে যেতে সুশীল চক্রবর্তী বললেন, আমি দীপ্তেন ভৌমিকের ওপর constant watch রাখব ভাবছি দাদা—

—ওয়াচ রাখতে হলে শুধু দীপ্তেন ভৌমিক কেন, সে তালিকা থেকে সুশান্ত মল্লিকও বাদ যাবেন না। কিন্তু আমি কি বলছি জানো ভায়া—আজকের সমাজের মানুষ এ কি এক সর্বনাশা পথে ছুটে চলেছে। না আছে কোন সংযম—কোন যুক্তি—কেবল to achieve, এবং মজা হচ্ছে, কি তারা চায়, কি পেলে তারা সুখী-সন্তুষ্ট, সেটা ওদের নিজেদের কাছেও

BanglaBook.net

স্পষ্ট নয়। ঐ মালঞ্চ দেবীর কথাই ভাবো না, সুরজিৎ ঘোষালকে নিয়ে সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি, দীপ্তেন ভৌমিককেও টেনেছিল—যাকগে, আজ উঠি। হ্যাঁ, ভাল কথা, কাল একবার তোমাদের অকুস্থলটা ঘুরে এলে মন্দ হত না।

—বেশ তো, কখন যাবেন বলুন, আমি আপনাকে তুলে নেব'খন। বাড়িটা তো এখন পুলিস পাহারাতেই আছে।

—রতন আর মানদা?

—তারাও আছে।

—আর কেউ নেই?

—আছে বৈকি, মালঞ্চর স্বামী সুশান্ত মল্লিকও তো ঐ বাড়িতেই আছে এখনো।

—কিন্তু বাড়িটা এখন কার সম্পত্তি হবে? মালঞ্চর কোন ওয়ারশিন নেই?

—জানি না। এখনো তো দাবীদার আসেনি।

—হুঁ। কাল সকালে তুমি ন'টা নাগাদ আসতে পারবে?

—পারব না কেন, যাব।

—তাহলে ঐ কথাই রইল, আমি চলি।

কিরীটী থানা থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী চলন্ত গাড়িতে বসে বসে ভাবছিল—মালঞ্চর মৃত্যুটা কি তিনটি পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর ঈর্ষা থেকেই ঘটেছে, না আরো কিছু ছিল?

সুরজিৎ ঘোষালের মত লোক ঈর্ষাপ্রণোদিত হয়ে তার রক্ষিতাকে খুন করতে পারে কথাটা যেন ভাবা যায় না, অথচ তারই রুমাল মৃতের গলায় পেঁচিয়ে গিঁট বাঁধা ছিল, এবং সে মালঞ্চকে শাসিয়েছিল, হত্যার হুমকিও দেখিয়েছিল। সুরজিৎ ঘোষালকে গ্রেপ্তার করার পিছনে পুলিসের ঐটাই জোরালো যুক্তি, সুরজিৎ ঘোষালের কথাগুলো সুশীল চক্রবর্তী মানদাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই জেনেছেন।

কিন্তু মানদা আরো বেশী কিছু জানে, কারণ সে ছিল মালঞ্চর পেয়ারের দাসী। অনেক মাইনে পেত সে। মানদা যদিও দীপ্তেন ভৌমিকের কথাটা স্বীকার করেনি তবু সে-ই তার মনিবের কর্ণগোচর করেছে বলে কিরীটীর ধারণা, সেটা মানদারই কাজ। মানদা গাছেরও খেতো তলারও কুড়াতো।

কিরীটীর আরো মনে হয় দীপ্তেন ভৌমিক সত্যি কথা বলেননি। কিরীটী জানত না যে দু'দিন পরেই সে দীপ্তেন ভৌমিক সম্পর্কে এক চমকপ্রদ সংবাদ শুনবে সুশীল চক্রবর্তীর কাছ থেকে, এবং সে সংবাদ পাওয়ার পর মালঞ্চর হত্যা ব্যাপারটা সত্যিই জটিল হয়ে উঠবে।

॥ নয় ॥

পরের দিন সোয়া ন'টা নাগাদ সুশীল চক্রবর্তী এসে হাজির হলেন কিরীটীর বাড়িতে।

কিরীটী প্রস্তুত হয়েই ছিল, সুশীল চক্রবর্তীর জীপে উঠে বসল।

হিন্দুস্থান রোডের বাড়ির দরজায় দুজন সেপাই পাহারায় ছিল এবং একজন অন্দরে ছিল। জীপ থেকে সুশীল চক্রবর্তীকে নামতে দেখে তারা সেলাম জানাল। কিরীটীকে নিয়ে সুশীল চক্রবর্তী বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন।

প্রথমেই ওরা সুশান্ত মল্লিক যে ঘরটায় থাকে সেই নীচের ঘরটায় উঁকি দিলেন। সুশান্ত মল্লিককে ঘরের মধ্যে দেখা গেল না। ইতিমধ্যে জীপের শব্দে রতন ওপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসেছিল। সুশীল চক্রবর্তী রতনকেই প্রশ্ন করলেন, সুশান্তবাবুকে দেখছি না, কোথায় তিনি?

—আজ্ঞে সকালে যখন চা দিই তখন তো ছিলেন। তবে গতকাল তিনি বলেছিলেন এ বাড়িতে তিনি আর থাকবেন না, চলে যাবেন।

—কেন, তাঁর কোন অসুবিধা হচ্ছে নাকি?

—না বাবু অসুবিধা হবে কেন। মানদার হাতেই তো সংসার খরচের টাকা থাকত, এখন যা আছে এ মাসটা চলে যাবে। তবে ওনার তো আবার বোতলের ব্যাপার আছে সন্ধ্যেবেলা—মানদা তো সে সব কিছু দিচ্ছে না। বোধ হয় সেইজন্যেই—

সুশীল চক্রবর্তী হাসলেন। ঠিক সেই সময় দেখা গেল সুশান্ত মল্লিক দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। সুশীল চক্রবর্তীকে দেখে সুশান্ত বললে, এই যে দারোগাবাবু, আপনি আমার ওপরে কেন জুলুম করছেন বলুন তো?

—জুলুম?

—নয়? বাড়ি থেকে বেরুতে পারব না, এটা জুলুম ছাড়া আর কি বলুন তো?

কিরীটী চেয়ে চেয়ে দেখছিল লোকটাকে। মুখে বেশ দাড়ি গজিয়েছে খোঁচা খোঁচা। বোধ হয় কয়েকদিন কোন ক্ষৌরকর্ম না করায়। পরনের জামা ও পায়জামাটা ময়লা। একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মনে হয় অনেকদিন চিরুনির স্পর্শও পড়েনি।

কিরীটী চুপিচুপি সুশীল চক্রবর্তীকে বললে, এই বোধ হল মালঞ্চর স্বামী?

—হাঁ দাদা।

—লোকটাকে ছেড়ে দাও। তবে নজর রেখো—

—কিন্তু দাদা, যদি ভাগে, আমি তো ভেবেছিলাম **এবারে ওকে অ্যারেস্ট করব।** নিম্নকণ্ঠে কথাগুলো বললেন সুশীল।

—সুশান্তবাবু—

কিরীটীর ডাকে সুশান্ত মল্লিক তাকাল ভ্রূকুটি করে।

—আপনাকে আমরা ছেড়ে দেবার কথা ভাবতে পারি, যদি ঠিক ঠিক আপনার কাছ থেকে যেগুলো জানবার জন্যে এসেছি সেগুলোর জবাব দেন।

—মানে আপনি সেদিন সে সব কথা বলেছেন, সব আমরা একেবারে পুরোপুরি সত্য

বলে মেনে নিতে পারছি না। কিরীটীই জবাব দিল।

—আমি কিছু জানি না—বলতে বলতে কিছুক্ষণ কিরীটীর দিকে তাকিয়ে থেকে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল সুশান্ত মল্লিক।

সুশীল চক্রবর্তী ঐ ঘরের দিকেই এগুচ্ছিলেন কিন্তু বাধা দিল কিরীটী। বললে, আগে চল সুশীল, বাড়িটা একবার ঘুরে দেখি, আর সেই ঘরটা—

সুশীল চক্রবর্তী সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন, কিরীটী সুশীল চক্রবর্তীর পিছনে এগোলেন। হঠাৎ কিরীটীর নজর পড়ল নীচের একটা তালাবন্ধ ঘরের বন্ধ জানলার দিকে—কবাট দুটো ঈষৎ ফাঁক, আর সেই সামান্য ফাঁকের মধ্যে দিয়ে উঁকি মারছে চোখ। সেই চোখের দৃষ্টিতে যেন তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি। কিরীটী থমকে দাঁড়াল।

কিরীটীকে থামতে দেখে সুশীল বললেন, কি হল দাদা, ওপরে চলুন—

—সুশীল, চল তো নীচের ঐ ঘরটা আগে দেখি। বলে বন্ধ দরজার ঘরটা কিরীটী দেখিয়ে দিল।

—ঐ তালাবন্ধ ঘরটা?

—হ্যাঁ। চাবি নেই তোমার কাছে?

—না তো।

—তাহলে ঐ ঘরের তালার চাবি কোথায় পাওয়া যাবে?

ওদের কাছেই অল্প দূরে রতন দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে তাকিয়ে সুশীল চক্রবর্তী শুধালেন, ঐ ঘরের তালার চাবি কোথায়?

—তা তো জানি না হুজুর—

—ঐ ঘরে তালা দেওয়া কেন?

—তা জানি না হুজুর, ঐ ঘরটা তালা দেওয়াই থাকে, বরাবর—

—মানদাকে ডাকো তো, সে হয়তো জানে ঐ ঘরের তালার চাবি কোথায়।

ঠিক ঐ সময় মানদাকে দোতলার সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল। রতন মানদাকে দেখতে পেয়ে বললে, বাবু, ঐ যে মানদা—

বলতে বলতে মানদা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে।

—মানদা, ঐ ঘরের তালার চাবিটা কোথায়?

—আমি তো জানি না বাবু। মানদা বলল।

—ঐ ঘরের তালার চাবিটা কোথায় তুমি জানো না? কিরীটীর আবার প্রশ্ন?

—না, আমি এখানে আসা অবধি দেখছি, ঐ দরজায় ঐ ভাবেই তালা ঝোলে।

—কখনো কাউকে দরজা খুলতে দেখনি?

—না বাবু—

কিরীটী এবার সুশীল চক্রবর্তীর দিকে তাকাল—সুশীল, তোমার কাছে তো সেই চাবির রিংটা আছে, সঙ্গে এনেছ?

—হ্যাঁ, এই নিন। সুশীল চক্রবর্তী অনেকগুলো চাবি সমেত একটা রুপোর চাবির রিং পকেট থেকে বের করে কিরীটীর হাতে তুলে দিল। কিন্তু রিংয়ের কোন চাবির সাহায্যেই ঘরের তালাটা খোলা গেল না। এমন কি চাবির থোকার কোন চাবিই তালাতে প্রবেশ

করানোও গেল না। অথচ তালাটা দেখে কিরীটীর মনে হয় তালাটা সর্বদাই খোলা হয়। তালাটার চেহারা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার মত নয়।

—কোন চাবিতেই তো তালাটা খুলছে না দাদা।

—কোন চাবি না লাগলে আর কি করা যাবে, তালাটা ভাঙতে হবে—কিরীটী শান্ত গলায় কথাগুলো বলে পর্যায়ক্রমে একবার অদূরে দণ্ডায়মান রতন আর মানদার মুখের দিকে তাকাল।

গডরেজের মজবুত বড় তালা, তালাটা ভাঙা অত সহজ হল না। একটা লোহার রড দিয়ে প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট ধস্তাধস্তি করার পর তালাটা ভাঙা গেল, তাও দুজন সিপাইয়ের সাহায্যে। এবং অত যে শব্দ করে তালাটা ভাঙা হল তবু ঠিক তার পাশের ঘরে থেকেও সুশান্ত মল্লিকের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না বা সে এসে ব্যাপারটা জানবারও কোন চেষ্টা করল না।

ঘরটা অন্ধকার ছিল, জানালা দরজা বন্ধ থাকায় কিরীটী সুশীল চক্রবর্তীকে বলল, দেখ তো সুশীল, ঘরের আলোর সুইচটা কোথায়—

হাতড়াতে হাতড়াতে সুইচটা পাওয়া গেল। খুট করে সুইচ টিপতেই একটা ডুম ঢাকা একশো পাওয়ারের বাতি জ্বলে উঠল!

ঐ ঘরটা ঠিক মালঞ্চর দোতলার শোবার ঘরের নীচেই। পরে সেটা বুঝেছিল কিরীটী। মাঝারি সাইজের ঘরটি, ঘরের মধ্যে মাত্র একটি দেওয়াল-আলমারি, তার পাল্লায় চাবি লাগানো। এ ছাড়া ঘরের মধ্যে আর অন্য কোন আসবাবপত্র নেই।

দেখলে মনে হয় ঘরটা কেউ কখনও ব্যবহার করে না। গোটাচারেক জানালা, সব জানালারই পাল্লা বন্ধ। দুটি দরজা, যে দরজার তালা ভেঙে একটু আগে তারা প্রবেশ করেছে তার ঠিক উল্টো দিকে আর একটা দরজা।

দরজাটা খোলাই ছিল, এবং পাল্লা ধরে টানতেই খুলে গেল। দরজাটার পিছনে একটা সরু ফালিমত যাতায়াতের পথ এবং সেই পথের ওপরেই মেথরদের দোতলায় যাবার ঘোরানো লোহার সিঁড়ি।

কিরীটীর বুঝতে কষ্ট হল না ব্যাপারটা। সে ভুল দেখেনি, কিছুক্ষণ আগে ঐ ঘরের ঈষৎ ফাঁক করা জানালার কপাটের আড়াল থেকে যে চক্ষুর দৃষ্টি সে দেখেছিল, সে যে-ই হোক, এই ঘরের মধ্যেই সে ছিল এবং পিছনের ঐ দরজাপথেই সে অন্তর্হিত হয়েছে।

—সুশীল—

—কিছু বলছেন দাদা?

—এখন বুঝতে পারছ তো, সে রাত্রে ঐ গলিপথ দিয়েই দীপ্তেন ভৌমিক সকলের অজ্ঞাতে বের হয়ে গিয়েছিল!

—ঐ সিঁড়িটা দিয়ে?

—খুব সম্ভবত, কিরীটী বললে, হ্যাঁ সে রাত্রে ঐ সিঁড়ি দিয়েই দীপ্তেন মালঞ্চর ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল। আর আজ কিছুক্ষণ আগে এই ঘরের মধ্যে যে ছিল সে-ও ঐ দরজা আর ঐ সিঁড়ি ব্যবহার করেছে—

—এই ঘরের মধ্যে কেউ ছিল নাকি?

—হ্যাঁ। আর এ বাড়িতে এখন যারা আছে সে তাদেরই মধ্যে একজন কেউ।

—কে বলুন তো দাদা?

—জানি না, তবে এ সময় এই ঘরের মধ্যে সে কেন এসেছিল তাই ভাবছি—

—হয়তো আমাদের প্রতি নজর রাখবার জন্য।

—না। আমার ধারণা তার এ ঘরে আসার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল এবং আমাদের সাড়া পেয়ে এবং জানলার কপাট ঈষৎ ফাঁক করে আমাদের দেখতে পেয়েই সরে পড়েছে। তবে বাড়ির বাইরে সে নিশ্চয়ই যায়নি। চল তো, ঘরের আলমারিটা একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক।

ঐ চাবির রিংয়ের মধ্যেই একটা চাবি দিয়ে আলমারিটা খুলে ফেলা গেল। একটা তাকে থরে থরে সাজানো কতকগুলো কার্ড-বোর্ডের বাক্স। অনেকটা সিগারেটের বাক্সর মত।

কিরীটী হাত বাড়িয়ে একটা বাক্স নিয়ে বাক্সর ঢাকনাটা খুলতেই দেখা গেল তার দেখা সুন্দর পরিপাটী করে সাজানো সব লম্বা লম্বা সিগারেট।

সুশীল চক্রবর্তী বললেন, এ সব তো সিগারেট দেখছি—

কিরীটী কোন কথা না বলে একে একে সব বাক্সগুলোই খুলে ফেলল। গোটা দশেক বাক্সের মধ্যে ছ'টা খালি, বাকি চারটের মধ্যে সিগারেট রয়েছে, তার মধ্যে একটায় অর্ধেক।

—কি ব্যাপার বলুন তো দাদা, এখানে এই আলমারিতে এত সিগারেট কেন?

—আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয় তো—কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বলল, এগুলো সাধারণ সিগারেট নয় সুশীল, এগুলো মনে হচ্ছে নিষিদ্ধ নেশার সিগারেট—'হ্যাসিস'—চরস ইত্যাদি দিয়ে যে-সব নেশার জন্য তৈরী সিগারেট গোপন পথে চলাচল করে এগুলো তাই—সেই জাতীয় সিগারেট—নিষিদ্ধ বস্তু—

সুশীল চক্রবর্তী নিঃশব্দে সিগারেটগুলোর দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকে।

কিরীটী বললে, মনে হচ্ছে এ বাড়িতে থেকে এই নিষিদ্ধ বস্তুর লেনদেন হত। আমি ভাবছি সুশীল, শেষ পর্যন্ত এর মধ্যেই মালঞ্চর হত্যার বীজ লুকিয়ে ছিল না তো!

—এই সিগারেটের মধ্যে?

—হ্যাঁ। এই সিগারেটকে কেন্দ্র করেই হয়তো মৃত্যুগরল ফেনিয়ে উঠেছিল। এগুলো নিয়ে চল। আর এই সিগারেটগুলোর মধ্যে থেকে আজই একটা অ্যানালিসিসের জন্যে পাঠিয়ে দাও।

তারপর একটু থেমে কিরীটী বললে, হয়তো এগুলো সরাবার জন্যেই এখানে সে এসেছিল আজও। কয়দিন ধরেই হয়তো চেষ্টা করছিল এগুলো সরাবার, কিন্তু চাবির রিং তোমার পকেটে থাকায় সুবিধা করতে পারেনি। চল, এবার ওপরে যাওয়া যাক।

সুশীল চক্রবর্তী ভাঙা দরজাটার দিকে এগুচ্ছিলেন। কিরীটী বাঁধা দিয়ে বললে, না, ও দরজা দিয়ে না, চল পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে লোহার সিঁড়ি দিয়ে আমরা ওপরে যাব—

সেই মতই ওরা ওপরে উঠে এলো, লোহার ঘোরানো সিঁড়ি পথ।

কিরীটীর অনুমান মিথ্যা নয়। দেখা গেল নীচের সেই ঘরটার ওপরের ঘরটাই মালঞ্চর শয়নকক্ষ। বাথরুম দিয়েই ওরা ঘরে ঢুকল, দরজা খোলাই ছিল বাথরুমের।

—দাদা, আপনি সত্যিই নীচের ঘরে কাউকে দেখেছেন?

—একটি চক্ষু—শ্যেন দৃষ্টি ছিল সেই চোখের তারায়—কিরীটী বললে, চোখাচোখি যখন একবার হয়েছে তখন পালাতে সে পারবে না। চল, ঘরের ভিতরটা আর একবার আজ দুজনে মিলে খুঁটিয়ে দেখা যাক।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই কিরীটীর নজর পড়ল ঘরের মধ্যে অ্যাশট্রেটার ওপরে—সোফাসেটের মাঝখানে একটি ছোট ত্রিপয়ের বেলজিয়ামের কাটগ্লাসের সুদৃশ্য একটি অ্যাশট্রে, তার মধ্যে চার-পাঁচটা দগ্ধাবশেষ সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে। একটা টুকরো হাতে তুলে নিয়ে কিরীটী দেখল—বিলাতী সিগারেট—স্টেট এক্সপ্রেস ৫৫৫।

—সুশীল, তোমার নিহত নায়িকার ধূমপানের অভ্যাস ছিল নাকি?

—জানি না তো—

—জিজ্ঞাসা করনি?

—না।

—জিজ্ঞাসা করাটা উচিত ছিল ভায়া। তার যদি ধূমপানের অভ্যাস না থাকে তবে এগুলো কার সিগারেটের দগ্ধাবশেষ? হয় সুরজিৎ ঘোষালের, না হয় দীপ্তেন ভৌমিকের নিশ্চয়।

—সুশান্ত মল্লিকেরও তো হতে পারে দাদা—

—মনে হয় না। কারণ যে পরমুখাপেক্ষী, তার ভাগ্যে স্মাগ্‌ল করা বিলাতী সিগারেট জুটত বলে মনে হয় না। স্পেশাল ব্রান্ডের সিগারেট যখন, তখন এই বঁড়শীর সাহায্যেই মাছকে খেলিয়ে ডাঙায় টেনে তোলা কষ্টকর হবে না—কথাগুলো বলে কতকটা যেন আপন মনেই কিরীটী ঘরের চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। সুশীল চক্রবর্তীর মুখে শোনা ঘরের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে সব কিছু।

—সুশীল, তুমি এই ঘরের বাইরে থেকে লক করে গেলেও এ ঘরে প্রবেশাধিকার তুমি বন্ধ করতে পারনি, বুঝতে পারছ বোধ হয়! কই—দেখি তোমার চাবির গোছা—

সুশীল চক্রবর্তী পকেট থেকে চাবির রিংটা কিরীটীর হাতে তুলে দিলেন।

—ঐ আলমারির চাবি কোন্‌টা সুশীল?

সুশীল চাবিটা দেখিয়ে দিলেন এবং চাবির সাহায্যে কিরীটী আলমারিটা খুলে ফেলল। দুটি ড্রয়ার, দুটি ড্রয়ারই একে একে খুলে তার ভেতরের সব কিছু পরীক্ষা করে দেখতে লাগল কিরীটী।

কিন্তু ড্রয়ারের মধ্যে সুশীল চক্রবর্তী সেদিন অনুসন্ধান চালিয়ে যা পেয়েছিলেন তার চাইতে বেশী কিছু পাওয়া গেল না। কিরীটী তবু অনুসন্ধান চালিয়ে যায়...

—কি খুঁজছেন দাদা? সুশীল প্রশ্ন করল।

—ব্যাঙ্কের পাসবই। মালঞ্চর নিশ্চয়ই একাধিক ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট ছিল।

—একটা তো পেলেন।

—যেখানে নিষিদ্ধ চোরাই দ্রব্যের কারবার, সেখানে ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স মাত্র হাজার দুই-তিন থাকাটা ঠিক যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। চোরাই কারবারের লেনদেনের নিট ফল অত সামান্য তো হতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কিরীটীর অনুমানই ঠিক। মালঞ্চর নামে চার-পাঁচটা ব্যাঙ্কের পাসবই পাওয়া গেল। কিছু ফিক্সড্ ডিপোজিটের কাগজপত্র পাওয়া গেল সেই সঙ্গে।

সুশীল চক্রবর্তী বললেন, এ যে দেখছি অনেক টাকা দাদা—

কিরীটী বলল, হ্যাঁ যোগফল তাই দাঁড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে বেশ জটিলই হয়ে উঠল সুশীল—চোরাকারবার, হত্যা, সুন্দরী এক নারী, তিনটি পুরুষ মক্ষিকা সেই নারীকে ঘিরে, ভুলে যেও না।

ব্যাঙ্কের পাসবইগুলো সঙ্গে নিয়ে ওরা দুজনে দোতলা থেকে আগে সিঁড়ি পথেই নীচের তলায় নেমে এসে সুশান্ত মল্লিকের ঘরে ঢুকল।

সুশান্ত মল্লিক তার ঘরের মধ্যে বসে ধূমপান করছিল; সামনেই চৌকির ওপরে একটা সোনার সিগারেট কেস ও একটা ম্যাচ। ওরা ঘরে ঢুকতেই সুশান্ত মল্লিক ওদের দিকে তাকাল। তার মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় সুশান্ত মল্লিক একটু যেন বিরক্ত হয়েছে, কিন্তু কোন কথা বলল না।

—কি সুশান্তবাবু, কি ঠিক করলেন? কিরীটী বলল।

—কিসের কি ঠিক করব?

—পুলিসকে সাহায্য করলে হয়তো আপনি এই ফ্যাসাদ থেকে মুক্তি পেলেও পেয়ে যেতে পারেন।

—আমি যা জানি সবই তো বলেছি—

—কিন্তু আপনার কাছ থেকে আমাদের আরো যে কিছু জানবার আছে সুশান্তবাবু—কিরীটী বলল।

—আমি আর কিছুই জানি না।

—বেশ, তাই না হয় মেনে নিলাম। এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন।

—কি প্রশ্ন?

—মালঞ্চ নিজেই নিজের গাড়ি ড্রাইভ করতেন, গাড়ি নিয়ে তিনি মাঝেমধ্যে নিশ্চয়ই বেরুতেন, তিনি কোথায় যেতেন জানেন?

—সিনেমা, থিয়েটার, বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে যেতো হয়তো।

—আর কোথাও যেতেন না—যেমন ধরুন কোন ক্লাব বা রেস্তোরাঁ—

—একটা নাইট ক্লাবে মাঝে-মধ্যে সে যেতো জানি। ক্লাবটা বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে—

—হুঁ। বুঝেছি। ক্লাবটার নাম দি রিট্রিট, তাই না? A notorious night club! আচ্ছা, মালঞ্চদেবী ড্রিংক করতেন না মিঃ মল্লিক?

—করত বোধ হয়—

—আপনি দেখেননি কখনো?

—সামান্য বেসামাল অবস্থায় মাঝে-মধ্যে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরতে দেখেছি তাকে,

কিন্তু মদ্যপান করতে দেখিনি।

—দীপ্তেনবাবু আর সুরজিৎ ছাড়া অন্য কোন পুরুষের এ বাড়িতে যাতায়াত ছিল কি?

—সমীর রায় নামে একজন বিলেত ফেরত ডাক্তার আর এক তরুণ মারোয়াড়ীকে কালেভদ্রে এখানে আসতে দেখেছি।

—আর কেউ?

—একজন অভিনেত্রী দু-একবার এসেছে—

—কি নাম তার?

—ডলি দত্ত, বোধ হয় তার নাম।

—আচ্ছা মালঞ্চ দেবী ধূমপান করতেন?

—কখনো দেখিনি—

—হুঁ! আপনি এ বাড়ি থেকে বেরুতে চান মাঝে-মধ্যে—তাই না সুশান্তবাবু? কিরীটী বলল।

—মাঝে-মধ্যে না, আমি একেবারেই চলে যেতে চাই। আপনারা না আটকালে চলে যেতামও, সুশান্ত মল্লিক বলল।

—কিন্তু যাবেন কোথায়?

—যা হোক একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে থাকবার—

—কেন এই বাড়িটা তো আপনার স্ত্রীরই নামে।

দপ্ করে যেন সুশান্ত মল্লিক জ্বলে উঠল, কি বললেন? স্ত্রী! কে আমার স্ত্রী—ঐ বাজারের বেশ্যাটা! হ্যাঁ, বলতে পারেন অবিশ্যি সেই স্ত্রীলোকটারই কাছে মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে আজও বেঁচে আছি আমি, কিন্তু আর না। তারপর একটু থেমে ভাঙা গলায় সুশান্ত মল্লিক বলল, চলে যেতাম অনেক আগেই, কিন্তু কেন পারিনি জানেন? যখনই ভেবেছি ওই বোকা মেয়েটার দেহটাকে দশজনে খুবলে খুবলে খাচ্ছে তখনই মনে হয়েছে এই ছেঁড়াছিঁড়ি একদিন ওকে শেষ করে দেবে। আর দেখলেন তো, হলও তাই। কিন্তু কি হল, একেবারেই পারলাম না তো ওকে রক্ষা করতে—

শেষের দিকে কিরীটীর মনে হল যেন কান্না ঝরে পড়ছিল সুশান্ত মল্লিকের কণ্ঠ থেকে।

কিরীটী বলল, সুশান্তবাবু, সেদিন সকালবেলা যখন মালঞ্চর ঘরের দরজা খুলছিল না, আপনি কেন তখন রতনকে বলেছিলেন মালঞ্চ দেবী শেষ হয়ে গিয়েছেন?

—বলেছিলাম নাকি! আমার ঠিক মনে নেই—

—হ্যাঁ, আপনি বলেছিলেন। আচ্ছা, আর একটা কথা সুশান্তবাবু, কিরীটী বলল, ঐ দুর্ঘটনার আগে হঠাৎ কেন আপনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন?

—বুঝতে পেরেছিলাম এ বাড়িতে আর আমার থাকা হবে না, কারণ মালঞ্চ তা চায় না—

—মালঞ্চ কিছু বলেছিলেন?

—হ্যাঁ—

—কি বলেছিলেন?

সুশান্ত মল্লিক সেই সন্ধ্যার ঘটনাটা বলে গেল। তারপর বলল, আপনিই বলুন মশাই,

তারপরও কি থাকা যায়?

—তবে আবার এখানে ফিরে এলেন কেন?

—ফিরে আসতাম না, কিন্তু হঠাৎ কেন যেন আমার মন বলছিল, তার **বড় বিপদ,** আর আমার মন যে মিথ্যা বলেনি, সে তো প্রমাণিতই হয়েছে।

—তা বটে! দুটো রাত কোথায় ছিলেন আপনি?

—পথে পথে, আর কোথায় থাকব? আমার আবার জায়গা কোথায়?

—আচ্ছা সুশান্তবাবু, আপনার স্ত্রী হত্যার ব্যাপারে কাউকে আপনি সন্দেহ করেন? কিরীটীই পুনরায় প্রশ্নটা করল।

—না, তবে ঐ ধরনের মেয়েছেলেদের শেষ পরিণাম ঐ রকমই যে হবে অর্থাৎ অপঘাত মৃত্যু, তা আমার জানা ছিল।

—ঠিক আছে সুশান্তবাবু, আপনি বেরুতে পারেন—অবশ্যই যদি আপনি কথা দেন যে পুলিসের অনুমতি ছাড়া এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেন না।

—তাই হবে। আর যাবই বা কোথায়—যতদিন না একটা আস্তানা মেলে মাথা গুঁজবার মত।

হঠাৎ সুশান্ত বলে ওঠে, ঐ মানদা, ওকে একদম বিশ্বাস করবেন না মশাই, she is a dangerous type.

কিরীটী মৃদু হাসে। সুশান্ত বলে, আপনি হাসছেন স্যার, ঐ ধরনের উয়োম্যানরা can do anything for money.

—তার মানে আপনি কি বলতে চান ওকে টাকা দিয়ে—

—কিছুই আমি বলতে চাই না স্যার, শুধু বলছিলাম ওর ওপর নজর রাখবেন।

দুজনে ঘর থেকে বের হয়ে এলো। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে সুশীল বললেন, লোকটা মনে হচ্ছে একটা বাস্তুঘুঘু—

—সুশান্ত মল্লিকের ওপর নজর রেখেছ তো?

—হ্যাঁ, বিনোদকে বলেছি—

॥ দশ ॥

মানদা আর রতন দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে কি সব কথাবার্তা বলছিল নিজেদের মধ্যে। ওদের দেখে চুপ করে গেল।

কিরীটীর ইঙ্গিতে সুশীল মানদাকে বললেন, মানদা, এই ভদ্রলোক তোমাকে ক'টা প্রশ্ন করতে চান, ঠিক ঠিক জবাব দেবে—

—কেন দেবো না বাবু, সত্যি কথা বলতে মানদা ডরায় না, তেমন বাপে জন্ম দেয়নি মানদাকে।

—রতন, তুমি নীচে যাও, ডাকলে এসো। সুশীল বললেন।

—যে আজ্ঞে। রতন নীচে চলে গেল।

—মানদা, তোমার মা তো নিজেই ড্রাইভ করতেন? কিরীটীর প্রশ্ন।

BanglaBook.org

—হ্যাঁ, মা খুব ভাল গাড়ি চালাতে পারত বাবু।

—প্রায়ই তোমার মা গাড়ি নিয়ে বেরুত, তাই না?

—প্রায় আর বেরুবে কি করে, বাবু আসতেন তো সন্ধ্যার সময়, রাত এগারোটা পর্যন্ত থাকতেন, তবে যদি কখনো তাড়াতাড়ি চলে যেতেন, মা গাড়ি নিয়ে বেরুত। তাছাড়া বাবু বাইরে-টাইরে গেলে বেরুত।

—তোমার মা কোথায় যেতো জানো?

—কি একটা ক্লাবে যেতো শুনেছি। নাম জানি না।

—কখন ফিরত?

—তা রাত সাড়ে বারোটা, দেড়টার আগে ফিরত না।

—তোমার মা মদ খেতো?

—খেতো বৈকি, তবে খেতে দেখিনি।

—যদি দেখনি তবে জানলে কি করে তোমার মা মদ খেতো? কিরীটী শুধালো।

—আজ্ঞে বাবু, তা কি আর জানা যায় না। মাঝে মাঝে ক্লাব থেকে ফিরে এলে আমি যখন দরজা খুলে দিতাম, মার মুখ থেকে ভরভর করে গন্ধ বেরুত। তাছাড়া টলতেও দেখেছি মাকে—

—তোমার মা সিগারেট খেতো?

—হ্যাঁ, তবে বেশী নয়। মাঝে-মধ্যে কখনো-সখনো একটা-আধটা খেতে দেখেছি।

—ডাক্তার সমীর রায়কে তুমি চেনো মানদা?

—এখানে তো প্রায়ই এক ডাক্তারবাবু আসতেন, নাম জানি না, তবে মা তাকে ডাঃ রায় বলে ডাকতেন।

—তোমার বাবু জানতেন যে ঐ ডাক্তারবাবু এখানে আসতেন?

—জানবেন কি করে—বাবু যখন থাকতেন না তখনই তো ডাক্তারবাবু আসতেন।

—আর একজন মারোয়াড়ী—অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক?

—হ্যাঁ, আগরওয়ালা বলে একজন আসতেন মাঝে-মধ্যে।

—ডলি দত্তকে জানো? ওই ফিল্ম-অ্যাকট্রেস, ছবি করে?

—হ্যাঁ, সেও তো আসত এখানে। ঐ ডাক্তারবাবুর সঙ্গেই আসত।

—আচ্ছা, যে রাতে তোমার মা খুন হয়, সে রাত্রে তো তোমার বাবু আর দীপ্তেনবাবু দুজনেই এ বাড়িতে এসেছিলেন, তাই না? কিরীটীর প্রশ্ন।

—হ্যাঁ, আগে দীপ্তেনবাবু, আর তাই নিয়েই তো বাবুর সঙ্গে রাগারাগি, বাবু বলেছিলেন মাকে খুন করবেন!

—তোমার বাবু যখন ওকে শাসাচ্ছিল তুমি তখন কোথায় ছিলে?

—দরজার বাইরে?

—আড়ি পেতে ওদের কথা শুনছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ। বাবু যে বলেছিল মায়ের ওপরে সর্বদা নজর রাখতে।

—তাহলে এ বাড়িতে যা হত তুমিই সে-সব কথা তোমার বাবুকে বলতে?

—তা বলব না—বাবু তো ঐ জন্যেই আমাকে রেখেছিলেন।

—তোমার বাবু তাহলে তোমার মাকে সন্দেহ করতেন?

—তা সন্দেহের মত কাজ করলে সন্দেহ করবে না লোকে!

—তা বটে। কিরীটী হাসল।

—মানদা—কিরীটী আবার প্রশ্ন করল, তুমি কোন্ ঘরে থাকো?

—আজ্ঞে নীচের একটা ঘরে—

—যে রাত্রে তোমার মা খুন হয়, সে রাত্রে রাত দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত তুমি কি করছিলে? মনে আছে নিশ্চয়ই তোমার?

—বাবু রাগারাগি করে চলে যাবার পর রাত সাড়ে দশটা পৌনে এগারোটা পর্যন্ত নীচেই ছিলাম। ভেবেছিলাম মা হয়তো গাড়ি নিয়ে বেরুবে, কিন্তু তা যখন বের হল না, বুঝলাম আর বেরুবে না, তখন ওপরে তাকে খাবার কথা বলতে যাই—

—গিয়ে কি দেখলে?

—মার ঘরের দরজা বন্ধ।

—তারপর?

—ডাকাডাকি করলাম, মা তখন বললেন, তিনি খাবেন না, আর আমাদের খেয়ে নিতে বললেন।

—তোমার মার গলার স্বর স্পষ্ট শুনেছিলে?

—মার গলার স্বর সামান্য একটু জড়ানো ছিল, তবু ঠিক মার গলাই শুনেছি। তারপর নীচে গিয়ে আমি আর রতন খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ি।

ওপরের তলায় কোন শব্দটব্দ কিছু শোননি সে রাত্রে?

—না।

—ঠিক আছে, তুমি রতনকে এবারে পাঠিয়ে দাও।

একটু পরে রতন এলো।

কিরীটীই প্রশ্ন করে, রতন, সে রাত্রে তুমি কখন শুয়েছিলে?

—বোধ হয় তখন রাত সাড়ে এগারোটা বাজতে শুনেছিলাম।

—সেটা যে সাড়ে এগারোটাই তা কি করে বুঝলে, সাড়ে বারোটা বা দেড়টাও তো হতে পারে!

—মানদাও বলেছিল, বলেছিল রাত সাড়ে এগারোটা বাজল রতন।

—আচ্ছা রতন, পরের দিন তুমি কখন সদর খোল?

—যখন থানায় খবর দিতে যাই।

—তা তোমার বাবুকে আগে ফোনে খবর না দিয়ে তুমি থানায় গেলে কেন?

—আজ্ঞে মানদাই যে বললে—

—হুঁ। আচ্ছা রতন, নীচের যে ঘরটায় সর্বদা তালা দেওয়া থাকত সেটা তুমি কাউকে খুলতে দেখেছ কখনো?

—মার কাছেই চাবি থাকত, মা-ই মাঝে মধ্যে খুলতেন, আর কাউকে আমি ঐ ঘরের দরজা খুলতে দেখিনি বাবু।

—তোমার কৌতূহল হয়নি কখনো—ঘরে কেন সর্বদা তালা দেওয়া থাকে?

pathagar.net

—না।

—মানদা কখনো ঐ ঘরে ঢোকেনি?

—না, দেখিনি বাবু।

মানদা ও রতনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিরীটী সুশীল চক্রবর্তীকে নিয়ে আবার সারা বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখল। বাড়ি থেকে বের হয়ে জীপে উঠে কিরীটী বলল, সুশীল, তোমায় একটা কাজ করতে হবে—

—কি বলুন দাদা?

—ডাঃ সমীর রায় আর ঐ অভিনেত্রী ডলি দত্ত—ওদের একটু খোঁজখবর নিতে হবে। কাল-পরশু যখন হোক ওদের থানায় ডেকে আনতে পারো?

—থানায়?

—হ্যাঁ। কিংবা এক কাজ কর, তোমাদের ডি.সি. ডি.ডি. মিঃ চট্টরাজকে আমার কথা বলে বোলো ওদের লালবাজারে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে।

—সেই বোধ হয় ভাল হবে দাদা, আপনি বরং ফোনে মিঃ চট্টরাজকে বলুন, আমি আপনাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে এখুনি লালবাজার যাচ্ছি।

—ভাল কথা, তোমার ময়না তদন্তের রিপোর্ট এসেছে?

—সে তো কালই এসে গেছে, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি।

—ফোরেনসিক রিপোর্ট, ভিসেরা ও অন্যান্য জিনিসের?

—না, এখনো আসেনি, তবে আশা করছি দু-চার দিনের মধ্যেই এসে যাবে।

ডি.সি. ডি.ডি. মিঃ চট্টরাজকে বলতেই তিনি ডাঃ সমীর রায় ও ডলি দত্তকে লালবাজারে ডেকে আনবার ব্যবস্থা করলেন, এবং কিরীটী ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে শুনে আরও খুশি হলেন।

লালবাজার থেকে ফিরতে ফিরতে বেলা তিনটে হয়ে গেল সুশীল চক্রবর্তীর। থানায় ঢুকে তিনি দেখেন কিরীটী তার ঘরে বসে আছে।

—এ কি দাদা, আপনি কতক্ষণ? সুশীল চক্রবর্তী বললেন।

—মিনিট দশেক। কই দেখি তোমার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট—সুশীল চক্রবর্তী পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এগিয়ে দিলেন।

ময়না তদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে, শ্বাসরোধ করেই হত্যা করা হয়েছে, এবং মৃত্যুর সময় সম্ভবত সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে কোন এক সময়। শরীরের কোথাও বিশেষ কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় নি, যাতে করে প্রমাণিত হতে পারে মৃত্যুর পূর্বে নিহত ব্যক্তি কোন রকম স্ট্রাগ্‌ল করেছিল। মৃতের হাতে এবং পায়ে অনেকগুলো কালো কালো চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। আর ভিসেরার রিপোর্ট এখনো আসেনি।

—আচ্ছা দাদা, সুশীল চক্রবর্তী বললেন, হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি থেকে যে বাক্স-ভরা সিগারেট পাওয়া গিয়েছে, আপনি বলেছিলেন, ওগুলি সম্ভবত নিষিদ্ধ নেশার সিগারেট—ওর মধ্যে কি আছে বলে আপনার মনে হয়?

—ওর মধ্যে গাঁজা বা ভাঙ জাতীয় নেশার বস্তু আছে বলে মনে হয়। ঐ যাদের তোমরা বল হ্যাসিস সিগারেট। আমাদের দেশে ভারতীয় গাঁজা থেকেই ওই বস্তুটি তৈরি হয়ে থাকে। ফার্মাকোপিয়াতেও তুমি ওর কথা পাবে—An Arabian aromatic confection of Indian hemp. পশ্চিমের দেশগুলোতে ঐ ধরনের সিগারেট নেশার জন্যে প্রচুর ব্যবহৃত হয়, ভারতীয় গাঁজা থেকেই মূলত তৈরী হয়। আমার মনে হয়, চোরাইপথে ঐ নেশার কারবার চালাত মালঞ্চ দেবী। অবিশ্যিই সে একা নয়, সঙ্গে তার আরও কেউ কেউ নিশ্চয়ই ছিল, আর ঐ নেশার চোরাকারবার করে প্রচুর উপার্জন করত মালঞ্চ ও তার সঙ্গীসাথীরা।

—তবে কি তার মত্যুর পিছনে ঐ চোরাকারবারের কোন—

—হলে আশ্চর্য হব না সুশীল। যাক, আমি এখন উঠব। তোমাদের ডি.সি. ডি.ডি. আমাকে ফোন করেছিলেন, সেখানে একবার যেতে হবে।

॥ এগারো ॥

পরের দিন বেলা ন'টা নাগাদ কিরীটী লালবাজারে ডি.সি. ডি.ডি. মিঃ চট্টরাজের অফিস ঘরে প্রবেশ করে দেখে একজন মধ্যবয়সী সুদর্শন ভদ্রলোক, পরনে দামী স্যুট, চট্টরাজের মুখোমুখি বসে।

চট্টরাজ কিরীটীকে চোখের ইঙ্গিতে চেয়ারে বসতে বললেন।

—ডাঃ রায়, আপনার ঐ হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যাতায়াত ছিল সে কথা আমরা গতকালই জানতে পারি—ডি.সি. ডি.ডি. বলতে থাকেন।

—যাতায়াত ছিল বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন?

—মানে প্রায়ই আপনি ওখানে যেতেন।

—হ্যাঁ যেতাম, মালঞ্চ দেবী আমার পেসেন্ট ছিলেন।

—I see, তা তার রোগটা কি ছিল ডাঃ রায়?

—নানা ধরনের অসুখ ছিল। তবে প্রায়ই মাইগ্রেন আর পেটের কলিকে ভুগতেন।

হঠাৎ ঐ সময় কিরীটী প্রশ্ন করল, excuse me ডাঃ রায়, একটা কথা, আপনি কি জানতেন ঐ মহিলাটি গাঁজা জাতীয় কোন নিষিদ্ধ নেশা করতেন?

—না, আমি জানি না।

—মালঞ্চ দেবী কখনো বলেন নি?

—না।

—আপনি সাধারণত রাত্রের দিকেই সেখানে যেতেন শুনেছি—

—বাজে কথা। যখনই দরকার পড়ত তখনই যেতাম, আমরা ডাক্তার, কল এলে যেতেই হয়।

—ডাক্তার হিসাবেই তো যেতেন! তবে আপনাকে দরকারটা বেশীর ভাগ রাত্রের দিকেই হত—তাই নয় কি?

—বললাম তো, যখন দরকার হত তখুনি যেতাম।

—তা মিঃ সুরজিৎ ঘোষাল ব্যাপারটা জানতেন?

—জানতেন বৈকি, আর তাঁর কল পেয়েই তো প্রথমে আমি সেখানে যাই—

—সুরজিৎ ঘোষালের সঙ্গে মালঞ্চর সম্পর্কর কথাটা নিশ্চয় আপনি জানতেন অর্থাৎ মালঞ্চ তার keeping-য়ে ছিল?

—আমার জানার দরকার হয়নি and that was none of my business.

—ডাঃ রায়, আপনি দীপ্তেন ভৌমিককে জানেন?

—হ্যাঁ, পরিচয় আছে। সমীর ডাক্তার বললেন।

—তিনি হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যেতেন জানেন নিশ্চয়ই?

—না, তাকে সেখানে আমি কখনো দেখিনি।

—ডাঃ রায়, বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে একটা নাইট ক্লাব আছে, socalled সোসাইটির অভিজাত নরনারীরা যেখানে রাত্রে মিলিত হয়। ক্লাবটা জানেন আপনি?

—জানি।

—আপনিও তো সেখানে প্রায়ই যেতেন। সেখানে আপনার দীপ্তেন ভৌমিকের সঙ্গে দেখা হত না?

—মনে করতে পারছি না।

—আর মিঃ সুরজিৎ ঘোষালের সঙ্গে?

—না, তাঁকে কখনও সেখানে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

—মালঞ্চ দেবী—তাকে নিশ্চয়ই ঐ নাইট ক্লাবে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, দেখেছি। তিনি মাঝে মধ্যে সেখানে যেতেন।

—ডাঃ রায়, আপনি অভিনেত্রী ডলি দত্তকে চেনেন?

—না, ও নাম শুনিইনি আমি কখনো।

ডি.সি. ডি.ডি. প্রশ্ন করলেন, ব্যাঙ্কে আপনার কোন ভল্ট নেই?

—না মশাই, নেই। আমাদের আয়টাই আপনারা কেবল দেখেন, ব্যয়ের দিকটা কখনো ভেবে দেখেন না। আমার আয় যেমন তেমন খরচও অনেক।

—আচ্ছা আর একটা কথা, আবার কিরীটীর প্রশ্ন, আপনি তো মালঞ্চ দেবীর ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ছিলেন, তিনি গাঁজা ছাড়া অন্য কোন রকম নেশা করতেন বলে জানেন?

—হ্যাঁ, করতেন। She was addicted to pethidine! প্রথমে abdominal colic-এর জন্যে নিতেন, পরে সেটাই অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল।

—নিজে নিজেই ইন্‌জেকশন নিতেন বোধহয়?

—শেষের দিকে তাই নিতেন জানি।

—আপনি তাঁকে ঐ মারাত্মক বিষ শরীরে নিতে নিষেধ করেননি?

—বহুবার করেছি, কিন্তু পেথিডিনের নেশা বড় মারাত্মক নেশা, একবার ঐ নেশার কবলে পড়লে রেহাই পাওয়া দুষ্কর—

—আর একটা নেশাও তিনি করতেন, আমরা যতদূর জেনেছি। জানেন কিছু?

—কিসের নেশা?

—হ্যাসিস—

—Good Lord! না, আমি জানতাম না। and I don't think so, প্রশ্নোত্তরের পর ডাক্তার রায়কে মিঃ চট্টরাজ যাবার অনুমতি দিলেন।

অভিনেত্রী ডলি দত্তকে কিন্তু তার টালার বাড়িতে খোঁজ করে পাওয়া গেল না। তার স্বামী জীবন দত্ত বললেন, ছবির ব্যাপারে সে বোম্বাই গিয়েছে।

সুশীল চক্রবর্তী ডলি দত্ত সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছিলেন।

বয়স ত্রিশের মধ্যে, খানতিনেক ছবিতে কাজ করেছে বেশ কয়েক বছর আগে, এবং কোন ছবিই দাঁড়ায়নি। বর্তমানে তিন-চার বৎসর তার হাতে কোন কাজ নেই। তার স্বামী জীবন দত্ত ব্রোকার, বেশ ভালই রোজগার করে। সচ্ছল অবস্থা। ডলি দত্ত গ্র্যাজুয়েট এবং হাই সোসাইটিতে তার যাতায়াত ও মেলামেশা আছে। নিজের একটা ফিয়াট গাড়ি আছে, সেটা নিয়েই ঘুরে বেড়ায়।

ডলি দত্ত একদিন নিজেই লালবাজারে এসে হাজির হল। গাড়ি থেকে নেমে গটগট করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে একেবারে চট্টরাজের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজার গোড়ায় প্রহরারত সার্জেন্ট ডলি দত্তকে বাধা দিল।—কাকে চাই?

—মিঃ চট্টরাজের সঙ্গে দেখা করব। বলুন ফিল্ম অ্যাকট্রেস ডলি দত্ত এসেছেন।

সার্জেন্টের নামটা শোনা ছিল, বললে, অপেক্ষা করুন, আমি খবর দিচ্ছি—বলে সার্জেন্ট ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এসে বললে, যান, ভিতরে যান—

চট্টরাজ তার নিজের অফিস ঘরে বসে একটা রিপোর্ট দেখছিলেন। ডলি দত্ত ভিতরে ঢুকতেই তিনি বললেন, বসুন—

—শুনলাম থানা থেকে আমার বাড়িতে কেউ আমার খোঁজে গিয়েছিলেন, আমি কলকাতায় ছিলাম না—ডলি দত্ত বললে।

চট্টরাজ চেয়ে ছিলেন ডলি দত্তর দিকে। বয়েস যা-ই হোক দেখতে সাতাশ-আটাশের বেশী বলে মনে হয় না। স্লিম ফিগার, বগল-কাটা বুক-খোলা ব্লাউজ গায়ে, পরনে একটা ডিপ ব্লু রঙের দামী জর্জেট শাড়ি। গলায় একটা সোনার সরু চেন, দু' কানে দুটো হীরার ফুল। হাতে কিছু নেই, ডান হাতে ছোট একটা দামী সোনার ঘড়ি। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, শ্যাম্পু করা।

ডলি দত্ত চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল, তা আমাকে হঠাৎ আপনাদের কি প্রয়োজন হয় বলুন তো?

—আপনি নিশ্চয়ই সংবাদ পেয়েছেন—হিন্দুস্থান রোডের মালঞ্চ দেবীকে হত্যা করা হয়েছে?

—হ্যাঁ, নিউজপেপারে পড়েছি—

—আমরা শুনেছি তিনি আপনার একজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিলেন।

—বান্ধবী! Not at all, সামান্য পরিচয় ছিল। আমার একজন admirer ছিলেন তিনি। একটা ফাংশনে আলাপ হয়েছিল ওঁর সঙ্গে।

—আপনি প্রায়ই তাঁর হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যেতেন?

—প্রায়ই নয়, বার দুই বোধহয় গিয়েছি।

বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের নাইট ক্লাব দি রিট্রিটে আপনার যাতায়াত আছে—মালঞ্চ দেবীকে আপনি সেখানে দেখেছেন!

—দেখেছি।

—ডাঃ সমীর রায়কে চেনেন? এই শহরের নামকরা ফিজিসিয়ান?

—নাম শুনেছি, পরিচয় নেই।

—কিন্তু ডাঃ রায় বলেছেন, সেই নাইট ক্লাবেই তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়। আপনারা উভয়েই উভয়ের পরিচিত এবং আপনি প্রায়ই ডাঃ রায়ের সঙ্গে মালঞ্চ দেবীর হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যেতেন।

—ডাক্তার রায় বলেছেন ঐ কথা?

—হ্যাঁ। নচেৎ আমরা জানব কি করে?

—All bogus! দু-একদিন সামান্য একটু কথাবার্তা বললেই যদি যথেষ্ট পরিচয় হয়, তাহলে তো যাদের সঙ্গে কখনো দু'-চারটে কথা বলেছি, তারা সকলেই আমার যথেষ্ট পরিচিত।

—আপনি লেক রোডের দীপ্তেন ভৌমিককে চেনেন?

—সামান্য পরিচয় আছে।

—তার সঙ্গে, তার গাড়িতে মাঝে মধ্যে আপনি বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের নাইট ক্লাবে যেতেন আমরা জানতে পেরেছি—

—মাঝে মধ্যে নয়, বার দুই হয়তো গিয়েছি—

—And you stayed there till midnight—কথাটা সত্যি?

—তা মাঝে মধ্যে একটু বেশী সময় থাকতাম।

—গতকাল evening flight-এ বম্বে থেকে ফিরেই এয়ারপোর্ট থেকে সোজা ট্যাক্সি করে আপনি তার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন?

ডলি দত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে মিঃ চট্টরাজের মনে হল হঠাৎ যেন ডলি দত্ত একটু বিব্রত বোধ করছে। ডলি দত্ত কোন জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে।

—কি ভাবছেন মিসেস দত্ত? সংবাদটা তাহলে মিথ্যে নয়?

—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। মানে—

—নিশ্চয়ই কোন জরুরী ব্যাপার ছিল—নচেৎ বাড়িতে না গিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে সোজা একেবারে তার লেক রোডের ফ্ল্যাটে চলে গেলেন কেন?

—হ্যাঁ একটু কাজ ছিল, মানে তার এক বন্ধু বম্বে থেকে একটা প্যাকেট তাকে পৌঁছে দিতে বলেছিলেন। জরুরী। তাই সোজা সেখানেই গিয়েছিলাম।

—জরুরী প্যাকেট! তা কি ছিল তার মধ্যে জানেন?

—না, আমি তা জানব কি করে?

—কিন্তু আমি বোধহয় অনুমান করতে পারি—প্যাকেটটার মধ্যে ছিল নিষিদ্ধ নেশার বস্তু, হ্যাসিস সিগারেট—

—Oh Christ! কি বলছেন আপনি?

—মিসেস দত্ত—গম্ভীর গলায় চট্টরাজ বললেন, if I am not wrong, কথাটা

pathagar.net

আপনি জানতেন।

—নিশ্চয়ই না, কখনোই না।

—জানতেন, আপনি জানতেন। আর আপনি বোম্বাই গিয়েছিলেন কোন ফিল্মের contract-এর ব্যাপারে নয়, ঐ প্যাকেটটাই নিয়ে আসতে—

—What do you mean!

—মিসেস দত্ত, আপনি নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমতী, কিন্তু অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। আপনি জানতেন হিন্দুস্থান রোডের বাড়িটা একটা ডেন ছিল, আর ঐখানেই ঐ নিষিদ্ধ বস্তু হ্যাসিসের লেনদেন চলত—

—Believe me officer, আ—আমি ওসব ব্যাপারে কিছুই জানতাম না, জানলে ঐ বাড়ির ত্রিসীমানাতেও যেতাম না।

—মিসেস দত্ত, কোন্ ব্যাঙ্কে আপনার অ্যাকাউন্ট আছে?

—ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট?

—হ্যাঁ, কারণ আমরা খবর পেয়েছি, রোজগার আপনার ভালই, এবং সেটা ঐ ফিল্ম লাইন থেকে নয়—

—আপনি জানেন না আমার স্বামী একজন ব্রোকার এবং সে যথেষ্ট রোজগার করে। সে প্রতি মাসে আমাকে অনেক টাকা হাতখরচ দেয়। Film-এ অভিনয় করাটা আমার পেশা নয়, নেশা। হ্যাঁ, নেশাই বলতে পারেন। ব্যাঙ্কে আমার সামান্য একটা অ্যাকাউন্ট আছে। ব্যাঙ্কের নাম দিচ্ছি, আপনারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন—

—ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন। তবে আপনাকে হয়তো ভবিষ্যতে আবার আমাদের প্রয়োজন হবে। আমাদের না জানিয়ে আপনি কলকাতার বাইরে যাবেন না।

—কিন্তু কেন, আপনারা কি মালঞ্চর হত্যার ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করছেন?

—সন্দেহ সকলের প্রতিই হওয়া স্বাভাবিক, বিশেষ করে যারা মালঞ্চ দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল, যাদের ওখানে যাতায়াত ছিল। আচ্ছা, আপনি আসুন।

ডলি দত্ত আসার সময় যেভাবে গট্-গট্ করে এসেছিলেন, বেরুবার সময় কিন্তু তেমন নয়, গতিটা মনে হল শ্লথ। একটু পরে ডলি দত্তর গাড়িটা লালবাজারের গেট দিয়ে বের হয়ে গেল।

॥ বারো ॥

ডলি দত্ত বের হয়ে যাবার পর চট্টরাজ কিরীটীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলেন—রায়সাহেব একবার আমার অফিসে আসতে পারেন?

কিরীটী বলল, সন্ধ্যার পর যাব।

ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে কিরীটী তখুনি বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হল। একবার সুশীল চক্রবর্তীর ওখানে যেতে হবে।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করল, বেরুচ্ছ নাকি?

—হ্যাঁ, একবার সুশীলের ওখানে যাব।

—যেতে হবে না দাদা, আমি এসে গিয়েছি—বলে হাসতে হাসতে সুশীল চক্রবর্তী ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন।

—আরে এসো এসো সুশীল, তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।

—বৌদি, কফি—

কৃষ্ণা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুশীল বললেন, আপনার অনুমানই ঠিক দাদা, ওগুলো হ্যাসিস সিগারেট—

—তোমাকে যে বলেছিলাম মালঞ্চর ঘরটা আর একবার ভাল করে সার্চ করতে?

—করেছি। কিন্তু ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ বা পেথিডিন অ্যাম্পুল তো পেলাম না।

—হিসেব যে মিলছে না ভায়া। কিরীটী যেন একটু চিন্তিত।

—কি ভাবছেন দাদা! সুশীল চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করেন, কিসের কি হিসেব আবার মিলছে না?

—ভাবছি তাহলে পেথিডিন অ্যাম্পুল বা একটা হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ পাওয়া গেল না কেন? যে পেথিডিন অ্যাডিক্টেড তার ঘরে ঐ দুটি বস্তু থাকবে না তা তো হতে পারে না। তবে কি হত্যাকারী কাজ শেষ হয়ে যাবার পর ঐ দুটি বস্তু ঘর থেকে নিয়ে গিয়েছে? তাই যদি হয় তো, আমরা দুটো definite conculsion-য়ে পৌঁছাতে পারি সুশীল।

—কি কনক্লুশন?

প্রথমত, হত্যাকারী unknown third person নয়, সে মালঞ্চর বিশেষ পরিচিতের মধ্যেই একজন, এবং দ্বিতীয়ত, মালঞ্চ যে পেথিডিন অ্যাডিক্টেড, সেটা সে ভাল করেই জানত, এবং সেটা তার পক্ষে সুবিধাই হয়েছিল।

সুশীল চক্রবর্তী কিরীটীর ইঙ্গিতটা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারেন—বলেন, তাহলে তো ঐ পরিচিত পাঁচজনের মধ্যেই একজন—

—হ্যাঁ, মালঞ্চর স্বামী সুশান্ত মল্লিক, তার বাবু সুরজিৎ ঘোষাল, দীপ্তেন ভৌমিক এবং ডাঃ সমীর রায়, তার পেয়ারের চোরাই কারবারের পার্টনার ও শ্রীমতী ডলি দত্ত—কিরীটী বল্লে।

কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন সুশীল চক্রবর্তী।

—এখন কথা হচ্ছে সুশীল, ওরা সকলেই মালঞ্চর বিশেষ পরিচিত জন হলেও ওরা সকলেই কি জানত যে মালঞ্চ পেথিডিন অ্যাডিক্টেড—এক ডাক্তার ছাড়া?

—একসঙ্গে মেলামেশা, একই সূত্রে বাঁধা, একই ইন্টারেস্ট—ওদের সকলের জানাটাই তো স্বাভাবিক দাদা—

—কি জানি, হতেও পারে। তবে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে সুরজিৎ ঘোষালকে অনায়াসেই ঐ লিস্ট থেকে eleminate করা যেতে পারে আপাতত।

কেন?—

—হাজার হলেও মালঞ্চ সুরজিৎ ঘোষালের কিপিংয়ে ছিল, সেক্ষেত্রে সে নিশ্চয়ই সুরজিৎ ঘোষালকে ব্যাপারটা জানতে দেবে না, বিশেষ করে সুরজিৎ ঘোষাল সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে যা জানা গিয়েছে, মদ তো দূরের কথা, ভদ্রলোক স্মোক পর্যন্ত করেন না!

মালঞ্চ সম্পর্কে তাঁর চরিত্রের ঐ বিশেষ দুর্বলতাটুকু ছাড়া সত্যিই তিনি একজন যাকে বলে ভদ্রলোক। আজকের সো-কল্ড সোসাইটির কোন ভাইস-ই তাঁর ছিল না। সেদিক দিয়ে বাকী চারজন তোমার সন্দেহের তালিকাভুক্ত সুশীল।...

—ঐ চারজনের মধ্যে কাকে আপনি—

—সুশীল, মাকড়সার জালে চার-পাঁচটা বিষাক্ত মাকড়সা বিচরণ করছে, এবং ঐ প্রত্যেকটি মাকড়সার ক্ষেত্রেই মালঞ্চকে হত্যা করার যথেষ্ট মোটিভ থাকতে পারে। কাজেই এই মুহূর্তে ওদের চারজনের মধ্যে বিশেষভাবে একজনকে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত হবে না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ, সার্কামস্টান্‌সিয়াল এভিডেন্স যাকে বলে, তার দ্বারাই একমাত্র ওদের একজনকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা চলতে পারে, অন্য কাউকে নয়। অবিশ্যি বোঝা যাচ্ছে ওরা সকলেই একটা চোরাকারবার চালাত এবং প্রত্যেকেরই ঐ হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যেমন যাতায়াত ছিল তেমনি ছিল আরো একটা মিটিং প্লেস, ঐ নাইট ক্লাবটি, সেক্ষেত্রে ওদেরই কেউ একজন হত্যাকারী হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু হত্যাকারী বললেই তো হবে না, আপাতদৃষ্টিতে ওদের প্রত্যেকের মোটিভ থাকলেও ঐ সঙ্গে তোমাকে ভাবতে হবে ওদের মধ্যে সে রাত্রে কার পক্ষে মালঞ্চকে হত্যা করা সবচাইতে বেশী সম্ভব ছিল, অর্থাৎ probability-র দিক থেকে কার উপরে বেশী সন্দেহ পড়ে। তার ওপর base করে তুমি যদি এগুতে পারো তাহলেই দেখবে ঐ হত্যারহস্যের কাছাকাছি তুমি পৌঁছে গেছ। হাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আরো প্রমাণ চাই, অতএব তোমায় কিছুটা সুতো ছাড়তে হবে—আরো সুতো, তবেই বিরাট কাতলাকে তুমি বঁড়শীতে গাঁথতে পারবে।

পরের দিনই সুশীল চক্রবর্তী সকাল আটটা নাগাদ লেক রোডে দীপ্তেন ভৌমিকের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলেন।

দিনটা ছিল রবিবার। লিফ্‌টে করে ওপরে উঠে ফ্ল্যাটের কলিং বেলের বোতাম টিপতেই দরজা খুলে গেল।

—ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা মধ্যবয়সী ভৃত্যশ্রেণীর একটি লোক দরজাটা খুলে বলল, কাকে চান?

—এখানে দীপ্তেন ভৌমিক থাকেন?

—হ্যাঁ। কি নাম বলব সাহেবকে?

—বল একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান, বিশেষ জরুরী প্রয়োজন।

—বসুন, আমি সাহেবকে খবর দিচ্ছি। তবে রবিবার তো, সাহেব কারো সঙ্গেই দেখা করেন না, আপনার সঙ্গেও দেখা করবেন কিনা জানি না।

—একটা কাগজ দাও, আমি আমার নাম লিখে দিচ্ছি—

সুশীল চক্রবর্তীর দিকে একটুকরো কাগজ এগিয়ে দিল বেয়ারা। সুশীল চক্রবর্তী কাগজটিতে নিজের নাম লিখে দিলেন। বেয়ারা কাগজটা নিয়ে চলে গেল।

বেশ বড় সাইজের একটি হলঘর, ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট পাতা, বেশ দামী, নরম পুরু কার্পেট। সুন্দরভাবে সাজানো ঘরটি, সোফা সেট, বুককেস, ডিভান, কাচের শো-

কেসে ইংরাজী বাংলা সব বই। দেওয়ালে দীপ্তেন ভৌমিকেরই একটি রঙীন বড় ফটো, জানালা দরজায় দামী পর্দা।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পরনে স্লিপিং পায়জামা ও গায়ে গাউন জড়ানো, মুখে সিগারেট, বের হয়ে এলেন দীপ্তেন ভৌমিক।

—আপনি মিঃ চক্রবর্তী? দীপ্তেন প্রশ্ন করল, কি প্রয়োজন আমার কাছে?

—বসুন, বলছি।

—একটু তাড়াতাড়ি সারতে হবে কিন্তু মিঃ চক্রবর্তী, আমাকে এখুনি আবার একটু বেরুতে হবে।

—হিন্দুস্থান রোডের মার্ডার কেসটার ব্যাপারে আপনাকে পুলিসের তরফ থেকে আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

—বলুন কি জিজ্ঞাস্য আছে।

—আপনার তো মালঞ্চ দেবীর সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল?

—হৃদ্যতা! Not at all, তবে চিনতাম তাকে।

—আমরা কিন্তু জেনেছি আপনি প্রায়ই হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যেতেন—

—প্রায়ই নয়, কখনো-সখনো যেতাম।

—ঘনিষ্ঠতা ছিল বলেই যে সেখানে আপনি যেতেন সেটা কিন্তু আমরা জেনেছি মিঃ ভৌমিক। শুধু সেখানেই নয়, দি রিট্রিট নাইট ক্লাবেও আপনি মালঞ্চ দেবীর সঙ্গে যেতেন। মিঃ ভৌমিক, বিভিন্ন সোর্স থেকে আমরা যথাসম্ভব খবরাখবর সংগ্রহ করেই আপনার কাছে এসেছি। অতএব বুঝতেই পারছেন, অস্বীকার করে কোন লাভ নেই!

সুশীল চক্রবর্তীর স্পষ্ট কথায় ও গলার স্বরে মনে হল দীপ্তেন ভৌমিক যেন একটু থমকেই গিয়েছে।

হঠাৎ শয়নঘরের দরজা খুলে গেল এবং অভিনেত্রী ডলি দত্ত ঘর থেকে বের হয়ে এলো। ডলি দত্তর সঙ্গে পূর্বেই কথাবার্তা হয়েছিল সুশীল চক্রবর্তীর, তাই ডলি দত্ত সুশীল চক্রবর্তীকে দেখে যেন একটু থমকে দাঁড়াল। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে দীপ্তেনের দিকে তাকিয়ে বললে, দীপ্তেন, যাচ্ছি—

—এসো—মৃদুকণ্ঠে দীপ্তেন বলল।

ঘরের মধ্যে একটা বিদেশী সেন্টের সৌরভ ছড়িয়ে ডলি দত্ত বের হয়ে গেল।

—বেশ স্বীকার করলাম না হয় ছিল, কিন্তু তাতে কি হয়েছে? দীপ্তেন বলল।

—সুরজিৎ ঘোষাল যে সেটা পছন্দ করতেন না তাও নিশ্চয় আপনার অজানা ছিল না?

—Don't talk about that old fool!

—কিন্তু সুরজিৎ ঘোষালেরই রক্ষিতা ছিলেন মালঞ্চ দেবী, আপনার ও মালঞ্চ দেবীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, বিশেষ করে তাঁর অবর্তমানে, সুরজিৎ ঘোষালের না পছন্দ হওয়াটাই স্বাভাবিক নয় কি?

—ওসব কথা ছাড়ুন মিঃ চক্রবর্তী, আমার কাছে কি জানতে চান বলুন?

—যে রাত্রে দুর্ঘটনাটা ঘটে সে রাত্রে আপনি মালঞ্চ দেবীর বাড়ি গিয়েছিলেন?

—সে তো আগেই বলেছি।

—হ্যাঁ, আপনি বলেছেন এবং আপনি এও বলেছেন যে সদর দিয়েই বের হয়ে এসেছিলেন আপনি!

—এখনও তাই বলছি, এবং বের হয়ে সোজা আমি ট্রেন ধরি।

—না, সে রাত্রে আপনি তখনই কলকাতা ছেড়ে যাননি, এবং সে রাত্রে আবারও আপনি হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে গিয়েছিলেন, I mean second time!

—What nonsense! কি সব আবোল-তাবোল বকছেন মিস্টার চক্রবর্তী?

—যথেষ্ট প্রমাণ হাতে না পেয়ে আপনাকে আমি কথাটা বলছি না মিঃ ভৌমিক। আপনাকে আর ডলি দত্তকে সেই রাত্রে বারোটা নাগাদ নাইট ক্লাব দি রিট্রিটে ড্রিংক করতে দেখা গিয়েছে।

—হতেই পারে না।

—বললাম তো, আমাদের হাতে তার প্রমাণ আছে। এবার বলুন মিঃ ভৌমিক, সেদিন সন্ধ্যারাত্রে মালঞ্চ দেবীর হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি থেকে বের হয়ে ঐ নাইট ক্লাবে যাবার আগে পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন? কি করেছিলেন?

—আমি নাইট শোতে সিনেমা গিয়েছিলাম।

—তাহলে সে রাত্রে আপনি কলকাতা ছেড়ে যাননি স্বীকার করছেন?

—হ্যাঁ, কলকাতাতেই ছিলাম।

—আপনি সেকেন্ড টাইম আবার হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে গিয়েছিলেন। বলুন কেন গিয়েছিলেন?

—দরকার ছিল।

—কি এমন দরকার পড়ল যে সেকেন্ড টাইম সেখানে যেতে হল মিঃ ভৌমিক?

—সেটা সম্পূর্ণ আমার পার্সোনাল ব্যাপার, ব্যক্তিগত।

—তা কখন গিয়েছিলেন? মানে ক'টা রাত্রি তখন? যদিও একটু আগে বললেন সিনেমায় গিয়েছিলাম!

—বই দেখতে আমার ভাল লাগছিল না, তাই ইন্টারভ্যালের আগেই বের হয়ে আসি সিনেমা হাউস থেকে।

—ট্যাক্সিতেই বোধহয় গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তখন রাত ক'টা হবে?

—পৌনে এগারোটা হবে। ঠিক সময় দেখিনি।

—আচ্ছা, মানদা বা রতন কেউই দ্বিতীয়বার আপনাকে সেখানে যেতে দেখেনি, তাহলে ধরতে হয় আপনি নিশ্চয়ই মেথরদের যাতায়াতের জন্য পিছনের সিঁড়ি পথে উঠে বাথরুমের দরজা দিয়েই গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—ওই দরজা দিয়ে আপনি মাঝে মধ্যে যেতেন তাহলে?

—যেতাম।

—ঘরে ঢুকে কি দেখলেন আপনি? মানে মালঞ্চ দেবী কি করছিলেন সে সময়?

—ঘরের দরজা বন্ধ করে চুপচাপ একটা সোফায় বসেছিল সে।

—তারপর?

—দশ মিনিটের মধ্যেই আমি আমার কাজ সেরে চলে আসি। পরে সেখান থেকে নাইট ক্লাবে যাই।

—মালঞ্চ দেবী তখন তাহলে জীবিত ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—মালঞ্চ দেবী যে একজন স্মাগলার ছিলেন আপনি জানেন?

—স্মাগলার! না তো? কে বললে? ইমপসিব্‌ল!

—হ্যাসিসের চোরাকারবার ছিল তাঁর, আপনি জানতেন না বলতে চান?

—না, বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমি জানতাম না। I never knew that she was a smuggler!

—হুঁ। তিনি কি পেথিডিন অ্যাডিক্টেড ছিলেন তাও জানতেন না বোধহয়?

—না তো!

—তাঁর সঙ্গে এতদিন ঘরে এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও ঐ দুটি সংবাদ আপনার অবিদিত ছিল মিঃ ভৌমিক, এটা কি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা হল? আপনি জানতেন, জানতেন কিন্তু এখন স্বীকার করছেন না। ঠিক আছে, আপনি ডাঃ সমীর রায়কে চেনেন নিশ্চয়ই?

—চিনি।

—তাঁরও সঙ্গে মালঞ্চ দেবীর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই না?

—ডাঃ রায় ওর ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ছিলেন এইটুকুই জানি, তার বেশী কিছু জানি না।

—আপনি কি ব্র্যান্ড সিগারেট খান?

—কেন বলুন তো?

—দেখি আপনার সিগারেট কেসটা—

দীপ্তেন ভৌমিক নাইট গাউনের পকেট থেকে একটা দামী সিগারেট কেস বের করে দিলেন সুশীল চক্রবর্তীর হাতে। কেসটা খুলে দেখলেন সুশীল চক্রবর্তী, স্মাগ্‌ল করা সিগারেট স্টেট এক্সপ্রেস ৫৫৫—এবং আরও একটা ব্যাপার নজরে পড়ল ভিতরের দিকে ডালার গায়ে এনগ্রেভ করে লেখা—To Dipten—Mala.

সিগারেট কেসটা ফেরত দিতে দিতে সুশীল চক্রবর্তী বললেন, এই মালাটি কে দীপ্তেনবাবু? Who is she?

—এটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার মিঃ চক্রবর্তী।

—আচ্ছা, আপনার সোনার সিগারেট কেস ছিল কি কখনো?

—না তো।

—আপনার পরিচিত জনেদের মধ্যে কারও ছিল বলে কি আপনার মনে পড়ে?

—ডাঃ রায়ের কাছে একটা সোনার সিগারেট কেস দেখেছি বলে মনে পড়ছে।

—তিনি কি ব্র্যান্ড সিগারেট খান?

pathagar.net

—সেম ব্র্যান্ড—State Express 555.

—ঠিক আছে, আর আপনার সময় নষ্ট করব না। তবে আপনাকে আবার আমাদের প্রয়োজন হতে পারে। কলকাতার বাইরে গেলে পুলিসের পারমিশন ছাড়া যাবেন না।

—ঠিক আছে।

—চলি। সুশীল চক্রবর্তী অতঃপর উঠে দাঁড়ালেন।

॥ তেরো ॥

মালঞ্চ হত্যারহস্য আরো ঘনীভূত হল এবং তার আভাস পাওয়া গেল দিন দুই পরে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে।

"শহরের কোন এক নামকরা ডাক্তার ও কোন এক কোম্পানির বড় অফিসারের ব্যাঙ্কের লকার থেকে প্রচুর গিনি ও কারেন্সী নোট পাওয়া গিয়েছে। যে অর্থের কোন বিশ্বাসযোগ্য এক্সপ্লানেশান ওই দুজনের একজনও দিতে পারেননি, ওঁরা দুজনেই নিহত মালঞ্চ দেবীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত ছিলেন।

আরো একটি সংবাদ—"মালঞ্চ দেবী পেথিডিনে অ্যাডিক্টেড ছিলেন। হিন্দুস্থান রোডের বাড়ির একটি তালাবন্ধ ঘরে তল্লাসী চালিয়ে পুলিস বহু টাকার নিষিদ্ধ নেশার বস্তু পেয়েছে। ঐ হত্যার ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিস মালঞ্চ দেবীর পেয়ারের দাসী মানদা দাসীকে গ্রেপ্তার করেছে।"

দিন দুই পরে আবার সংবাদ বেরুল কাগজে কাগজে—

"শহরের এক নামকরা অ্যাড্‌ভোকেট জগৎ চৌধুরী, মানদার জামিনের জন্য আদালতে আবেদন রেখেছিলেন কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউটার সদানন্দ মিত্র তার বিরোধিতা করেন। জজ আরো তদন্ত সাপেক্ষে মানদার জামিন অনুমোদন করেননি। তাকে জেলহাজতে রাখার নির্দেশ জারী করেছেন। সুরজিৎ ঘোষালের জামিনের প্রশ্ন নিয়ে জজসাহেব বিবেচনা করবেন আগামী মঙ্গলবার।"

ঐদিনই সন্ধ্যার দিকে সোমনাথ ভাদুড়ী তাঁর চেয়ারে বসে কিরীটীর সঙ্গে ঐ মামলার ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করছিলেন।

কিরীটী বলছিল, মানদা যে অনেক কিছুই জানে ভাদুড়ী মশাই, সেটা অনুমান করেই আমি সুশীলকে পরামর্শ দিয়েছিলাম ওকে গ্রেপ্তার করতে।

—আমারও মনে হয় কাজটা ভালই হয়েছে রায়মশাই, আপনার কাছে যা শুনলাম, তাতে মনে হচ্ছে, হত্যাকারীকে নানাভাবে ঐ মানদার সাহায্য নিতে হয়েছে। কিন্তু মানদার জামিনের ব্যাপারে আমাদের জগৎ চৌধুরীকে কে ব্রিফ দিয়েছেন সেটাই বুঝতে পারছি না।

—যার বেশী interest নিঃসন্দেহে সে-ই দিয়েছে—কিরীটী মৃদু হেসে বলল।

—কিন্তু কে সে? কাকে আপনার সন্দেহ হয় বলুন তো?

—সন্দেহ যার ওপরেই হোক, একটা ব্যাপারে আমি কিন্তু নিশ্চিত হয়েছি ভাদুড়ী মশাই—কিরীটী বলল, মানদা অনেক কিছুই জানে আর তাই বোধহয় আমার অনুমান,

হত্যাকারী মানদার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে জানে না ঐ রকমের চরিত্রের এক মেয়েমানুষকে বিশ্বাস করে কত বড় ভুল সে করেছে। এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো মানদার হাত দিয়েই ফাঁসির দড়িটা তার গলায় এঁটে বসবে।

—আপনিই তো একটু আগে বলেছিলেন রায়মশাই, সুশান্ত মল্লিক নাকি ঐ মানদা সম্পর্কে বলেছিল, she is a dangerous woman!

—হ্যাঁ, বলেছিল, কিন্তু you can't count much upon him! একটা মেরুদণ্ডহীন মাতাল—নিজের স্ত্রীকে অন্যের রক্ষিতা জেনেও তারই আশ্রয়ে যে পড়ে থাকে এবং তারই টাকায় নেশা করে, আর যাই হোক তাকে বোধহয় পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না।

—আচ্ছা রায়মশাই, ঐ চিত্রাভিনেত্রীটিকে আপনার কি রকম মনে হয়?

—গোলমালটা হয়তো সেখানেও থাকতে পারে ভাদুড়ি মশাই।

—হ্যাঁ, এটা তো বুঝতে পারা গিয়েছে দীপ্তেন ভৌমিককে মালঞ্চ ভালবাসত, তাই হয়তো সে ডলি দত্তর প্রতি দীপ্তেনের আকর্ষণটা ভাল চোখে দেখত না। এবং ডলি দত্তও মালঞ্চকে অনুরূপ সুনজরে দেখত না। ফলে সম্ভবত পরস্পরের প্রতি একটা jealousy হয়তো দেখা দিয়েছিল দীপ্তেন ভৌমিককে ঘিরে। আর কে বলতে পারে, সেই ঈর্ষাকে মন্থন করেই হয়তো হলাহল উঠে এসেছিল, যে হলাহল মালঞ্চর মৃত্যু ঘটিয়েছে।

—আর ঐ ডাক্তারটি?

—আমার যতদূর মনে হয় সে ভদ্রলোকও চোরাকারবারে একজন অংশীদার, এবং সেক্ষেত্রে ঐ মাকড়শার জালে তাঁরও জড়িয়ে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক।

—আচ্ছা রায়মশাই, আপনার কি মনে হয় মালঞ্চর স্বামী সুশান্ত মল্লিকও ঐ চোরাকারবারে—

—অংশীদার সে হয়তো ঐ চোরাকারবারে ছিল না—আর সেটা সম্ভবও নয়।

—কেন?

—আর যাই করুক না কেন মালঞ্চ, ঐ আশ্রিত ও পোষ্য স্বামীকে যে তার চোরা-কারবারের মধ্যে নেবে—সেটা সম্ভব নয়। তবে একই বাড়িতে যখন ছিল লোকটা তখন তার পক্ষে ব্যাপারটা অনুমান করা এমন কিছু অসম্ভব নয়।

—আচ্ছা রায়মশাই, আপনার কি মনে হয় আমার ক্লায়েন্ট সুরজিৎ ঘোষাল ঐ চোরাকারবারের মধ্যে ছিল?

—মনে হয় না চোরাকারবারের সঙ্গে তার কোন যোগ ছিল। তবে জোর করে কিছুই এই মুহূর্তে বলা যায় না ভাদুড়ী মশাই।

—বাঁচালেন। আমারও তাই ধারণা রায়মশাই।

কিরীটী মৃদু হাসল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, মালঞ্চর মৃত্যুর কারণ দুটোই হতে পারে—হয় ঈর্ষার হলাহল নতুবা চোরা-কারবারের বিষময় পরিণাম।

ভাদুড়ী বললেন, সত্যি রায়মশাই, আজকের সমাজের মানুষগুলো কি ভাবে যে বদলে যাচ্ছে দিনকে দিন, মরাল বা নীতির কোন বালাই নেই।

—কোথা থেকে থাকবে ভাদুড়িমশাই, আজকের জীবনযাত্রা এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে কেবল ছুটবার নেশা এসেছে। একটা অস্থিরতা, আর সেই অস্থিরতার

জন্যেই তারা তৃপ্তির অনুসন্ধান করছে মদ, মেয়েমানুষ, ঘোড়দৌড়, চোরা-কারবার আর কালো টাকা জমানোর মধ্যে। ঐ মালঞ্চ মেয়েটির দিকেই তাকিয়ে দেখুন না, স্বামী থাকতেও সে আর একজনের রক্ষিতা হয়েছিল! কিন্তু হতভাগিনী জানত না, লালসা লালসাকেই বাড়িয়ে তোলে, ওর মধ্যে তৃপ্তি নেই, আছে কেবল একটা প্রচণ্ড অস্থিরতা। সেই অস্থিরতার বিষই আজ আনছে হত্যা ধর্ষণ চোরা-কারবার আর কালো টাকার নেশা। আচ্ছা, রাত অনেক হলো, এবার উঠি ভাদুড়ীমশাই—কিরীটী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

লেক রোডে দীপ্তেনের ফ্ল্যাটে তার শোবার ঘরে মুখোমুখি বসে ছিল দীপ্তেন আর ডলি দত্ত।

তারা জানত না যে তারা যে সব কথা বলছে, সব কিছু একটা অদৃশ্য শক্তিশালী মাইক্রোফোনের সাহায্যে টেপ হয়ে যাচ্ছে।

কিরীটীর পরামর্শেই ব্যবস্থাটা ডি.সি. ডি.ডি. চট্টরাজ করেছিলেন দীপ্তেনের গৃহভৃত্য বামাপদকে হাত করে। দীপ্তেনের গৃহভৃত্য বামাপদকে পুলিসের হাত করতে কষ্ট হয়নি।

বামাপদ বৎসরখানেক হল দীপ্তেনের কাছে কাজ করছে।

বয়স অল্প, বছর বত্রিশ-তেত্রিশ হবে। কালো মতন রোগা চেহারা, কিন্তু বোঝা যায় বেশ চালাকচতুর? সুশীল চক্রবর্তীর কথায় সেটা বুঝতে পেরেই কিরীটী বামাপদকে পুলিসের দলে টানতে পেরেছিল।

ব্যাচিলার মানুষ দীপ্তেন, বামাপদ ছিল তার একাধারে কুক এবং সার্ভেন্ট, আবার কেয়ারটেকারও বটে। বামাপদকে পেয়ে দীপ্তেন নিশ্চিত ছিল।

বামাপদকে আলাদা ভাবে জেরা করে সুশীল চক্রবর্তী থানায় নিয়ে এসে অনেক কথাই দীপ্তেন সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন।

ডলি দত্ত যে ইদানীং প্রায় প্রতি রাত্রেই দীপ্তেনের ফ্ল্যাটে আসে, তারপর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে যায়, সে কথা বামাপদর কাছ থেকেই সুশীল চক্রবর্তী প্রথম জানতে পেরেছিলেন। এবং বামাপদর কাছ থেকেই আরো শুনেছিলেন মালঞ্চ দেবী আগে প্রায়ই আসত দীপ্তেনের ফ্ল্যাটে, তবে ইদানীং কেন যেন সে বড় একটা আসত না।

তারপর একদিন সুশীল চক্রবর্তী দীপ্তেন ভৌমিকের অনুপস্থিতিতে তার ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

সুশীল বলেছিলেন, শোন বামাপদ, পুলিসকে যদি তুমি সাহায্য না কর পুলিস তোমাকে গ্রেপ্তার করে চালান দেবে। পুলিস সংবাদ পেয়েছে তোমার বাবুর সঙ্গে তুমি চোরাকারবার কর।

—দোহাই হুজুর, বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানি না—

—জানি না বললেই তো আর তোমাকে পুলিস ছেড়ে কথা বলবে না বামাপদ!

বামাপদ হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল। বলেছিল, বিশ্বাস করুন হুজুর, আমি কিছুই জানি না।

—ঠিক আছে, তুমি পুলিসকে যদি সাহায্য কর—তবে আমি তোমাকে বাঁচাব—

—বলুন হুজুর কি করতে হবে—আমি সব কিছু করব আপনার হুকুমমত।

—বেশ, তাহলে আগে কয়েকটা কথার জবাব দাও আমার।

—বলুন হুজুর।

—তোমার বাবুর ঘরে একটি মেয়ে আসত?

—কার কথা বলছেন হুজুর, সেই যে সিনেমায় নামে?

—না, সে নয়, আর একজন, মালঞ্চ তার নাম—

—মালা দিদিমণি? কিন্তু তিনি তো অনেকদিন আর এখানে আসেন না।

—আসবেন কি করে, তিনি কি আর বেঁচে আছেন, তাঁকে খুন করা হয়েছে।

—খুন! কি বলছেন হুজুর?

—হ্যাঁ, তাঁকে খুন করা হয়েছে।

—হুজুর, আপনারা কি আমার বাবুকে সন্দেহ করছেন? আমি হলফ করে বলতে পারি হুজুর, আমার বাবু ঐ দিদিমণিকে খুন করেননি।

—কি করে বুঝলে যে তোমার বাবু—

—কি বলছেন হুজুর, ঐ দিদিমণিকে আমার বাবু খুব ভালবাসতেন। আর দিদিমণিও বাবুকে—

—জানি বামাপদ, সেইজন্যই তো আসল লোককে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আর আমাদের ধারণা সেই লোকটা তোমার বাবুর কাছে আসা-যাওয়া করে। হ্যাঁ, তাকে আমরা ধরতে চাই, আর তাতে তোমার সাহায্য চাই আমরা।

—নিশ্চয় হুজুর আমি আপনাদের সাহায্য করব, আমাকে কি করতে হবে বলুন।

—বেশী কিছু না, তোমার বাবুর বসবার আর শোবার ঘর আমরা একটু দেখব, যদি সে লোকটার কোন হদিস পাই!

—বেশ তো বাবু, দেখুন।

—হ্যাঁ দেখছি, কিন্তু আমি একা একা দেখব, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে না।

—ঠিক আছে, আমি দাঁড়াচ্ছি।

সুশীল চক্রবর্তী ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে একটা ভারী সোফার নীচে মাইক্রোফোন আর ছোট টেপ রেকর্ডারটা ফিট করে মিনিট কুড়ি বাদে ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে এলেন।

—দেখলেন হুজুর?

—হ্যাঁ, পাঁচ-সাতদিন বাদে আবার আসব, তুমি কিন্তু তোমার বাবুকে একেবারেই বলবে না যে আমি এখানে এসেছিলাম। তোমার বাবু জানতে পারলে যদি বেফাঁস কথাটা বলে ফেলেন তাহলে সে সাবধান হয়ে যাবে, বুঝেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুশীল ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে এসেছিলেন।

॥ চোদ্দ ॥

দীপ্তেন ভৌমিক বলছিল, আমি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি ডলি। ইউরোপ—

—আমাকে সঙ্গে নেবে দীপু?

—তোমাকে! না বাবা, ওসবের মধ্যে আমি আর নেই, শেষটায় জীবন দত্ত আমার নামে কেস ঠুকে দিক আর কি। একে সুরজিৎ ঘোষালের ঝামেলায় নাস্তানাবুদ হচ্ছি—

—কেন, পুলিস তোমাকে মালঞ্চ-হত্যার ব্যাপারে খুব নাস্তানাবুদ করছে বুঝি?

—আর বল কেন—

—তুমি তো আমার কথা শোননি। কতবার বলেছি ওর সঙ্গে মিশো না অত, তা তুমি রোজই ওখানে যেতে—

—শুধু আমি কেন, তুমি যেতে না? ডাঃ সমীর রায় যেতেন না?

—তা তো সকলেই যেতাম। কিন্তু তোমার সঙ্গে মালঞ্চর ঘনিষ্ঠতা ছিল—।

—বাজে বকো না। একটা ক্যারেক্টারলেস উওম্যান—

—তার জন্যেই তো তুমি হেদিয়ে মরতে দীপ্তেন।

—She was a fool! সে ভাবত আমি বুঝি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছি, কিন্তু মোটেই তা নয়, আমি তাকে ঘৃণা করতাম।

—বাজে কথা বলো না। আমি জানি দীপ্তেন।

—কি জানো?

—সেরাত্রে দু-দুবার গিয়েছিলে তুমি মালঞ্চর ঘরে—

—তুমি জানো?

—আমি জানি। মনে আছে, সেরাত্রে আমাকে নিয়ে তোমার দি রিট্রিটে ডিনার খাবার কথা ছিল, অথচ রাত সোয়া এগারোটা পর্যন্ত যখন তুমি এলে না—

—তুমি বিশ্বাস কর—আমি একটা বিশেষ কাজে আটকা পড়েছিলাম।

—তাও জানি বৈকি, আর সেই বিশেষ কাজে মালঞ্চর বাড়িতেই যে আটকা পড়েছ তাই ভেবেই তো আমি মালঞ্চর বাড়ি যাই—

—তুমি—তুমি মালঞ্চর বাড়িতে গিয়েছিলে ডলি!

—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। রাত তখন প্রায় পৌনে বারোটা হবে। তুমি আমায় দেখনি, আমি যখন পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে বাথরুমের মধ্যে দিয়ে মালঞ্চর ঘরে গিয়ে ঢুকি, তখন she was dead!

—কি বলছ তুমি ডলি!

—হ্যাঁ, তার গলায় রুমালের ফাঁস লাগানো ছিল, and she was dead, আর যে চেয়ারটায় সে বসেছিল তারই সামনে, অল্প দূরে মালঞ্চর শয্যার ওপরে তোমার এই সিগারেট কেসটা আমি পাই। দেখ, চিনতে পারছ এই নাম এনগ্রেভ করা সোনার সিগারেট কেসটা? এটা বছর কয়েক আগে আমিই তোমার জন্মদিনে তোমাকে প্রেজেন্ট করেছিলাম। তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম দীপ্তেন—

—কি—কি তুমি বুঝতে পেরেছিলে?

—তুমি কিছুক্ষণ আগেও সেখানে ছিলে। রাত সাড়ে দশটায় তুমি আমাকে তোমার এই ঘর থেকে ফোন করেছিলে আধ ঘণ্টার মধ্যে তুমি ক্লাবে যাচ্ছ, আমি যেন সেখানেই চলে যাই। আমি চলে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার আগে রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ একবার তোমার বাড়িতে ফোন করে আমি তোমার চাকর বামাপদর কাছ থেকে জেনেছিলাম যে তুমি হিন্দুস্থান রোডে গিয়েছ। বলে গিয়েছ, তুমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবে।

—কিন্তু ডলি—

—শোন, আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। আমি সোয়া এগারোটা পর্যন্ত ক্লাবে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে প্রথমে এখানে আসি, এসে শুনলাম সাড়ে ন'টা নাগাদ তুমি এসে আবার বের হয়ে গিয়েছ। তোমার এখান থেকে ট্যাক্সিতে দি রিট্রিট মাত্র পনেরো মিনিটের রাস্তা, কাজেই ক্লাবে গেলে তোমার ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল—

—আমার অন্য জায়গায় কাজ ছিল, তাই—

—সে কাজ তোমার মালঞ্চর ওখানেই ছিল। সেই রকম সন্দেহ হওয়ায় আমি গাড়ি নিয়ে সেখানেই যাই। একটু দূরে গাড়িটা পার্ক করে পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে মালঞ্চর ঘরে যাই। এখন বুঝতে পারছ, তুমি যে সেরাত্রে দু'বার মালঞ্চর ঘরে গিয়েছিলে কি করে আমি বুঝেছিলাম।

—কিন্তু তুমি—তুমি বিশ্বাস কর ডলি, আমি মালঞ্চকে হত্যা করিনি—

—কিন্তু তোমার এই সিগ্রেট কেস সেখানে কি করে গেল দীপ্তেন! আমি যদি পুলিসকে এটা জানিয়ে দিই, তাদের তুমি কি বলে বোঝাবে?

—শোন, তাহলে সব কথাই তোমাকে বলছি। সেরাত্রে দ্বিতীয়বার বিশেষ একটা কারণে মালঞ্চর ঘরে আমাকে যেতে হয়। সেরাত্রে সাড়ে দশটা নাগাদ আমার ফ্ল্যাটে তার আসার কথা ছিল, কিন্তু সোয়া এগারোটা নাগাদও যখন সে এলো না, তখন আমি দ্বিতীয়বার তার ওখানে যাই—

—So you did! তুমি দ্বিতীয়বার ওখানে গিয়েছিলে, স্বীকার করছ দীপ্তেন?

—হ্যাঁ গিয়েছিলাম, but she was dead at that time, বিশ্বাস কর, I found her dead, strangled, রুমাল বাঁধা তার গলায়, ঘটনার আকস্মিকতায় I was so much perturbed যে আমি ধপ করে বিছানাটার ওপরে বসে পড়ি, now what to do! আর ঠিক সেই সময়ে ঘোরানো সিঁড়িতে আমি কার যেন পদশব্দ পাই, পাছে কেউ এসে আমাকে ঐ সময় ঘরের মধ্যে দেখতে পায় সেই ভয়ে আমি খাটের নীচে ঢুকে পড়ি।

—A nice story—বল—বলে যাও।

—Story! It's a fact, সত্যি। তুমি ঘরে এলে, মালঞ্চকে মৃত দেখে তুমি অর্ধস্ফুট গলায় চেঁচিয়ে উঠলে, তারপরেই বের হয়ে গেলে ঘর থেকে, যে পথে এসেছিলে সেই পথে। আমিও সেই পথে তোমার পিছু পিছু বের হয়ে আসি। তারপর সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে রাত বারোটার দু'চার মিনিট আগে ক্লাবে যাই, তুমি তখন সেখানে বসে ড্রিংক করছিলে। বিশ্বাস কর ডলি, আমি তোমাকে যা বললাম তার একবর্ণও মিথ্যা নয়। কি

হল, উঠছ কেন—ডলি, সত্যিই কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না, ডলি শোন—

টেপটা বাজিয়ে শুনছিলেন মিঃ চট্টরাজ, কিরীটী ও সুশীল চক্রবর্তী—লালবাজারে মিঃ চট্টরাজের অফিস কামরায়।

—শুনলেন তো সব মিঃ চট্টরাজ, কিরীটী বলল, এ থেকে অন্তত দুটো ব্যাপার প্রমাণিত হচ্ছে—প্রথমত, সোয়া এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যেই কোন এক সময় মালঞ্চ দেবীকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়। আর দ্বিতীয়ত, সেরাত্রে সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা বা পৌনে বারোটা পর্যন্ত দীপ্তেন ভৌমিকের movement suspicious, ঐ সময়টা ওকে ঘিরে একটা সন্দেহের কুয়াসা জমাট বেঁধে আছে।

—আপনি কি মনে করেন মিঃ রায়, চট্টরাজের প্রশ্ন, ঐ দীপ্তেন ভৌমিক ডলি দত্তর কাছে মিথ্যা কথা বলেছে?

—শুধু সে কেন, ডলি দত্তও মিথ্যা বলে থাকতে পারে। যাক্ গে সে কথা আমার মনে হচ্ছে আমি যেন অন্ধকারের মধ্যে আলোর ইশারা দেখতে পাচ্ছি একটু।

—কি রকম?

—দেখা যাচ্ছে সেরাত্রে অকুস্থলে প্রথমে সুরজিৎ ঘোষালের আবির্ভাব ও নাটকীয় ভাবে প্রস্থান, তার আগে দীপ্তেন ভৌমিকের প্রথম আবির্ভাব ও পরে রাত্রি সোয়া এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে দ্বিতীয়বার আবির্ভাব ঘটেছিল, ঐ সময়েই আবির্ভাব ঘটেছিল আরো একজনের, যেটা আমরা শুনেছি একটু আগে টেপ থেকে, শ্রীমতী ডলি দত্তর এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দ্বিতীয়বার দীপ্তেন ভৌমিক ও ডলি দত্তর আবির্ভাব ঘোরানো সিঁড়ির পথে। এখন আমাদের দেখতে হবে সে রাত্রে ঘোরানো সিঁড়িপথে ঐ তিনজন ছাড়া আর কার ঐ ঘরে আবির্ভাব ঘটেছিল। এবং আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো জানবেন that is the person we are searching for, তাকেই আমরা খুঁজছি, মালঞ্চ হত্যারহস্যের মেঘনাদ।

—ঐ তিনজন ছাড়া সেরাত্রে ঐ ঘরে আর কে যেতে পারে বলে আপনার মনে হয় দাদা? হঠাৎ সুশীল চক্রবর্তী কিরীটীকে প্রশ্নটা করলেন।

কিরীটী সুশীল চক্রবর্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কী মনে হয় সুশীল, who else—সুরজিৎ ঘোষাল?

—না, তিনি যাননি। তুমি নিশ্চিন্ত মনে তোমার ঐ তালিকা থেকে তাঁকে বাদ দিতে পারো! দেখ সুশীল, সাধারণ কমন সেন্স অনুযায়ী ভেবে দেখ—সেটা সুরজিৎ ঘোষালের রক্ষিতার ঘর, এবং মালঞ্চ সুরজিৎ ঘোষালেরই রক্ষিতা ছিল। সেক্ষেত্রে নিজের রক্ষিতাকে হত্যা করার প্রয়োজন হলে প্রথমত ঐ রকম crude ভাবে তিনি মালঞ্চকে হত্যা করতেন না এবং দ্বিতীয়ত সেজন্য নিজের রুমালটা তিনি নিশ্চয়ই ব্যবহার করতেন না, অন্যতম exhibit হিসাবে যেটি আদালতে পেশ করা যেতে পারে। তৃতীয়ত এবং lastly, ঐ ধরনের একটা কাজ সুরজিৎ ঘোষালের মত একজনকে দিয়ে সম্ভব হতে পারে বলে মন আমার সায় দেয় না। না, তুমি অন্য কাউকে ভাবো—

—তবে কি ঐ ডাঃ সমীর রায়?

সুশীল চক্রবর্তীর কথা শেষ হল না, তাকে একপ্রকার **বাধা দিয়েই কিরীটী বললে, he**

pathagar.net

is a doctor, মানুষকে হত্যা করবার অনেক উপায় জানা আছে তার, সুতরাং একজনকে ঐ ভাবে গলায় ফাঁস দিয়ে সে মারবে না।

—তবে কি ডলি দত্ত?

—হতে পারে। She had a strong motive also, তার দিক থেকে motive ও provocation দুই-ই ছিল—তারপরই হঠাৎ উঠে দাঁড়াল কিরীটী।—মিঃ চট্টরাজ, আমি চলি; সুশীল তুমি যেমন এগোচ্ছিলে এগিয়ে যাও, ব্যাপারটা আদৌ খুব একটা জটিল কিছু নয়—

কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আদালত কারোরই জামিন দেয়নি।

তদন্তসাপেক্ষে সুরজিৎ ঘোষাল ও মানদাকে জেলহাজতে থাকার নির্দেশ দিয়েছে আদালত এবং পরবর্তী শুনানীর তারিখ পড়েছে আবার দশদিন পরে।

সোমনাথ ভাদুড়ীর চেম্বারে বসে কিরীটীর সঙ্গে সোমনাথ ভাদুড়ীর আলোচনা হচ্ছিল মালঞ্চ হত্যা-মামলা নিয়েই।

সোমনাথ বলছিলেন, রায়মশাই, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না, দীপ্তেন ভৌমিক আর ডলি দত্তকে কেন আপনি সুশীল চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করবার পরামর্শ দিচ্ছেন না।

—প্রথমত, ওদের গ্রেপ্তার করলে উপযুক্ত প্রমাণ ও তথ্যাদির অভাবে ওদের আপনি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবেন না।

—কিন্তু ঐ টেপটা—

—ওতে কেবল প্রমাণ করতে পারবেন দুর্ঘটনার দিন রাত্রে আগে ও পরে দীপ্তেন ভৌমিক দু'বার হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে গিয়েছিল আর ডলি দত্ত একবার গিয়েছিল—তার দ্বারা প্রমাণ হবে না তারাই দুজন অথবা দুজনের একজন হত্যাকারী। ওদের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে চোরাকারবারী বলে চিহ্নিত করে, এবং তারপর ঐ চোরাকারবারকে কেন্দ্র করে হত্যার ব্যাপারে আপনি আসতে পারবেন বটে, কিন্তু তখনো ঐ একই কথা থেকে যায়, প্রমাণ কই।

—আমার কিন্তু ওদের দুটিকেই সন্দেহ হয়, হত্যারহস্যের সঙ্গে ওরাও লিপ্ত।

—সেটা হতে পারে একমাত্র যদি প্রমাণ করা যায় যে ঐ চোরা-কারবারকে কেন্দ্র করেই ঐ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

—সেটা কি আদালতে প্রমাণ করা যাবে না?

—সবটা আপনার জেরার উপর নির্ভর করছে। কিন্তু একটা কথা তো আমাদের ভুললে চলবে না ভাদুড়ীমশাই, দীপ্তেন ভৌমিক, ডাঃ সমীর রায় এবং ডলি দত্ত—কাউকেই এখনও আমরা চোরাকারবারী বলে প্রমাণ করবার মত উপযুক্ত তথ্যাদি পাইনি।

—আচ্ছা রায়মশাই, আপনি সুশান্ত মল্লিককে একেবারে বাদ দিচ্ছেন কেন?

—না, বাদ দিইনি। বরং বলতে পারেন আমার একটি চোখ সর্বক্ষণ তার ওপরে রয়েছে। যেহেতু তার দিক থেকে হত্যার মোটিভ অত্যন্ত strong ছিল, তেমনি তার দিক থেকে possibilityও যথেষ্ট ছিল, সর্বশেষে ওর একটা strong alibi রয়েছে—হত্যার

দু'দিন আগে থাকতে ভদ্রলোক হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতেই ছিলেন না, পুনরায় আবির্ভাব হয় তাঁর হত্যার পরদিন সকালে রীতিমত নাটকীয় ভাবে—

—লোকটা এখন হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতেই আছে, তাই না রায়মশাই?

মৃদুহেসে কিরীটী বললে, যাবেই বা কোথায়, তার কোন আস্তানা নেই, সংস্থান নেই, দু'মুঠো পেটের ভাতের, নেই কোন ভবিষ্যৎ, completely wrecked!

॥ পনেরো ॥

সোমনাথ ভাদুড়ীর ওখান থেকে ফিরতে বেশ রাতই হয়ে গিয়েছিল কিরীটীর, প্রায় পৌনে এগারোটায় ঘরে ঢুকেই থমকে পড়ে কিরীটী—একটা চেয়ারে বসে ডাঃ সমীর রায়—

—কি ব্যাপার ডাঃ রায়, কতক্ষণ?

—তা প্রায় ঘণ্টা দেড়েক তো হবেই।

—কিন্তু বাড়ির সামনে আপনার গাড়ি তো দেখলাম না—

—না, আমি গাড়ি নিয়ে আসিনি, ট্যাক্সিতে এসেছি—ম্লান কণ্ঠে বললেন ডাঃ রায়, আমি আপনার সঙ্গে বিশেষ কারণে দেখা করতে এসেছি কিরীটীবাবু।

—বলুন—

—যা আমি পুলিসের কাছে বলতে পারিনি তা আপনার কাছে বলব।

—বেশ তো, যা বলবার বলুন। আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার বা সাহায্য করা সম্ভব হয় নিশ্চয়ই করব।

—মিঃ রায়, আপনি নিশ্চয় বুঝবেন, মালঞ্চর হত্যা-মামলার সঙ্গে আজ যদি আমার নামটা জড়িয়ে পড়ে, তাহলে আমার পক্ষে আর এ শহরে বাস করা সম্ভব হবে না। তারপর একটু থেমে বললেন, আজ সকালে আমার বাড়ি ইনকাম ট্যাক্সের লোকেরা raid করেছে এবং সেটা যে পুলিসেরই নির্দেশে, তাও আমি বুঝতে পেরেছি। সেজন্যে অবশ্য আমি ডরাই না, ইনকাম করে tax হয়তো পুরোপুরি দিইনি, তার জন্যে হয়তো punishment হবে, তা হোক, কিন্তু ঐ scandal-এর সঙ্গে আমার নাম জড়ালে my future will be doomed! তাই ভেবে দেখলাম, আপনাকে সব কথা খুলে বলাই ভাল।

—তা বলুন না—

—মালঞ্চর সঙ্গে পেসেন্ট আর ডাক্তারের সম্পর্ক ছাড়াও অন্য সম্পর্ক ছিল আমার—বললে শুরু করলেন সমীর রায়, কিন্তু বিশ্বাস করুন, সে সম্পর্কটা কোন ভালবাসা বা প্রেমের সম্পর্ক নয়, she had a tremendous sex, প্রচণ্ড একটা যৌন আবেদন ছিল মালঞ্চর আর বলতে সংকোচ করব না, তাতেই আমি trapped হয়েছিলাম। প্রায়ই রাত বারোটার পর আমি লুকিয়ে লুকিয়ে হিন্দুস্থান রোডে ওর বাড়িতে যেতাম, তারপর পিছনের লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যেতাম। বুঝতে পারতাম কি জঘন্য নেশায় আমি জড়িয়ে পড়েছি, but I could'nt get out of it! হত্যার রাত্রে ক্লাব থেকে বের হয়ে সোজা আমি হিন্দুস্থান রোডে মালঞ্চর বাড়িতে যাই—

—রাত তখন ক'টা হবে ডাঃ রায়?

—ঠিক মনে নেই, তবে round-about সাড়ে বারোটা পৌনে একটা হবে, যে পথে আমি রোজ যাই সেই পথেই ওপরে গেলাম—

—বাথরুমের দরজাটা খোলাই পেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তারপর?

—বাথরুম অন্ধকার ছিল, চেনা পথ, ঘরে পা দিয়ে দেখি ঘরও অন্ধকার—

—পরের দিন সকালে দরজা ভেঙে কিন্তু সুশীল চক্রবর্তী ঘরের আলোটা জ্বলছিল দেখতে পায়—

—আমি ঘরের আলোটা জ্বালাই এবং জ্বালাতেই দেখলাম মালঞ্চ চেয়ারে বসে আছে আর তার গলায় ফাঁস, বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি she was dead! বুঝতেই পারছেন আমার তখনকার মনের অবস্থা, কি ভাবে যে ঘর থেকে বের হয়ে বাথরুমে ঢুকেছি জানি না—তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটতে ছুটতে এসে গাড়িতে স্টার্ট দিতে গিয়ে দেখি সদরে একজন দাঁড়িয়ে আছে—

—কে সে?

—জানি না, ভাল করে তাকাইনি, তবে সে যে আমায় ছুটে গাড়িতে গিয়ে উঠতে দেখেছিল সেটা ঠিকই—

—দরজার কাছে যে দাঁড়িয়ে ছিল সে পুরুষ না নারী?

—পুরুষ।

মনে হল কিরীটী যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে কি বুঝি ভাবছে—

—রাত সোয়া বারোটার সময়ও বাথরুমের দরজাটা তাহলে খোলাই ছিল—পরে someone সেটা বন্ধ করে দিয়েছিল, আশ্চর্য, কথাটা আমার মাথায় আগে আসেনি কেন, —কিরীটী কথাগুলো যেন কতকটা আত্মগতভাবে বলে।

—কিছু বলছেন, কিরীটীবাবু?

—একটা চাবির কথা ভাবছি।

—চাবি!

—হ্যাঁ, মালঞ্চর শয়নকক্ষে ইয়েল লকের ডুপলিকেট চাবিটার কথা ভাবছি ডাঃ রায়। সেটাও ছিল সুরজিৎ ঘোষালের কাছে?

—হ্যাঁ, তার কাছেই থাকত সেটা।

—ঠিক আছে ডাঃ রায়, আপনি এখন বাড়ি যান।

পরের দিনই কিরীটী চট্টরাজকে সঙ্গে নিয়ে হাজতে গেল সুরজিৎ ঘোষালের সঙ্গে দেখা করতে। দেখা গেল সুরজিৎ ঘোষাল একটা খাটিয়ার ওপর বসে আছেন। প্রচণ্ড গরম ঘরটার মধ্যে, ঘামছিলেন সুরজিৎ ঘোষাল। এই কয়দিনেই তাঁর চেহারার যেন অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।

—মিঃ ঘোষাল—

কিরীটীর ডাকে সুরজিৎ ঘোষাল বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলে তাকালেন।

pathagar.net

—হিন্দুস্থান রোডের বাড়ির সদরের আর মালঞ্চর ঘরের ইয়েল লকের ডুপলিকেট চাবি দুটো আপনার কাছেই থাকত না?

—হ্যাঁ। কিন্তু যে চাবির রিংয়ে ঐ চাবি দুটো ছিল, সেটা ঐ ঘটনার দিন সাতেক আগে হারিয়ে যায়—

—কি করে হারাল?

—জানি না। আমার মনে হয়, যাতে আমি যখন-তখন সেখানে না যেতে পারি, surprise visit না দিতে পারি সেইজন্যে মালঞ্চই রিংটা সরিয়েছিল।

—কেন আপনি surprise visit দিতেন?

—আগে কখনো দিতাম না, দেবার প্রয়োজনও বোধ করিনি। কিন্তু মানদার কাছ থেকে যখন জানতে পারলাম আমি চলে আসার পর প্রায়ই রাতে মালঞ্চর ঘরে দীপ্তেন ভৌমিক আসে, তখন আমি দু'চারবার surprise visit দিয়েছি।

—আচ্ছা, আপনি কোনদিন কি দীপ্তেন ভৌমিককে মালঞ্চর ঘরে পেয়েছেন?

—না, কিন্তু আমি দু'রাত্রে অন্তত টের পেয়েছি, তার ঘরে লোক ছিল—কথাবার্তা শুনেছি, ঘরে আলো জ্বলতে দেখেছি। কিন্তু নিঃশব্দে তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখেছি ঘরের আলো নেভানো—মালঞ্চ ঘুমোচ্ছে।

কিরীটী মৃদু হেসে বলল, চোরের ওপর বাটপাড়ি—

—আপনি কি বলতে চান, তাহলে—

—হ্যাঁ, আপনার আসার আগেই তার কাছে সংবাদ পৌঁছে যেত যে আপনি আসছেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের লোক বাথরুম-পথে পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে সট্‌কে পড়ত, আপনি তাই কোনদিনই পাখিকে খাঁচার মধ্যে দেখেননি।

—কি বলছেন মিঃ রায়!

—If I am not wrong মিঃ ঘোষাল, ঐ মানদাই দু'পক্ষের কাছ থেকে টাকা খেয়ে দু'পক্ষের দৌত্যগিরি করত—

—মানদা! মানদার এই কাজ!

—আচ্ছা মিস্টার ঘোষাল, আপনিই কি ডাঃ সমীর রায়কে ঐ বাড়িতে প্রথম নিয়ে যান?

—হ্যাঁ, ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। মাঝে মধ্যে মালঞ্চর পেটে প্রচণ্ড কলিক হত, তাই আমি একবার ডাঃ রায়কে ডেকে আনি, ডাঃ রায় তাকে তখন পেথিডিন ইনজেকশন দেন, ক্রমশ সেই পেথিডিনে মালঞ্চ অ্যাডিক্টেড হয়ে যায়—

—আপনি তাহলে পেথিডিনের ব্যাপারটা জানতেন?

—জানতাম। কিন্তু বুঝতে পারিনি কি করে মালঞ্চ পেথিডিন জোগাড় করত—

—শুনলে আপনি হয়তো অবাক হবেন মিঃ ঘোষাল, কিরীটী বলল, আমার ধারণা আপনার ঐ বন্ধু ডাক্তার সমীর রায়ই তাকে পেথিডিন সাপ্লাই করতেন।

—না না, মিঃ রায়, এ আপনি কি বলছেন! অ্যাবসার্ড! আমি জানি ডাঃ রায় ওকে পেথিডিনের অভ্যাস ছাড়াবার জন্যে সর্বদাই চেষ্টা করতেন, ওকে বকাঝকা করতেন—

—আবার গোপনে তিনিই পেথিডিন জোগাড় করে দিতেন মালঞ্চকে। কারণ ডাঃ সমীর রায়ের মালঞ্চকে প্রয়োজন ছিল।

—কি বলছেন আপনি!

—ঠিকই বলছি, যদিও আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। কিন্তু ঐ পেথিডিন রহস্যের চাইতেও বড় রহস্য আপনার অজ্ঞাতে ঐ হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতেই দানা বেঁধে উঠেছিল।

—বড় রহস্য!

—হ্যাঁ, চোরাকারবার—হ্যাসিসের চোরাকারবার।

—না না, তা কখনই হতে পারে না কিরীটীবাবু।

—ঐ হিন্দুস্থান রোডের নীচের একটা ঘর সর্বদা তালা দেওয়া থাকত, আপনার নজরে পড়েনি? কিরীটীর প্রশ্ন।

—পড়েছে। কিন্তু আমি ভেবেছি এমনিতেই বুঝি তালা দেওয়া থাকে ঘরটায়।

—সেই ঘরেই একটা দেওয়াল-আলমারির মধ্যে থাকত চোরাই মাল। ঐখানেই এসে জমা হত, তারপর ওখান থেকেই পাচার হত তার উদ্দিষ্ট পথে।

—মালঞ্চ ঐসব করত?

—একা মেয়েমানুষ কি তা করতে পারে, না তাই সম্ভব! ঐ দলে আরো কে কে আছে জানি না, তবে তাদের মধ্যে দুজনকে আমরা জানতে পেরেছি। তাঁরা হলেন দীপ্তেন ভৌমিক আর শ্রীমতী ডলি দত্ত। আর বাদবাকী যারা আছে এখনো তাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

—তাই—তাই ইদানীং টাকার কথা কখনো বলত না মালঞ্চ, আমি ভেবেছি দীপ্তেন ভৌমিক ওকে টাকা দিচ্ছে দু'হাতে। উঃ, এখন মনে হচ্ছে আমিই যদি ওকে খুন করতে পারতাম—

জেলহাজত থেকে একসময় বের হয়ে এলেন কিরীটী ও চট্টরাজ। এবং চট্টরাজের গাড়িতেই লালবাজারে যেতে যেতে কিরীটী বললে, বর্তমান হত্যা-মামলার একটা জটিল পয়েন্টের সমাধান আজ পেয়ে গিয়েছি মিঃ চট্টরাজ।

—কি করে সমাধান হল? চট্টরাজ শুধালেন।

—ঐ ডুপলিকেট চাবি।

—যেটা হারিয়েছেন ঘোষাল?

—হারায়নি।

—তবে?

—সেটা চুরি গিয়েছে।

—কে চুরি করেছে? মালঞ্চ?

—হ্যাঁ। এক ফাঁকে সুরজিৎ ঘোষালের পকেট থেকে মালঞ্চই সরিয়ে ফেলেছিল চাবিটা। কিন্তু বেচারী ভাবতেও পারেনি যে ঐ চাবিই শেষ পর্যন্ত হবে তার মৃত্যুবাণ।

—তাহলে কি মিঃ রায়—

—হ্যাঁ মিঃ চট্টরাজ, ঐ চাবির সাহায্যেই হত্যাকারী সেরাত্রে কোন এক সময়ে মালঞ্চর ঘরে ঢুকে তার কাজ শেষ করে বের হয়ে এসেছিল সকলের অলক্ষ্যে—যখন সম্ভবত সে পেথিডিনের নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল—

—সত্যি বলছেন!

—হ্যাঁ। আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো সাড়ে এগারোটা থেকে পৌনে বারোটার মধ্যে কোন এক সময় ব্যাপারটা ঘটেছিল। মালঞ্চ নিশ্চিন্ত ছিল সুরজিৎ ঘোষালের পকেট থেকে চাবিটা হাতিয়ে নিয়ে, কিন্তু সে বুঝতে পারেনি যে, যে নাগরের হাতে সে চাবিটা তুলে দিয়েছিল সে সেই চাবির সাহায্যেই তার ঘরে ঢুকে তার গলায় মৃত্যু ফাঁস দেবে। চলুন মিঃ চট্টরাজ, একবার হিন্দুস্থান রোডের বাড়িটা হয়ে যাওয়া যাক। সুশান্ত মল্লিককে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

চট্টরাজকে নিয়ে কিরীটী যখন হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে পৌঁছাল তখন সুশান্ত মল্লিক তার ঘরেই খাটের উপর বসে একা একা নিশ্চিন্ত মনে সিগ্রেট টানছিল। ওদের দুজনকে ঘরে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল।

—বসুন, বসুন সুশান্তবাবু, আপনার কাছ থেকে একটা জিনিস নিতে এসেছি।

—জিনিস! কি জিনিস?

—এই বাড়ির সদরের আর মালঞ্চর ঘরের দরজার ডুপলিকেট চাবি দুটো?

—ডুপলিকেট চাবি?

—হ্যাঁ, যেটা মালঞ্চ হাতিয়েছিল সুরজিৎ ঘোষালের পকেট থেকে, তারপর চোরের ওপর বাটপাড়ি করে তার কাছ থেকে আপনি যেটা হাতিয়েছিলেন?

—কি বলছেন কিরীটীবাবু! আমি সে চাবির সম্পর্কে কিছুই জানি না।

—অস্বীকার করে কোন লাভ নেই সুশান্তবাবু, আমি জানি সে চাবি আপনিই হাতিয়েছিলেন কোন এক সময়—

—বিশ্বাস করুন, সত্যিই সে চাবি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

কিরীটী উঠে দাঁড়াল—চলুন মিঃ চট্টরাজ। তারপর একটু এগিয়েই কিরীটী ফিরে দাঁড়াল, হ্যাঁ একটা কথা সুশান্তবাবু, মিঃ চট্টরাজ কিন্তু জানতে পেরেছেন মালঞ্চর হত্যাকারী কে।

—কে? কে মালঞ্চর হত্যা করেছে?

—আপনি তো জানেন।

—আমি জানি!

—হ্যাঁ, আপনি জানেন সুশান্তবাবু, কিরীটীর গলার স্বর গম্ভীর। আপনি বলতে চান সেরাত্রে আপনি তাকে দেখেননি?

—আমি দেখব কি করে, আমি তো সে-সময় এ বাড়ির ত্রিসীমানাতেও ছিলাম না।

—You are telling lie—আপনি মিথ্যা কথা বলছেন সুশান্তবাবু, আপনি ঐ সময়টা এই বাড়িরই আশেপাশে বা বাড়ির মধ্যেই কোথাও ছিলেন, নচেৎ আপনি জানলেন কি করে যে মালঞ্চকে হত্যা করা হয়েছে? সে আর সাড়া দেবে না?

—বিশ্বাস করুন, আমি তাকে হত্যা করিনি।

—তবে সেরাত্রে আপনি কেন ঘোরানো সিঁড়িপথে চোরের মত মালঞ্চর ঘরে ঢুকেছিলেন?

—হ্যাঁ আমি গিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু she was dead at that time—she was dead.

—সেরাত্রে চোরের মত কেন এসেছিলেন এ বাড়িতে?

—সেদিন তাঁকে আমি দুপুরে ফোন করেছিলাম, বলেছিলাম তার প্রস্তাবেই আমি রাজি, আপাতত দশ হাজার টাকা পেলে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত আছি। সে বলেছিল রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ এসে টাকাটা নিয়ে যেতে। আর ওই পিছনের সিঁড়ি দিয়েই ওপরের ঘরে গিয়ে সে টাকা নিয়ে আসতে বলেছিল আমায়। কিন্তু ঘরে ঢুকে যখন দেখলাম সে মৃত, তাকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে পালাই—

—হুঁ। তাহলে আপনিও সেরাত্রে তাকে ঘরের মধ্যে মৃত অবস্থায় দেখেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—মিঃ চট্টরাজ, ওঁকে অ্যারেস্ট করুন, কিরীটী গম্ভীর গলায় বললে।

—বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি বলছি, মলিকে আমি খুন করিনি—খুন করিনি। কান্নায় ভেঙে পড়ল সুশান্ত মল্লিক।

॥ ষোলো ॥

পরের দিন সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে প্রকাশিত হল—মালঞ্চ মল্লিকের স্বামী সুশান্ত মল্লিক স্ত্রীহত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার।—

বেলা তখন সকাল সাড়ে নটা। লালবাজারে মিঃ চট্টরাজের অফিস ঘরে এসে ঢুকল কিরীটী।

—আসুন মিঃ রায়, চট্টরাজ বললেন, দেখেছেন বোধ হয় আজ নিউজপেপারে নিউজটা ফ্ল্যাশ করা হয়েছে?

—দেখেছি। কিন্তু আপনাকে যেমন বলেছিলাম, ফোন করেছিলেন? কিরীটী শুধাল।

—হ্যাঁ, এখুনি হয়তো আসবেন ওঁরা—

আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রথমে ডাঃ সমীর রায় এবং তাঁর পৌঁছবার মিনিট দশেক পরেই দীপ্তেন ভৌমিক এসে পড়লেন।

কিরীটীই বললে, মিঃ ভৌমিক, ডাঃ রায়, খুব অবাক হচ্ছেন বোধ হয় আপনারা, কেন এ সময় ফোনে আপনাদের জরুরী তলব দিয়ে মিঃ চট্টরাজ এখানে ডেকে আনিয়েছেন, তাই না?

দুজনেই মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালেন।

—শুনুন, উনি মালঞ্চর হত্যাকারীকে সনাক্ত করতে পেরেছেন—

দুজনেই একসঙ্গে অর্ধস্ফুট প্রশ্ন করলেন,—কে—কে?

—যখন আপনাদের ডেকে আনা হয়েছে জানতে পারবেন বৈকি। একটা ধৈর্য ধরুন। এরপর গম্ভীর কণ্ঠে কিরীটী বলল, ডাঃ রায়, সেরাত্রে চিনতে পারেননি আপনি কাকে হিন্দুস্থান রোডের সদরে দেখেছিলেন?

—না।

—যার কাছে ঐ বাড়ির সদর দরজা আর দোতলায় মালঞ্চর ঘরের ডুপলিকেট চাবি দুটো ছিল তাকেই আপনি দেখেছিলেন।

—ডুপলিকেট চাবি?

—হ্যাঁ, আপনাকে মালঞ্চ দেবী দেননি সে চাবিটা?

—না।

—দীপ্তেনবাবু—আপনাকে?

—না।

—মিথ্যা বলছেন দীপ্তেনবাবু, সুরজিৎ ঘোষালের পকেট থেকে হাতিয়ে মালঞ্চ আপনাকেই দিয়েছিল ডুপলিকেট চাবিটা, যাতে আপনি যে কোন সময়েই ঐ ঘরে আসতে পারেন।

—বলতেই হবে আপনার মস্তিষ্ক রীতিমত উর্বর—ব্যঙ্গভরা গলায় দীপ্তেন ভৌমিক বললেন।

—দীপ্তেনবাবু, আমি কিরীটী রায় এবং কিরীটী রায় বলতে যে কি এবং কতখানি বোঝায় তা আপনার সম্ভবত জানা নেই বলেই এখনো আপনি পালাবার পথ খুঁজছেন। আপনি জানেন না যে আপনার ফাঁদে আপনি নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন—

—ফাঁদে!

—হ্যাঁ! পরে কোন এক সময় এসে বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঐ চাবির সাহায্যেই আবার পরে এক সময় রাত্রে এসে প্রথমে সদর ও পরে মালঞ্চর শোবার ঘর খুলে ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন আপনার ফেলে যাওয়া সিগ্রেট কেসটা নেবার জন্য, কিন্তু আপনি ভাবতেও পারেননি ইতিমধ্যে সেটা ডলি দত্ত এসে নিয়ে গিয়েছে। আর সিগ্রেট কেসটা না পেয়েই আপনি ফিরে যাবার সময় বাথরুমের দরজাটা ভিতরে থেকে বন্ধ করে যান, and that was your second thought, একবারও আপনার মনে হল না যে, যে মালঞ্চকে হত্যা করল সে কোন্ পথে বের হয়ে যাবে এবং সে ব্যাপারটা প্রথমেই পুলিসের মনে জাগতে পারে।

চট্টরাজের ঘরের মধ্যে যেন একটা শ্বাসরোধকারী স্তব্ধতা নেমে আসে। দীপ্তেন ভৌমিক স্থিরদৃষ্টিতে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকেন। ডাঃ সমীর রায়ও স্তব্ধ।

কিরীটীর ঋজু কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, আপনি হত্যাকাণ্ডটা যথেষ্ট কুল ব্রেনেই পরিকল্পনা করেছিলেন and it was pre-planned murder—সুরজিৎ ঘোষালের নাম লেখা একটা রুমাল সেই কারণেই আপনি হাতিয়েছিলেন পূর্বাহ্নে, যদিও জানি না কি করে সেটা আপনার হস্তগত হয়েছিল, আশ্চর্য হব না যদি শুনি যে আপনার প্রেয়সীই সেটা আপনার হাতে তুলে দিয়েছিল। সবই প্ল্যান অনুযায়ী হয়েছিল, কিন্তু আপনার second thought অনুযায়ী over-cautious হতে গিয়ে আপনি যদি ঐ ঘরে ফিরে এসে বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে না যেতেন তাহলে ঐ চাবির প্রশ্নটা আমার মাথায় হয়তো এত সহজে উঁকি দিত না, আর আপনিও ঐ একটিমাত্র ভুলের জন্যে এত সহজে exposed হয়ে যেতেন না।

—ঐ একটি মাত্র ভুলই আপনার গলায় ফাঁস দিয়েছে দীপ্তেনবাবু—উঁহু, দরজার দিকে তাকিয়ে কোন লাভ হবে না, ওখানে তিন-চারজন সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে আছে। মিঃ চট্টরাজ প্রস্তুত হয়েই আপনাকে আজ এখানে ডেকে পাঠিয়েছেন, আর আপনার মনে নিশ্চয়তা আনবার জন্যেই আজকের সমস্ত কাগজে সুশান্ত মল্লিকের গ্রেপ্তারের সংবাদটা ফ্ল্যাশ করা হয়েছিল। আপনি হয়তো ভাববেন দীপ্তেনবাবু, মালঞ্চকে আপনিই যে হত্যা করেছেন, পুলিসের হাতে তার কোন প্রমাণ নেই, কিন্তু মালঞ্চ-হত্যার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পুলিসের হাতে না থাকলেও, হ্যাসিস সিগ্রেটের চোরাকারবারের সঙ্গে যে আপনি লিপ্ত ছিলেন তার অনেক প্রমাণই পুলিসের হাতে এসেছে। আদালতে যখন আপনি সোমনাথ ভাদুড়ীর সওয়ালের সামনে দাঁড়াবেন তখন দেখবেন মুক্তির কোন রাস্তাই খোলা নেই—

থামল কিরীটী, তারপর চট্টরাজের দিকে তাকিয়ে বলল, মিঃ চট্টরাজ, আপনার কাজ এখন আপনিই করুন।

মিঃ চট্টরাজ বললেন, you are under arrest মিঃ ভৌমিক।

দীপ্তেন ভৌমিক নিঃশব্দে চট্টরাজের দিকে তাকালেন।

PATHAGAR.NET

রক্তের দাগ

PATHAGAR.NET

॥ এক ॥

ফিরতে ফিরতে রোজই রাত হয়ে যায়।

কখনো সাড়ে এগারোটা—কখনো রাত বারোটাও বেজে যায়। আজও রাত হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় রাত বারোটা বেজে গিয়েছিল।

হাতঘড়ির দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছিল সুদীপ। বাড়ির প্রায় কাছাকাছি যখন এসেছে—সেই শব্দটা কানে এলো সুদীপের। একটা জুতো পায়ে হাঁটার শব্দ। শব্দটা কানে যেতেই থমকে দাঁড়াল সুদীপ আজও।

আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে পিছনের শব্দটাও থেমে গেল। আর কারো হেঁটে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

সুদীপ জানে আবার সে হাঁটতে আরম্ভ করলেই পেছনে সেই শব্দটা শোনা যাবে। প্রথম প্রথম অতটা ভাবায়নি সুদীপকে; ভেবেছে কেউ তার পিছনে পিছনে হেঁটে আসছে।

দু'দিন ধরে ওই একই শব্দ শুনে শুনে তৃতীয় দিন থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করেছিল কে তার পিছনে পিছনে হেঁটে আসছে অত রাত্রে। কিন্তু কাউকে সে দেখতে পায়নি। যতদূর দৃষ্টি চলে একেবারে ফাঁকা রাস্তাটা।

ছোট্ট শহর। কলকাতা থেকে বেশী দূর নয়। গোটা তিনেক স্টেশন মাত্র। বাঁধানো রাস্তাটা সোজা স্টেশন থেকে কিছুদূরে এসে ডাইনে একটা বাঁক খেয়ে সোজা চলে এসেছে তার বাড়ির দিকে। স্টেশন থেকে দেড় মাইলের বেশী হবে না।

আগে রাস্তার দু'পাশে কোন আলোর তেমন ভালো ব্যবস্থা ছিল না। দশ-পনেরো হাত দূরে দূরে মিউনিসিপ্যালিটির লাইটপোস্ট। তাও বেশীর ভাগ দিন বাল্‌ব ফিউজ হয়ে যাওয়ায় আলোই জ্বলত না।

ইদানীং সমরেন্দ্রবাবু স্থানীয় এম. এল. এ. হওয়ায় মধ্যে মধ্যে কয়েকটা লাইটপোস্ট বসাবার পর—বেশ আলো থাকে রাস্তাটায়।

পথে যেতে যেতে দু'পাশে কিছু ঘর-বাড়ি ও দোকানপাট আছে—কিন্তু অত রাত্রে কোন বাড়ির আলো জ্বলে না—দোকানপাটও বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তাটাও একেবারে নির্জন হয়ে যায়। বোধ হয় একমাত্র সুদীপই শেষ ট্রেনের যাত্রী। লোকাল ট্রেন ওই সময় থাকে না—রাত এগারোটায় শেষ লোকাল ট্রেনটা চলে যায়।

পরের জংশন স্টেশনে মেল গাড়িটা থামে—সেই গাড়িতেই ফিরে সুদীপ পিছু হেঁটে আসে জংশন থেকে, নচেৎ অত রাত্রে ফিরবার আর কোনো উপায় নেই। জংশনটা মাইলখানেক দূরে—তাদের স্টেশনের আর জংশনের মাঝামাঝি জায়গাটা।

আজ দিন-দশেক হলো ওই শব্দটা শুনছে সুদীপ।

স্পষ্ট মনে আছে সুদীপের—খুনের মামলায় আদালতে সাক্ষী দেবার পর যেদিন সে ফিরে আসছে, সেইদিনই প্রথম ওই জুতো পায়ের শব্দটা সে শুনতে পেয়েছিল।

তারপর থেকে প্রতি রাত্রেই সে শুনছে ওই জুতো পায়ে চলার শব্দটা।

সুদীপ বোধ হয় অভ্যাসমতই হঠাৎ থেমে আজও পিছনপানে ফিরে তাকাল একবার। না, কেউ নেই—যতদূর দৃষ্টি চলে, রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা—জনপ্রাণী নেই।

তবু আজ দাঁড়িয়ে থাকে সুদীপ রাস্তার দিকে তাকিয়ে। আজ আবার রাস্তার কয়েকটা আলো জ্বলছে না।

কেমন একটা আধো আলো আধো ছায়া থমথম করছে। হঠাৎ সেই আধো আলো আধো ছায়ার মধ্যে দুটো যেন নীল আগুনের মারবেল ভেসে উঠলো।

নীল আগুনের মারবেল দুটো এগিয়ে আসছে তার দিকে।

এমনিতে ভীতু নয় সুদীপ। কিন্তু ওই মুহূর্তে হঠাৎ যেন তার সমস্ত শরীর কাঠ হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায়। হঠাৎ আবার নীল আগুনের মারবেল দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল। দপ্ করে যেন নীল আগুনের মারবেল দুটো নিভে গেল।

শীতের রাত। তবু সুদীপের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে, কোথাও কিছু নেই—যতদূর দৃষ্টি চলে একটা আলো-ছায়ার থমথমানি।

নিশ্চয়ই ভুল দেখছে সুদীপ। চোখের ভুল। সুদীপ আবার চলতে শুরু করে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই শব্দ। হেঁটে হেঁটে কেউ যেন আসছে তার পিছনে পিছনে, ঠিক তার পিছনে।

আসুক।

সুদীপ আর থামবে না। পিছন ফিরে তাকাবে না। সুদীপ চলার গতি বাড়িয়ে দিল। বাড়ির সামনাসামনি পৌঁছে দেখে জানলা-পথে ঘরে আলোর ইশারা। ঘরে আলো জ্বলছে—রমা জেগে আছে তার জন্য আজও।

প্রথম প্রথম রমা বলতো, ইদানীং এত রাত করে ফের কেন? একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পার না আগের মত?

কাজ শেষ হবে—তবে তো আসবো। এখন অনেক বেশী কাজ। সুদীপ বলতো।

কি এমন কাজ তোমার যে রাত দুপুর গড়িয়ে যায়। একা তুমি ছাড়া বোধ হয় কেউ এত রাতে আর এদিকে ফেরে না।

সুদীপ কোন জবাব দেয় না। চুপ করে রমার কথাগুলো শুনে যায়। জামা-কাপড় খুলে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। কনকনে ঠাণ্ডা তোলা ড্রামের জলে ঐ রাত্রে স্নান করে।

কতদিন বলেছে রমা—অভিযোগ তুলেছে সুদীপের অত রাত করে বাড়ি ফেরা নিয়ে। কিন্তু এখন আর বলে না। বোধ হয় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে রমা ব্যাপারটায়। কিংবা হয়ত বুঝতে পেরেছে রমা—রাত করে বাড়ি ফেরার ব্যাপারে সুদীপকে বলে কোন লাভ নেই। সুদীপ তার কথায় কান দেবে না। অথবা রমাই হয়ত সুদীপকে একই কথা বলে বলে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

হন হন করে হেঁটে এসে সুদীপ দরজার সামনে দাঁড়াল। এবং আজ বেল বাজাবার আগেই দরজাটা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে রমা।

রমা কোন কথা বলল না। দরজা খুলে দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

সুদীপ কিন্তু তখুনি ভিতরে প্রবেশ করল না। দরজার উপর দাঁড়িয়ে পশ্চাতে যতদূর

দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু কিছু তার চোখে পড়ল না।

শীতের মধ্যরাত্রের রাস্তাটা খাঁ খাঁ করছে। কোন জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্রও চোখের দৃষ্টিতে পড়ে না। তবুও কয়েকটা মুহূর্ত সুদীপ সামনের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

হঠাৎ রমার কণ্ঠস্বরে চমকে ফিরে তাকাল।

রমা যেন কখন এসে আবার তার পাশে দাঁড়িয়েছে। বললে, কি দেখছো?

না। কই, কিছু না তো!

তবে অমন করে দেখছিলে কি?

চল। ভিতরে চল। সুদীপ বললে।

মনে মনে একটা হিসাব করছিল সুদীপ। কথাটা আজই তার মনে হয়েছে সর্বপ্রথম। ঠিক দশদিন ধরে রাত্রে বাড়ি ফিরবার সময় সে ওর পশ্চাতে পদশব্দটা শুনছে।

ঠিক দশদিন। পনেরোই নভেম্বর আজ। তিন, চার ও পাঁচই নভেম্বর পর পর তিন-তিনটে দিন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আদালতে তাকে সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল তপন ঘোষের হত্যার ব্যাপারে।

আদালতের রায় বের হয়েছে কিনা জানে না সুদীপ। কোন খোঁজ রাখে নি। তবে এটা সে বুঝেছিল তার সাক্ষ্যের পর বিজিতের ফাঁসি হবে না। সোমনাথ ভাদুড়ী সেই রকমই বলেছেন। এবং সে সাক্ষ্য না দিলে হয়ত বিজিতের ফাঁসিই হতো। কারণ মৃতের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহটার সামনে সেও পড়েছিল জ্ঞান হারিয়ে। হাতের মুঠোর মধ্যে তার যে পিস্তলটা ছিল সেই পিস্তলের চেম্বারে পাঁচটি গুলি ছিল। একটি ছিল ফাঁকা। এবং ব্যালেস্টিক পরীক্ষায় তা প্রমাণিত হয়েছে। সেই পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। এবং যে গুলিটা মৃতদেহকে ভেদ করে গিয়ে পাশের দেওয়ালে বিঁধেছিল সেটা ওই পিস্তল থেকেই যে ফায়ার করা হয়েছিল তাও প্রমাণিত হয়েছিল।

মৃণালের পাশের ঘরের লোকটি অবিনাশ সেন ও মেয়েটি মিনতি—তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল আদালতে। সন্ধ্যার কিছু পরে মৃণাল নামে মেয়েটির ঘরে তারা বিজিত মিত্রকে ঢুকতে দেখেছে। বিজিত মিত্র নাকি প্রায়ই মৃণালের ঘরে আসত। ঘণ্টা দু-তিন থাকত। আরো প্রমাণিত হয়েছিল—বিজিত মিত্র তপন ঘোষের সঙ্গে চোরাকারবার করত। এবং মধ্যে মধ্যে মৃণালের ঘরে ওরা দুজন কখনো একা, কখনো একত্রে যাতায়াত করত।

মৃণালের কিন্তু কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সুদীপ সাক্ষ্য দিয়েছিল আদালতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে : যে রাত্রে দুর্ঘটনা ঘটে, সে-রাত্রে ওই পল্লীর সামনে দিয়ে সে ও বিজিত মিত্র একত্রে ফিরছিল—হঠাৎ দুজন লোক তাদের আক্রমণ করে—বিজিতের মাথায় একটা ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করে। বিজিত সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়—সুদীপ ছুটে পালায় প্রাণভয়ে। কিছুদূর গিয়ে একটা গলির মুখে দাঁড়িয়ে সে দেখে সেই লোক দুটো বিজিতের জ্ঞানহীন দেহটা একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল। রাত তখন পৌনে দুটো।

কাজেই রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ যদি মৃণালের ঘর থেকে পিস্তলের আওয়াজ শোনা গিয়ে থাকে এবং ময়না তদন্তে যদি প্রমাণিত হয়ে থাকে রাত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে কোন এক সময় গুলির আঘাতে তপন ঘোষের মৃত্যু হয়েছে, সেক্ষেত্রে

তপন ঘোষের হত্যাকারী বিজিত মিত্র হতেই পারে না। সারকামস্টানশিয়াল এভিডেন্স যেমন তার বিরুদ্ধে নেই—তেমনি আছে রিজনেবল ডাউট।

সুদীপ মকদ্দমার রায় বের হয়েছে কিনা জানে না কিন্তু বিজিত মিত্র যে দোষী সাব্যস্ত হবে না সোমনাথ ভাদুড়ীর কথায় সেটা সে বুঝেছিল। তাছাড়া মৃণাল নামক মেয়েটির সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি—একমাত্র হয়ত যে ছিল প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

স্নান ও আহারাদির পর সুদীপ জানালার সামনে ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে একটা পাতলা শাল গায়ে দিয়ে বসে বসে সিগ্রেট টানছিল।

আজ রাত আরো বেশী হয়েছে, বোধ করি রাত দুটো।

রমা রান্নাঘরের কাজ সেরে এসে পাশে দাঁড়াল, কি হলো? শুতে যাবে না?

বোসো রমা, তোমার সঙ্গে কথা আছে। সুদীপ বললো।

আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

ঘুম পাচ্ছে!

হ্যাঁ।

দাঁড়াও—আসছি। সুদীপ পাশের ঘরে গেল। আলমারি খুলে একটা স্মাগল করা স্কচ হুইস্কির ছোট চ্যাপটা বোতল থেকে দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালল, একটু জল মেশাল কুঁজো থেকে—পরে ফিরে এলো গ্লাস দুটো হাতে পাশের ঘরে।

নিজে একটা গ্লাস নিয়ে, অন্য গ্লাসটা রমার দিকে এগিয়ে দিল সুদীপ। নাও এটা খেয়ে নাও।

কি এটা?

খেয়ে ফেল।

না! বল কি?

বিষ নয়। খাও।

রমা আর আপত্তি জানায় না। এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে ফেলে, গলার ভিতরটা জ্বলে ওঠে।

মাগো, কি এটা—

হুইস্কি।

তুমি আমাকে মদ খাওয়ালে?

মধ্যে মধ্যে খাওয়া ভাল।

ভাল?

হ্যাঁ। শরীরের উপকার হয়। ডাক্তাররা বলেন, অ্যালকোহল ইজ দ্য বেস্ট ফুড।

রমার মাথাটা তখন যেন ঝিম ঝিম করছে।

আমার বোধ হয় নেশা হচ্ছে—রমা বলল।

সুদীপ বলল, কিছু হবে না। অতটুকু হুইস্কিতে নেশা হয় না কারো। কিছুক্ষণ বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো। বোসো ঐ চেয়ারটায়।

রমা বসলো সামনের চেয়ারটার উপরে।

pathagar.net

রমার বুকটা গরম গরম লাগছে। কান দুটোও।

জান রমা, আজ কদিন ধরে দেখছি বাড়ি ফেরার পথে কে যেন আমাকে ফলো করে।

ফলো করে তোমায়?

হ্যাঁ।

কে ফলো করে?

তা জানি না।

দেখতে পাওনি লোকটাকে?

না।

তবে বুঝলে কি করে ফলো করছে কেউ তোমাকে?

করে। আমি জানি।

কিন্তু কেই বা তোমায় ফলো করবে—আর কেনই বা করতে যাবে!

হয়ত—

কি?

কেউ কিছু বলতে চায় আমায়।

কে আবার কি বলতে চাইবে তোমাকে? আর যদি বলতে চায় তো সামনাসামনি এসে বললেই তো পারে। ফলো করবার কি দরকার?

আমার কি মনে হয় জানো রমা—

কি?

তপন ঘোষ আমাকে কিছু বলতে চায়।

তপন ঘোষ! কে সে?

আমার সঙ্গে লোকটার পরিচয় ছিল। মানে তাকে আমি চিনতাম।

তা তার সঙ্গে একদিন দেখা করে কথাটা জিজ্ঞাসা করলেই পারো।

তার যে কোন উপায়ই আর নেই।

উপায় নেই! কেন? রমা বিস্ময়ের সঙ্গেই যেন তাকায় সুদীপের মুখের দিকে।

না। তপন ঘোষ মাস তিনেক হলো মারা গিয়েছে—পিস্তলের গুলিতে।

কি বলছো তুমি আবোল-তাবোল?

এই দেখো রমা, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। আমি ঠিকই বলছি। এ তপন ঘোষ ছাড়া আর কেউ নয়।

রমা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বলল, রাত অনেক হয়েছে। এবারে শোবে চল।

আর এক পেগ হুইস্কি খাবে রমা? সুদীপ বলল।

না।

একটা কথা ভাবছি রমা।

কি?

কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট কিনবো।

ফ্ল্যাট কিনবে কলকাতায়! কি বলছো? রমার কণ্ঠে বিস্ময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অত টাকা

BanglaBook.org

তুমি পাবে কোথায়?

ফ্ল্যাট আমি দেখেছি—এখন হাজার দশেক মত দিতে হবে, তারপর বাকী চল্লিশ হাজার টাকা মাসে মাসে ত্রিশটা ইনস্টলমেন্টে—সে হয়ে যাবে।

কিন্তু ওই দশ হাজার টাকা কোথা থেকে আসবে? রমা আবার প্রশ্ন করে।

ব্যাঙ্কে কিছু আছে। কিছু ফিক্সড ডিপোজিট তোমার নামে আছে—আর বাকীটা ধার করবো বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে।

না না—এই তো বেশ আছি আমরা। ফ্ল্যাট নিয়ে কি হবে?

ফ্ল্যাটটা দেখলে তোমার খুব পছন্দ হবে দেখো। বালিগঞ্জে—একেবারে স্টেশনের কাছাকাছি। সাততলার উপরে। হু হু করে বাতাস বইতে থাকে সর্বক্ষণ। রাত্রে ট্রেনের শব্দ শুনতে পাবে। ট্রেন আসছে—যাচ্ছে—

না। ওসব ধার-কর্জের মধ্যে যেও না।

সত্যি রমা—তোমার কোন অ্যামবিশন নেই। আমি কিন্তু ফ্ল্যাটটা কিনবো ঠিক করেছি।

দেখো ধার-কর্জর মধ্যে যেও না।

চল—শুইগে। সুদীপ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল।

॥ দুই ॥

বিছানায় শুয়ে সুদীপের ঘুম কিন্তু আসে না। অন্ধকারে বালিশে মাথা রেখে সামনের খোলা জানালাটার দিকে চেয়ে থাকে।

সব টাকাটাই অবিশ্যি সে নগদ এখুনি দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তাহলে টাকাটার সোর্স নিয়ে গোলমাল বাধবে। ব্যাঙ্কে মাত্র হাজার তিনেক আছে আর ফিক্সড ডিপোজিটে আছে হাজার পাঁচেক—হিসাবে মিলাতে পারবে না; বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে আর কত সে ধার পেতে পারে, বড়জোর হাজার দু-তিন। অথচ তার অফিসের ড্রয়ারের মধ্যে করকরে চল্লিশ হাজার টাকার নোট রয়েছে। ওই চল্লিশ আর ফিক্সড ডিপোজিটের পাঁচ—ব্যাঙ্কের তিন—মাত্র হাজার দুই টাকা বেশী—সে তো অফিস থেকেই লোন পেতে পারে।

কিন্তু হিসাব মেলাতে পারবে না। চল্লিশ হাজার টাকা ধার দেবে কে তাকে? মাত্র তো তিনশো টাকা মাসমাহিনা তার।

না। রমা ঠিকই বলেছে। ফ্ল্যাট কেনার এখন দরকার নেই। ওই সময় আবার মনে পড়লো বিজিত মিত্রর কথা।

কাল একবার অফিসের পর বিজিতের অ্যাডভোকেট সোমনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে দেখা করবে। লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই যেন বুকের মধ্যে কেমন দুপদুপ করতে থাকে।

সুদীপ শুনেছে ক্রিমিন্যাল সাইডের একজন বাঘা অ্যাডভোকেট সোমনাথ ভাদুড়ী।

চশমার পুরু কাঁচের মধ্যে দিয়ে লোকটা যখন তাকায় মনে হয় যেন অপর পক্ষের পেট থেকে কথা টেনে বের করবেন। রোমশ জোড়া ভ্রূ। বয়েস প্রায় এখন সত্তরের কাছাকাছি। মাথার সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছে।

বেঁটে-খাটো মানুষটা। কথা বলার সময় ডান হাতে ধরা পেনসিলটা দু' আঙুলের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে নাচান। ভরাট ভারী গলা।

কথা বললে মনে হয় যেন একটা জ্বালার ভিতর থেকে কথাগুলো গম গম করে বের হয়ে আসছে।

সুদীপের সাক্ষ্য দেবার কথাটা বলতে শুনে মানুষটা এমনভাবে তার দিকে তাকিয়ে ছিলো যেন সুদীপ কত বড় অপরাধ করে ফেলেছে।

আপনি সাক্ষ্য দেবেন?

আজ্ঞে। মানে—হঠাৎ যেন তোতলাতে শুরু করেছিল সুদীপ সেদিন।

কি নাম আপনার বললেন যেন! রোমশ ভ্রূ-যুগলের নীচে চশমার পুরু লেন্সের ওধার থেকে তাকালেন সোমনাথ ভাদুড়ী।

সুদীপ রায়।

নিহত তপন ঘোষকে আপনি চিনতেন? প্রশ্ন এলো যেন তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত—বিদ্ধ করলো সুদীপকে।

না। তবে আসামী বিজিত মিত্রকে চিনি।

চেনেন? কতদিনের পরিচয় আপনাদের?

তা বলতে পারেন অনেক দিনের। বিজিত তপন ঘোষকে মারেনি। মানে হত্যা করেনি।

হত্যা করেনি?

না। আমার সব কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন স্যার—ব্যাপারটা সব সাজানো বলেই আমার মনে হয়।

বলতে চান কনককটেড?

হ্যাঁ, মানে—

কি রকম!

সুদীপ তখন আদালতে যা পরে বলেছিল সেই কথাগুলো সোমনাথ ভাদুড়ীকে বলল। মন দিয়ে সুদীপের সব কথা শুনলেন সোমনাথ ভাদুড়ী।

হুঁ। তা এসব কথা আগে পুলিসকে জানাননি কেন?

ভয়ে।

কি বললেন? ভয়ে?

হ্যাঁ—বুঝতেই তো পারছেন খুনের মামলা। এই সব মামলায় কে সেধে জড়িয়ে পড়তে চায় বলুন, স্যার।

তবে আজকেই বা বলতে চান কেন?

একজন নির্দোষীর ফাঁসি হবে—

রোমশ ভ্রূর তলায় পুরু লেন্সের ওধার থেকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অতঃপর সোমনাথ ভাদুড়ী সুদীপের মুখের দিকে।

সুদীপের ওই মুহূর্তে মনে হয়েছিল সেই দৃষ্টির মধ্যে যেন সন্দেহ-অবিশ্বাস তার আপাদ-মস্তককে জরীপ করে চলেছে।

পাবলিক প্রসিকিউটার অম্বিকা সান্যাল—তার জেরার মুখে দাঁড়াতে পারবেন তো?

BanglaBook.org

তিনি আপনাকে পোস্টমর্টেম করবেন। বাঘা বাঘা সাক্ষীও তাঁর জেরার মুখে নার্ভ হারায়।

যা সত্যি তা বলবো—ভয় পাবো কেন, আপনিই বলুন না স্যার।

ঠিক আছে, আদালতে একটা এফিডেবিট করতে হবে। যা করবার আমিই করবো। আপনার ঠিকানাটা রেখে যান। সময়মত সমন পাবেন।

সমন!

হ্যাঁ, সাক্ষীর সমন যাবে আদালত থেকে। আপনার ঠিকানাটা বলুন।

সুদীপ তার অফিসের ঠিকানাই দিয়ে এসেছিল।

চলে আসবার আগে সোমনাথ আবার শুধিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যাবেন না তো?

না, না।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান সুদীপ রায়কে সরকারপক্ষের কৌসুলী অম্বিকা সান্যাল রীতিমত প্রশ্নে প্রশ্নে পর্যুদস্ত করেছিলেন।

অম্বিকা সান্যাল প্রথমেই প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি তো আদালতে জবানবন্দী দিয়েছেন, বিজিত মিত্র আসামীর মাথায় পশ্চাৎ দিক ঘেঁষে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান আর আপনি ছুটে পালান?

হ্যাঁ।

ছুটে কত দূরে পালিয়েছিলেন?

সামনেই একটা গলির মধ্যে।

সেটা ঘটনাস্থল থেকে কত দূরে?

হাত আট-দশ হবে—সেই গলি থেকেই আত্মগোপন করে দেখি ব্যাপারটা—পরে ওরা বিজিতকে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যায়।

অত রাত্রে আপনারা কোথা থেকে ফিরছিলেন? আপনি আগে বলেছেন রাত তখন দুটো হবে।

অফিসের ইয়ার-এনডিংয়ের সময়—অনেক রাত পর্যন্ত তখন কাজ করতে হতো আমাদের—কাজ সারতে সারতে প্রায় দেড়টা হয়ে যায়—ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি তখন কিছুই ছিল না; তাই হেঁটে ফিরছিলাম দুজনে।

আপনি জানেন কি তপন ঘোষের সঙ্গে বিজিত মিত্র চোরাকারবারে লিপ্ত ছিল?

না।

আদালতে তা প্রমাণিত হয়েছে। আপনারা এক অফিসে একই ডিপার্টমেন্টে এতদিন কাজ করছেন, এত পরিচয় ছিল তার সঙ্গে আপনার, অথচ ওই কথাটা জানতেন না? জানতেন—সবই জানতেন—প্রকাশ করেননি কখনো।

ওই সময় সোমনাথ ভাদুড়ী বলে উঠেছিলেন, অবজেকশন, ইয়োর অনার।

জজ সাহেব কিন্তু অবজেকশন নাকচ করে বলেছিলেন, প্রসিড মিঃ সান্যাল।

তারপরই প্রশ্ন করেছিলেন অম্বিকা সান্যাল, যে পথ দিয়ে অত রাত্রে ফিরছিলেন সেদিন আপনারা দুই বন্ধু—নিশ্চয়ই জানতেন তার কাছাকাছি একটা কুখ্যাত পল্লী এবং সেখানে মৃণাল নামে বারবনিতা থাকতো। সেখানে বিজিতবাবুর রীতিমত যাওয়া-আসা ছিল।

না, আমি জানতাম না।

জানতেন না?

না।

ওই পথ দিয়ে আপনি আগে আর কখনো যাতায়াত করেছেন?

ঠিক মনে করতে পারছি না! বোধ হয় আগে কখনও যাইনি।

ওই রাত্রেই প্রথম তাহলে?

বলতে পারেন তাই। বিজিতবাবু বলেছিল ওই পথটা শর্টকাট হবে শেয়ালদহে যেতে, তাই ওই পথে যাচ্ছিলাম।

অত রাত্রে তাহলে ঠিক ঠিক ভাবে রাস্তার নামটা বললেন কি করে যদি ওই পথে কখনো আগে না গিয়ে থাকেন?,

বিজিত বলেছিল।

তা অত রাত্রে শেয়ালদহের দিকে যাচ্ছিলেন কেন?

মধ্যে মধ্যে ফিরতে বেশী রাত হলে ট্রেন থাকত না। ট্রেনের লাইন ধরে আমি হেঁটে চলে যেতুম বাড়ি। তাই—

কিন্তু বিজিতবাবু বাগবাজারে থাকতেন। তিনি ওই পথে যাচ্ছিলেন কেন?

আমাকে শেয়ালদা স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে।

আসলে সোমনাথ ভাদুড়ী বেশ করে তালিম দিয়েছিলেন সুদীপকে কয়েক দিন—নচেৎ সুদীপ নিঃসন্দেহে গোলমাল করে বসত জেরার মুখে।

বিজিতের সঠিক সংবাদ পেতে হলে তাকে একবার ওই সোমনাথ ভাদুড়ীর কাছেই যেতে হবে। একবার জানা দরকার কোর্টের রায় বের হয়েছে কিনা—আর না বের হলে কবে বেরুবে বা বেরুতে পারে জানা প্রয়োজন।

মৃণালের কথাও মনে পড়ে ঐ সঙ্গে সুদীপের। মৃণালের ঘরে যে বিজিতের যাতায়াত ছিল সেটা সুদীপ জানত। একদিন সেও গিয়েছিল মৃণালের ঘরে—ওই বিজিতের সঙ্গেই। মৃণালকে সেও চিনত। অবিশ্যি কথাটা সে বরাবর চেপে গিয়েছে জটিলতা এড়াবার জন্যই। বস্তুত আদালতে গিয়ে বিজিতের হয়ে সাক্ষ্য দেবার কথা কখনো তার মনেও হয়নি। মামলায় জড়িয়ে পড়বার ভয়ে আদালতের ধার-কাছ দিয়েও প্রথমটা সে যায়নি।

নাঃ, ঘুম বোধ হয় আজ আর আসবে না।

সুদীপ শয্যার উপর উঠে বসল।

কপালের পাশে শিরা দুটো দপ দপ করছে।

পাশের ছোট টুলটার উপর থেকে সিগ্রেটের প্যাকেটটা ও লাইটারটা তুলে নিল সুদীপ। প্যাকেট থেকে একটা সিগ্রেট বের করে লাইটারের সাহায্যে অগ্নিসংযোগ করল।

সিগ্রেট টানতে টানতে সুদীপের মনের মধ্যে নানা কথা আনাগোনা করতে থাকে। আদালতে হলফ করে বলে এসেছে যে তপন ঘোষকে সে চিনত না।

কথাটার সত্য-মিথ্যা আজ আর অবিশ্যি প্রমাণিত হবার কোন আশা নেই।

তপন ঘোষ আজ মৃত। পোস্টমর্টেমের পর তার মৃতদেহটা কেওড়াতলায় পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

রাত হয়ে গিয়েছিল মৃতদেহটা শ্মশানে নিয়ে যেতে। তপনের পাড়াপ্রতিবেশীরাই মৃতদেহটা শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে গিয়েছিল।

সন্ধ্যা থেকে সেদিন আকাশ কালো করে বৃষ্টি নেমেছিল, প্রবল বৃষ্টি। কেউ জানে না, সুদীপ সর্বাঙ্গে একটা চাদর জড়িয়ে শ্মশানে গিয়েছিল—বাইরে একটা গাছের নীচে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। কেউ তাকে দেখতে পায়নি।

হঠাৎ কে একজন তার পাশে এসে দাঁড়াল। একটি স্ত্রীলোক, মাথায় দীর্ঘ গুণ্ঠন। প্রথমটায় সে জানতে পারেনি তার উপস্থিতি। জানতে পেরে কথা বলবার চেষ্টা করতেই স্ত্রীলোকটি সরে গিয়েছিল।

চকিতে যেন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পরে ব্যাপারটা নিয়ে সুদীপ কোনরকম মাথা ঘামায়নি।

সুদীপ সিগ্রেট টানতে টানতে সেই রাত্রের কথাটাই ভাবতে থাকে।

পরের দিন অফিস-ফেরতা সুদীপ সোমনাথ ভাদুড়ীর ওখানে গেল। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। বিরাট টেবিলটার উপর একরাশ কাগজপত্র ও মোটা মোটা আইনের বই ছড়ানো। ঠিক তার উল্টোদিকে একটা চেয়ারে বসে ছিল আর একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি। চশমার আড়াল থেকে বুদ্ধিদীপ্ত অনুসন্ধানী চোখের দৃষ্টি যেন অন্তর বিদ্ধ করে।

মাথার চুলে বেশ পাক ধরেছে। মুখে একটা জ্বলন্ত সিগার। পরনে পায়জামা ও পাঞ্জাবি, গায়ে একটা শাল জড়ানো। দুজনে মধ্যে মধ্যে কথা বলছিল।

ভৃত্য এসে ঘরে ঢুকলো, বাবু—

কি?

একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

কোথা থেকে আসছেন—কি নাম?

নাম বললেন সুদীপ রায়।

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সোমনাথ ভাদুড়ীর চোখের দৃষ্টি যেন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। বললেন, যা, পাঠিয়ে দে।

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সুদীপ এসে ঘরে ঢুকল।

আসুন—বসুন। সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন।

স্যার, একটা সংবাদ নিতে এসেছিলাম।

কি সংবাদ?

বিজিতের মামলার রায় কি—

আজই বের হয়েছে রায়। বেকসুর খালাস পেয়েছেন আপনার বন্ধু।

পেয়েছে?

হ্যাঁ।

সুদীপবাবু!

বলুন।

বিজিতবাবু যে অপরাধী আমি জানতাম—হঠাৎ বললেন সোমনাথ ভাদুড়ী।

BanglaBook.org

আজ্ঞে? থতমত খেয়ে যায় সুদীপ।

আপনি তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে।

না, না। আমি—

আপনার স্টোরিটা আগাগোড়াই কনককটেড। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন সব বুঝেও আপনাকে দিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ালাম কেন, তাই না?

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে তখন সুদীপ সোমনাথ ভাদুড়ীর মুখের দিকে। বোবা অসহায় দৃষ্টি।

আপনি বলেছেন তপন ঘোষকে আপনি চিনতেন না। বাট আই অ্যাম শিয়োর, আপনি তাকে চিনতেন; ভাল করেই চিনতেন।

সুদীপ বোবা।

আপনাকে আমি তবু সব জেনেশুনেও কেন আদালতে সাক্ষী দেওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম জানেন? নট ফর ইউ। একটি নিরাপরাধিনী মেয়ে আমাকে বাবা বলে আমার পায়ের উপর কেঁদে পড়ে তার স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে বলেছিল বলে—শুধু সেই মেয়েটির জন্যই। যান—আর কখনো আমার ঘরের দরজা মাড়াবেন না—যান—

সুদীপ উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

বুকটার মধ্যে তখন তার যেন হিম হয়ে গিয়েছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ।

যান।

সুদীপ ঘর থেকে বের হয়ে গেল। আর সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ সোমনাথ ভাদুড়ী। তারপর এক সময় ফিরে তাকালেন সোমনাথ ভাদুড়ী তাঁর সামনে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটির দিকে এবং বললেন, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন রায় মশাই, এই সেই লোক যার মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে শেষ পর্যন্ত মেয়েটির স্বামীকে আমি ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাতে পেরেছি—নচেৎ আইন তাকে এমনভাবে কোণঠাসা করেছিল যে আমিও প্রায় হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু সত্যিই যদি জানতে পারতাম—

কে সে রাত্রে তপন ঘোষকে হত্যা করেছিল সেটাই তো? কিরীটী বলল।

হ্যাঁ রায় মশাই।

আপনার কি মনে হয় বলুন আগে শুনি। আপনি নিশ্চয়ই একটা কিছু ভেবেছেন—কিরীটী বলল।

আমার মনে হয়—

বলুন।

সে-রাত্রে তপন ঘোষকে কে হত্যা করেছিল সম্ভবত সেটা ওই সুদীপ জানে।

কেন কথাটা মনে হলো আপনার মিঃ ভাদুড়ী? কিরীটী বলল।

দেখুন রায় মশাই, সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন, জীবনের অনেকগুলো বছর এই ক্রিমিন্যালদের নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করছি। ক্রিমিন্যালদের চরিত্রের নানাদিক দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছে—অনেক ক্রিমিন্যালকে আদালতে জেরা করে আইনের ম্যারপ্যাঁচে জেলখানা ও ফাঁসির দড়ি থেকেও বাঁচিয়ে দিয়েছি। মিথ্যা বলব না, তাতে করে এক ধরনের ভ্যানিটিরও আস্বাদ হয়ত পেয়েছি অনেক সময়। কিন্তু—

কি? সহাস্যে কিরীটী তাকাল সোমনাথ ভাদুড়ীর দিকে প্রশ্নটা করে।

মানুষের বিবেক বলে যে বস্তুটি মনের মধ্যে আছে, তার কাছে আমাকে জবাবদিহি দিতে হয়েছে। কিন্তু এই কেসটা যেন অন্য ধরনের। বিজিত মিত্র যে নিরপরাধ, মনে মনে কথাটা আমি হয়ত বিশ্বাস করেছিলাম—কিন্তু কেসের প্রমাণাদি তাকে এমনি কোণঠাসা করে দিয়েছিল যে আমি যেন আমার সামনে কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আইনের সাহায্যে কোন্ পথ ধরে লোকটাকে মুক্ত করে আনতে পারি, ওই সঙ্গে বিজিত মিত্রের স্ত্রীর চোখের জল আর কাকুতি আমাকে যেন অস্থির করে তুলেছিল। এমন সময় ওই স্কাউনড্রেলটা এলো—বাধ্য হয়েই কতকটা ওকে আমি গ্রহণ করলাম বিজিত মিত্রকে বাঁচাবার জন্যই। কিন্তু মনের কাছে কিছুতেই যেন সহজ হতে পারলাম না।

ভাদুড়ী মশাই, কিরীটী বললে, সব সময়ই আমাদের মন কি সত্য কথা বলে! এমনও তো হতে পারে আপনি যা ভাবছেন তা সত্য নয়। সত্য হয়ত বিজিত মিত্র হত্যাকারী নয়।

কিন্তু—

কিরীটী বলতে লাগল, ওই সুদীপ রায় লোকটি সত্যিই তার বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ফাঁসির দড়ি থেকে?

ভেবেছি, আমি অনেক ভেবেছি কথাটা রায় মশাই—কিন্তু তবু আপনি যা বলছেন সেটা মেনে নিতে যেন পারিনি।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, ঠিক আছে। যদিও অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে, আমাদের একটিবার চেষ্টা করে দেখতে কোন ক্ষতি নেই। মামলার সমস্ত রিপোর্টই তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার কাছে আছে।

হ্যাঁ আছে—সম্পূর্ণ মামলার নথিটা আমি একটা ফাইল করে রেখেছি আপনার এখানে আসবার পূর্বে। এই সেই নথি—বলে একটা বিরাট ফাইল এগিয়ে দিলেন সোমনাথ ভাদুড়ী কিরীটীর দিকে।

কিরীটী হাত বাড়িয়ে ফাইলটা টেনে নিল।

ভাদুড়ী আবার বললেন, আমি জানি ওই ফাইলটা খুঁটিয়ে পড়লেই হয়ত আসল সত্যটা আপনার দৃষ্টির সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কিরীটী বললে, রাত হলো, তাহলে উঠি ভাদুড়ী মশাই।

উঠবেন?

হ্যাঁ।

কিরীটী উঠে দাঁড়াল।—একপক্ষে ভালই হলো। ঘটনাচক্রে লোকটিও আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তবে এটুকু অস্পষ্ট নেই আমার কাছে যে, বিজিত মিত্র ছাড়া পেল কিনা কেবল সে কথাটুকু আপনার মুখ থেকে শোনবার জন্যই আজ লোকটি এখানে আসেনি।

সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ—মামলার রায় যে এখনো বের হয়নি সেটা অনুমান করতে পেরেছিল, আর রায় বেরুলে সেটাও সে খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদ থেকেই একদিন-না-একদিন জানতে পারত। লোকটা কেন এসেছিল জানেন ভাদুড়ী মশাই?

BanglaBook.net

কেন?

আপনি নিজে তার সাক্ষ্যদানের ব্যাপারটা কি ভাবে নিয়েছেন সেটাই জানবার জন্য।

সত্যি বলছেন?

মনে তো হয় তাই। আচ্ছা চলি—

কিরীটী গাড়িতে উঠে বসল। সর্দারজী গাড়ি ছেড়ে দিল।

সোমনাথ ভাদুড়ী কিন্তু আরো কিছুক্ষণ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েই রইলেন।

॥ তিন ॥

গৃহে ফিরতেই কৃষ্ণা শুধাল, হঠাৎ সোমনাথ ভাদুড়ী তোমাকে ফোন করে ডেকেছিলেন কেন?

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, চল, আগে খেয়ে নেওয়া যাক।

আহারাদির পর দুজনে এসে বসবার ঘরে দুটো সোফায় মুখোমুখি বসল।

জংলী এসে দু'কাপ কফি রেখে গেল। কফির পাত্র শেষ করে কিরীটী একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করল।

বাইরে শীতের রাত্রি—ঝিমঝিম করছে যেন।

কিরীটী একসময় বললে, ভাদুড়ী মশায় একটা খুনের মামলার ব্যাপারে আমাকে ডেকেছিলেন। তবে আদালতে একপ্রস্থ ব্যাপারটার চরম নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে—মানে আজ আদালত তার রায় দিয়েছে। হত্যাকারী বলে যে ব্যক্তি ধৃত হয়েছিল—দীর্ঘদিন ধরে যার বিচার হয়েছে—আদালত তাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে মুক্তি দিয়েছে।

তবে?

সেই তবেই ভাদুড়ী মশায়ের প্রশ্ন, কৃষ্ণা।

বুঝলাম না ঠিক। কৃষ্ণা বলল।

মামলায় আসামীর বিরুদ্ধে এমন সাক্ষ্য-প্রমাণাদি ছিল যে সোমনাথ ভাদুড়ীর মত দুঁদে ল'ইয়ারও হালে পানি পাচ্ছিলেন না। এমন সময় এক সাক্ষীর আবির্ভাব—

কি রকম?

সে এসে সোমনাথ ভাদুড়ীকে বলল, আসামী নির্দোষ—সে সাক্ষী দেবে। সোমনাথ ভাদুড়ী কিন্তু খুশি হলেন না—যদিও আসামীর স্ত্রী চোখের জলের মিনতিতে তিনি তখন রীতিমত বিচলিত—আপ্রাণ চেষ্টা করছেন আইনের কোন ফাঁক বের করতে, যাতে করে আসামীকে মুক্ত করে আনতে পারেন।

তারপর—

আসামী ওই লোকটির সাক্ষ্যর জোরেই শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেল—কিন্তু ভাদুড়ী মশাইয়ের মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব থেকে গিয়েছে।

কিসের দ্বন্দ্ব?

সাক্ষী যা বলছে তা পুরোপুরি সত্য নয়। দেখ, যা বুঝলাম, তা হচ্ছে—

কি?

ওই সাক্ষীকেই সোমনাথ ভাদুড়ী সন্দেহ করছেন।

সত্যি?

হ্যাঁ।

ওই ফাইলটা বোধ হয় সেই মামলার? কৃষ্ণা শুধালো।

হ্যাঁ।

রাত্রের ঘুমও তাহলে গেল আজ—

না, না—তুমি শুয়ে পড়গে কৃষ্ণা—আমি ফাইলগুলো একটু উল্টেই আসছি।

ঠিক আছে। বেশী দেরি করো না কিন্তু!

কিরীটী সহধর্মিণীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

ফাইলের টাইপ করা পৃষ্ঠাগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে অন্যমনস্কভাবে একটা পাতায় এসে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো।

আদালতের প্রশ্ন : আপনার নাম?

উত্তর : শ্রীমতী দেবিকা মিত্র।

আসামীর কাঠগড়ায় যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে আপনি চেনেন?

চিনি। আমার স্বামী।

কতদিন আপনাদের বিবাহ হয়েছে?

সাত বছর।

ছেলেপুলে?

না। কোন সন্তান হয়নি আদৌ।

সন্তান চান না আপনারা?

চাই বৈকি।

তা কোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেননি?

নিয়েছিলাম। ডাঃ গোরাচাঁদ নন্দী, স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ।

তিনি কি বলেছিলেন পরীক্ষা করে?

বলেছিলেন—

বলুন।

আমাদের নাকি কখনো কোন সন্তানাদি হবার আশা নেই।

কেন?

তা তিনি বলেননি।

কিরীটী দ্রুত কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টে গেল। নিশ্চয়ই আদালত ডেকেছিল ডাঃ নন্দীকে তার সাক্ষ্য দেবার জন্য। তার অনুমান মিথ্যা নয়।

পাওয়া গেল—ডাঃ নন্দী তার পুরাতন রেকর্ড দেখে বলেছেন, ওদের সন্তান হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কারণ—বিবাহের আগেই বিজিত মিত্র কুৎসিত এক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল কিন্তু তখন চিকিৎসা করেননি ভদ্রলোক—ফলে সেই রোগ স্ত্রীর দেহে সংক্রামিত হয়, পরে অবিশ্যি বেশ কিছুদিন পরে চিকিৎসা করান দুজনই। কিন্তু ঐ রোগ

যা ক্ষতি করবার করে দিয়েছিল—স্বামীর প্রজনন-শক্তি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

আদালতের প্রশ্ন, আপনি কথাটা বলেননি ওদের?

স্বামীকে বলেছিলাম।

চিকিৎসা কোনরকম করেননি?

করেছিলাম কিন্তু কোন ফল হয়নি।

লোকটির চরিত্র কিরীটীর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিরীটী একটা সিগারে নতুন করে অগ্নিসংযোগ করে।

দেওয়াল-ঘড়িটা ঢং করে একটা শব্দ তুলে থেমে গেল সময়ের সমুদ্রে।

বাইরে শীতের ঝিমঝিম রাত।

কিরীটী আবার অন্যমনস্কভাবে ফাইলের পাতা ওল্টাতে থাকে আর মনের মধ্যে তার অলক্ষ্যে একটা অদেখা মানুষের ছবি যেন একটু অন্ধকারে স্পষ্ট আকার নিতে থাকে, আজ রাত্রেই সোমনাথ ভাদুড়ীর মুখ থেকে শোনা কাহিনী থেকে।

মানুষটার চেহারা—সোমনাথ ভাদুড়ী বলেছিলেন, অত্যন্ত সাদামাটা—মোস্ট আনইমপ্রেসিভ যাকে বলে। গাল দুটো ভাঙা—কিছুটা যেন গর্তে ঢোকানো। পাতলা ভ্রূ। গোল বর্তুলাকার দুটি চক্ষু। কিন্তু চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। গালের হনু দুটো বদ্বীপের মত যেন ঠেলে উঠেছে।

মাথায় পাতলা চুল। শরীরটার উপর মনে হয় অনেক অত্যাচার হয়েছে।

কিন্তু আপনাকে তো আগেই বলেছি রায়মশাই, ওই হত্যা-মামলা আমার হাতে নেবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, নিতামও না, কিন্তু মেয়েটি এসে হঠাৎ একদিন আমার চেম্বারে দু'পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে পড়ল।

কে? কি ব্যাপার? আরে, উঠুন—উঠুন।

আমার স্বামীকে আপনি বাঁচান, বাবা।

উঠুন—বলুন কি হয়েছে আপনার স্বামীর?

না। আগে বলুন দয়া করবেন।

কি হয়েছে আপনার স্বামীর?

খুনের মামলার আসামী সে আজ।

খুনের মামলা!

হ্যাঁ বাবা, আমার স্বামীর চরিত্রের মধ্যে যত দোষই থাক—সে ওই তপন ঘোষকে খুন করেনি।

উঠে বসুন। ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুন।

আগে আমাকে কথা দিন।

ঠিক আছে, তুমি উঠে বসো।

মেয়েটি উঠে বসে মাথার ঘোমটা খুলে দিল। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে—কিন্তু মধ্য-যৌবন অতিক্রান্ত হতে চললেও যেমন এখনও দেহের বাঁধুনি, তেমনি রূপ, রূপের যেন অবধি নেই। দু'চোখে অবিরত অশ্রু ঝরে চলেছে।

মেয়েটি বলল, বাবা, এ সংসারে আমার আর কেউ নেই—ওই স্বামী ছাড়া। গরীবের

মেয়ে। দয়া করে উনি আমাকে বিয়ে না করলে হয়ত শেষ পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে হতো—কিংবা—

কি নাম তোমার স্বামীর?

বিজিত মিত্র—

সোমনাথ ভাদুড়ীর মনে পড়লো মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই আদালতে এক অ্যাডভোকেটের মুখে শুনেছিলেন ওই কেসটা সম্পর্কে।

বিচার চলেছে তার আদালতে।

মেয়েটি তখন আবার বলল, বাবা, আপনার ফিস দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তবু এসেছি আপনার কাছে—এই গরীবকে দয়া করুন।

সোমনাথ ভাদুড়ী বলেছিলেন, তুমি দু'দিন বাদে এসো।

বাবা!

বললাম তো দিন দুই বাদে এসো।

মেয়েটির হাতে দু'গাছি সোনার বালা ছিল। সে দুটি হাত থেকে খুলতে দেখে সোমনাথ ভাদুড়ী বাধা দিলেন, কি করছো—

মেয়েটি বলল, বাবা, এই বালা জোড়া রাখুন; এ দুটো বেচে—

না—ও তুমি হাতে পরে নাও, কোন টাকা-পয়সা লাগবে না তোমার। কি নাম তোমার?

দেবিকা।

মেয়েটি সোমনাথ ভাদুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল।

সোমনাথ ভাদুড়ী পরে বলেন, পরের দিন আদালতের যে ঘরে মামলাটা চলছিল সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। আসামীর কাঠগড়ায় লোকটা দাঁড়িয়েছিল, ভেরি ফারস্ট শাইটেই আমার মনে হয়েছিল রায়মশাই, লোকটা দুশ্চরিত্র এবং যে কোন ক্রাইমই ওর দ্বারা সম্ভব। ভাঙা গাল, হনু দুটো ঠেলে উঠেছে? বাঁদিককার গালে একটা জড়ুল আছে—সেই জড়ুলে গোটা দুই বড় বড় লোম।

কিরীটী মনে মনে ভাবে, ভাদুড়ী মশাইয়ের অনুমান হয়ত মিথ্যা নয়, তপন ঘোষকে যখন হত্যা করা হয় সেরাত্রে ওই বিজিত হয়ত সেখানে উপস্থিত ছিল।

মৃণাল মেয়েটি একটি বারবনিতা। দুশ্চরিত্রা মেয়ে।

অনেকেই রাত্রে তার ঘরে যেত। তাদের দলে হয়ত বিজিত, সুদীপ ও তপন ঘোষ ছিল। তারাও হয়ত ওই মৃণাল নামে বারবনিতার ঘরে যাতায়াত করত।

সুদীপ যে তার জবানবন্দিতে বলেছে তপন ঘোষকে সে চিনত না, কথাটা হয়ত মিথ্যা। মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বার ভয়েই হয়ত সুদীপ সত্য কথাটা প্রকাশ করেনি।

তাছাড়া সত্যিই যদি সুদীপ সম্পূর্ণ নির্দোষ থাকত—বন্ধু ও সহকর্মীকে বাঁচানোর জন্য সে অনেক আগেই বিজিতের নির্দোষিতা প্রমাণের চেষ্টা করত।

সম্ভবত ওই খুনের ব্যাপারে সুদীপ জড়িত ছিল বলেই কোন-না-কোন ভাবে প্রথমটায় সে আদালতের ধারে-কাছেও যায়নি।

পরে যে সে সোমনাথ ভাদুড়ীর কাছে গিয়ে সাক্ষী দেবার কথা বলেছে ওই মামলায়,

তার পশ্চাতেও হয়ত কোন কারণ ছিল।

কোন গূঢ় স্বার্থ!

যাহোক, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সুদীপ এবং বিজিত দুজনাই ওই হত্যা-মামলার সঙ্গে জড়িত।

ওই হত্যা-মামলায় সবচাইতে বড় প্রশ্ন হচ্ছে ওই বারবনিতা মেয়েটি—মৃণাল।

গুলির শব্দের পর পাশের ঘরের লোকেরা ভীত হয়ে পুলিসকে খবর দেয়। পুলিস এসে দেখে তপন ঘোষ মৃত, রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে আর তার পাশে জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে আছে বিজিত মিত্র।

তার জামা কাপড়ে রক্তের দাগ। হাতে ধরা পিস্তল একটি, সে পিস্তল থেকে গুলি চালিয়েই তপন ঘোষকে হত্যা করা হয়েছিল এবং ঘরের মধ্যে মৃণাল নামে মেয়েটি নেই।

মৃণাল একেবারে উধাও।

কোথায় গেল মৃণাল?

সে কি পালিয়েছে—না কারোর পরামর্শে কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছে? যদি কারো পরামর্শেই গা-ঢাকা দিয়ে থাকে তো কার পরামর্শে?

পুলিস নাকি এখনো চারিদিকে মৃণালকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সোমনাথ ভাদুড়ীর ধারণা—মৃণাল হত্যাকারী নয়। তবে সম্ভবত মৃণাল হয়ত হত্যা করতে দেখেছে।

কিগো, আজ কি শুতে যাবে না?

কৃষ্ণার গলা শুনে কিরীটী তাকাল কৃষ্ণার মুখের দিকে।

কিরীটী বলল, অনেক রাত হয়েছে, না!

অনেক রাত মানে—সোয়া তিনটে বাজে!

বল কি!

চল! এবারে একটু শোবে চল।

আর কি ঘুম হবে কৃষ্ণা, বেড়াতে বেরুবার সময় হলো।

সারাটা রাত না ঘুমিয়ে এখন বেড়াতে বেরোবে! কৃষ্ণা বললে।

তাহলে আজ আর না হয় না-ই বেড়াতে বেরুলাম। জংলীকে বলো কফি দিতে।

কৃষ্ণা কোনো কথা বললো না, ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

জংলীকে তোলেনি কৃষ্ণা, নিজেই কফি করে নিয়ে এল দু'কাপ।

কফির কাপটা কিরীটীর হাতে তুলে দিয়ে মুখোমুখি অন্য একটা সোফায় বসলো কৃষ্ণা।

রাত্রিশেষের ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে। হাওয়ায় এখনো বেশ শীতের আমেজ আছে—যদিও ফাল্গুন মাস পড়ে গিয়েছে।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে কৃষ্ণা বললে, দেখ ভাবছিলাম, কিছুদিনের জন্য এ সময় বেনারস গিয়ে ঘুরে এলে কেমন হয়, ঠাণ্ডা আছে কিন্তু তীব্রতা নেই।

তা মন্দ হয় না—কিন্তু—

ভাদুড়ী মশাইয়ের মামলার কথা ভাবছো?

BanglaBook.net

হ্যাঁ। মানে—

ওখানে বসেই না হয় ভাববে।

কেবল ভাবলেই তো হবে না, একটা কনক্লুশনে পৌঁছতে হবে তো?

কৃষ্ণা হেসে বললে, বাবা বিশ্বনাথের চরণে বসে দেখো, তোমার কনক্লুশন ঠিক এসে যাবে। তাছাড়া—

কি, থামলে কেন, বল। কথাটা বলে কিরীটী কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকাল।

তোমার কাহিনীর ঐ মৃণাল মেয়েটি—এমনও তো হতে পারে শেষ-মেশ গিয়ে ঐ বিশ্বনাথের চরণেই আশ্রয় নিয়েছে—

মৃণালের জন্য আমি তত ভাবছি না কৃষ্ণা।

ভাবছো না!

না। ঘটনাস্থলে সে ছিলই সে-রাত্রে। কাজেই নিহত তপন ঘোষের দু'-এক ফোঁটা রক্ত কি তার গায়ে আর লাগেনি! লেগেছে নিশ্চয়ই—সে-রক্তের দাগ সে মুছবে কেমন করে। সেই রক্তের দাগ থেকেই ঠিক তাকে আমি চিনে নিতে পারবো। যাকগে সে কথা। তুমি টিকিটের ব্যবস্থা করো—আমরা যাবো।

ঠিক তো?

ঠিক।

পরের দিন বিকালে।

কিরীটী আবার গোড়া থেকে মামলার কাগজগুলো পড়ছিল—সোমনাথ ভাদুড়ী আদালত-ফেরতা এসে কিরীটীর গৃহে হাজির হলেন।

আসুন আসুন ভাদুড়ী মশাই। মনে হচ্ছে কোন সংবাদ আছে।

ভাদুড়ী একটা সোফায় বসতে বসতে বললেন, সংবাদটা বোধ হয় তেমন কিছু নয় রায়মশাই। তবু মনে হলো—আপনাকে যাবার পথে জানিয়ে যাই—তাই এলাম।

কিরীটী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ভাদুড়ী মশাইয়ের দিকে।

আজ দুপুরে আদালতে বিজিতের স্ত্রী—

কে, দেবিকা—

হ্যাঁ। দেবিকা এসেছিল আমার কাছে।

কেন?

বিজিত নাকি ঘরে ফিরে যায়নি জেল থেকে খালাস পাবার পর।

যায়নি!

না। সে জানত না বিজিত ছাড়া পেয়েছে। আজ আলিপুর সেনট্রাল জেলে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানতে পারে গতকালই বিকালের দিকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে আদালতের রায় বেরুবার পরই বেলা পাঁচটা নাগাদ। কিন্তু আজও সে ঘরে ফেরেনি—তাই দেবিকা এসেছিল আদালতে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি তখন সেনট্রাল জেলে অমিয়নাথবাবুকে ফোন করি।

তিনি কি বললেন?

জেল-গেটের অদূরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে এক ভদ্রমহিলা নাকি অপেক্ষা করছিলেন—ভদ্রমহিলা!

জেলের প্রহরী সেইরকমই বলেছে। ভদ্রমহিলার মাথায় নাকি ঘোমটা ছিল। গায়ে একটা ব্লু রঙের র‍্যাপার ছিল।

তারপর—

বিজিত মিত্র জেল থেকে বেরিয়ে যখন রাস্তার দিকে চলেছে, ভদ্রমহিলা ট্যাক্সি থেকে নেমে বিজিতের নাম ধরে ডাকতেই সে সোজা গিয়ে ট্যাক্সিতে নাকি উঠে বসে। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে।

ট্যাক্সি—গুণ্ঠনবতী মহিলা!

হ্যাঁ।

কিন্তু সেই মহিলা ঠিক ওই সময়ই বিজিত মিত্রকে ছাড়া হবে জানলেন কি করে? কিরীটীর প্রশ্ন।

ঐ ভদ্রমহিলাই কিনা জানা যায়নি, তবে আগের দিন নাকি এক ভদ্রমহিলা বেলা পাঁচটা নাগাদ এসেছিলেন জেলখানায়—জেলারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। জেলারের মুখ থেকেই নাকি সে শুনেছিল আদালতের রায়ে তাকে মুক্তি দিলেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে জেল থেকে।

মামলার রায় পরের দিনই বেরুবে আপনার অমিয়বাবু কি জানতেন?

জানতেন আর এ-ও জানতেন বিজিত মিত্র বেকসুর খালাস পাবে।

কি করে জানলেন?

আমিই বলেছিলাম।

আপনি?

হ্যাঁ। অমিয়বাবু যেদিন রায় বের হয় তার আগের দিন সকালে আমাকে ফোন করেছিলেন।

আশ্চর্য!

কি?

হঠাৎ অমিয়বাবু আপনাকে ফোন করতে গিয়েছিলেন কেন, বিশেষত ওই বিচারাধীন কয়েদী সম্পর্কে! কথাটা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেননি?

না।

কিরীটী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বললে, চলুন।

কোথায়?

অমিয়বাবুর কোয়ার্টারে—তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

বেশ, চলুন। কিন্তু এখুনি যাবেন?

হ্যাঁ।

সোমনাথ ভাদুড়ী উঠে দাঁড়ান।

জেলের নিকটেই অমিয়বাবুর কোয়ার্টার। অমিয়বাবু গৃহেই ছিলেন। সোমনাথ ভাদুড়ী

BanglaBook.org

কিরীটীকে নিয়ে এসে তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন।

অমিয় চক্রবর্তী তাঁর বসবার ঘরে বসে ওইদিনকার সংবাদপত্রটা পড়ছিলেন। বয়স অনুমান চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশের মধ্যে হবে তাঁর।

বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট গোলগাল চেহারা। একজোড়া বেশ ভারী গোঁফ। লম্বা জুলপী। জুলপীর চুলে কিছু কিছু পাক ধরেছে। চোখে চশমা।

সোমনাথ ভাদুড়ীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সহাস্যে সম্বোধন করলেন, মিঃ ভাদুড়ী যে—আসুন—আসুন। তারপরই কিরীটীর প্রতি নজর পড়াতে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

পরিচয় করিয়ে দিই অমিয়বাবু—

অমিয়বাবু বললেন, পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না মিঃ ভাদুড়ী। সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও ওঁকে আমি চিনি। আজ ওঁকে চেনে নাই বা কে? কিরীটীবাবু, বসুন—বসুন।

সোমনাথ ভাদুড়ী ও কিরীটী উপবেশন করে।

অমিয়বাবু! সোমনাথ বললেন।

বলুন—

তপন ঘোষ হত্যা-মামলার আসামী বিজিত মিত্রকে কাল বিকালে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ—আপনাকে তো সে-কথা বলেছি।

সেজন্য আমরা আসিনি অমিয়বাবু। এসেছি অন্য একটা ব্যাপারে, কিরীটী এবার কথা বললে।

কি বলুন তো?

পরশু, মানে বিজিতবাবুকে যেদিন ছেড়ে দেওয়া হয় তার আগের দিন এক ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন?

হ্যাঁ—আমার কোয়ার্টারে—বিজিতবাবুর সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করতে। মানে যদি সে আদালত থেকে মুক্তি পায় তো কখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে—সেটাই জানতে।

সেই মহিলার ঠিক বয়স কত হবে বলে আপনার মনে হয় অমিয়বাবু? প্রশ্ন করল কিরীটী।

বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশ হবে। দোহারা পাতলা চেহারা, বেশ সুন্দর দেখতে। পরনে একটা দামী শাড়ি, পায়ে চপ্পল।

আচ্ছা অমিয়বাবু, তার চেহারার মধ্যে বিশেষ কিছু আপনার নজরে পড়েছিল কি? কিরীটী প্রশ্ন করল।

না। সেরকম তো কিছু মনে পড়ছে না। তবে—

কি? কিরীটী সোৎসুক ভাবে তাকাল অমিয়বাবুর মুখের দিকে।

আমার নজরে পড়েছিল তাঁর বাঁ হাতে উল্কিতে লেখা ছিল একটা ইংরেজী অক্ষর 'এম'।

'এম'! কথাটা মৃদু গলায় উচ্চারণ করে কিরীটী সোমনাথের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ। অমিয়বাবু বললেন।

আর কিছু—তার মুখের ঢংটা?

না। তার মুখটা আমি দেখতে পাইনি।

কেন?

মুখে ঘোমটা ছিল। চিবুকটা কেবল নজরে পড়েছে। উপরের ও নীচের ঠোঁট ও চিবুকের কিছুটা অংশ।

তার চলার বা বসবার—দাঁড়াবার ভঙ্গি?

না, আমি সেটা তেমন লক্ষ্য করিনি কিরীটীবাবু। আর তিনি বসেননি—আগাগোড়া দাঁড়িয়েই ছিলেন মুখে ঘোমটা টেনে। মনে হচ্ছিল তিনি যেন আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক।

তাঁর নামটা জিজ্ঞেস করেননি? কোন পরিচয় দেন নি?

নাম বলেননি। আমি জিজ্ঞাসাও করিনি। তবে অবিশ্যি বলেছিলেন তিনি বিজিতবাবুর স্ত্রী।

কিরীটী সোমনাথ ভাদুড়ীর দিকে তাকাল।

দুজনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

চলুন ভাদুড়ী মশাই, এবার যাওয়া যাক। কিরীটী বললে।

॥ চার ॥

ধন্যবাদ জানিয়ে অমিয়বাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুজনে বের হয়ে এলেন।

গাড়িতে উঠতে উঠতে কিরীটী বললে, আপনি তো দেবিকাকে দেখেছেন ভাদুড়ী মশাই?

হ্যাঁ। আজও তো মেয়েটি আদালতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কখনো সে মাথায় ঘোমটা দিয়ে আসেনি। তাছাড়া তার হাতে কোন উল্কি দেখিনি। তার রং অবিশ্যি ফর্সাই। আমার মনে হয় সে দেবিকা নয় রায় মশাই।

আমারও তাই অনুমান। কিরীটী বললে, তাই ভাবছি কে হতে পারে মেয়েটি?

ভাদুড়ী মশাই!

বলুন।

মৃণালের চেহারার কোন ডেসক্রিপশন আপনার জানা আছে?

মেয়েটিকে তো আমরা কেউ দেখিনি।

আচ্ছা ঘটনার দিন পাশের ঘরে যে ভদ্রলোক ও মেয়েটি ছিল?

অবিনাশ সেন আর মিনতি দত্ত।

মেয়েটির নাম মিনতি দত্ত?

হ্যাঁ।

সে মেয়েটি তো মৃণালের পাশের ঘরেই থাকত। সেও রূপোপজীবিনী ছিল।

তার সাক্ষ্যও তো নেওয়া হয়েছে আদালতে।

জানি। আমি বলছিলাম—

কি বলুন?

মৃণালের ডিটেলস ওই মিনতির কাছে পাওয়া যেতে পারে।

pathagar.net

তা অবিশ্যি পারে। তা এখনো তো বেশী রাত হয়নি। সেই পল্লীটা একবার ঘুরে যাবেন নাকি? সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন।

গেলে আমার মনে হয় ভালোই হতো।

বেশ, চলুন।

সোমনাথ ভাদুড়ী ড্রাইভার সমরেশকে বললেন, কলেজ স্ট্রীটে যে শিবমন্দিরটা আছে সেদিকে যেতে।

গলিটা কুখ্যাত ছিল এককালে! বর্তমানে অবিশ্যি আর ততটা নেই—তাহলেও সেখানকার পুরাতন বাসিন্দারা কিছু কিছু সেখানে এখনো ছড়িয়ে আছে।

গলির মধ্যে গাড়ি নিলেন না সোমনাথ ভাদুড়ী। ট্রাম রাস্তার উপরেই একপাশে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দুজনে হেঁটে চললেন। সন্ধ্যার পর থেকেই গলিটাতে মানুষের চলাচল যেন বৃদ্ধি পায়। সোমনাথ ভাদুড়ী বাড়িটা ঠিক চিনতেন না কিন্তু বাড়ির নম্বরটা মনে ছিল। নম্বরটা খুঁজে পেতে দেরি হল না।

একটা দোতলা লাল রংয়ের পুরনো বাড়ি!

মিনতিকে একটি মেয়ে ডেকে দিল।

মিনতি বোধ হয় ঘরে বসে সাজসজ্জা করছিল। ডাক শুনে বের হয়ে এলো।

কি রে চাঁপা!

এই ভদ্রলোক দুটি তোকে খুঁজছেন।

মিনতি তাকাল। সোমনাথ ভাদুড়ীকে আদালতে দেখেছে। চিনতে তার কষ্ট হলো না। বললে, উকিলবাবু—

মিনতি, তোমার সঙ্গে আমাদের কিছু কথা আছে।

মিনতি মুহূর্তকাল যেন কি ভাবলো! তারপর বললে, আসুন উকিলবাবু ঘরে।

তিনজনে মিনতির ঘরে প্রবেশ করল।

ঘরটি বেশ গোছানো। ছিমছাম। একদিকে একটি পালঙ্ক পাতা। উপরে ধবধবে শয্যা পাতা। দুটি দুটি চারটি মাথার বালিশ, একটি মোটা পাশ-বালিশ। একধারে একটি কাঁচের পাল্লাওয়ালা আলমারি। কিছু রুপোর, কাঁচের ও কাঁসার বাসনপত্র। নানা ধরনের পুতুল, খান দুই চেয়ারও আছে একধারে।

বসুন উকিলবাবু। একটু চায়ের জোগাড় করি।

না না মেয়ে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন চেয়ারে বসতে বসতে।

মিনতি আর কথা বলে না। ওদের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকায়।

মিনতি—

বলুন!

এই ভদ্রলোক তোমাকে মৃণালের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান। সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন।

মৃণাল!

কিরীটী দেওয়ালে একটা ফটোগ্রাফের দিকে তাকিয়েছিল। সেই ফটোর দিকে তাকিয়েই

কিরীটী প্রশ্ন করল, ওই ফটোটার একজনকে তো চিনতে পারছি—মনে হচ্ছে তুমিই, তাই না?

মিনতি বললে, হ্যাঁ, আমিই। আমার পাশে—

তোমার বোন বা কোন আত্মীয়া বুঝি? কিরীটী বললে।

না। আমার পাশে ওই মৃণাল। মিনতি বললে।

মৃণাল! মানে যে মেয়েটি—

ঠিকই ধরেছেন। যে মৃণালকে নিয়ে এতদিন ধরে মামলা চললো। যার খোঁজ পাওয়া যায়নি—

ফটোটা কবেকার তোলা? কতদিনের?

তা প্রায় বছর দুই হবে। হঠাৎ একদিন মৃণালের খেয়াল হলো একটা ফটো তুলবে আমাকে নিয়ে—কথাটা বলতে বলতে মিনতির চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে।

বছর দুই আগেকার ও ফটো তাহলে?

হ্যাঁ। মৃণালই একদিন আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে হ্যারিসন রোডের একটা স্টুডিও থেকে ফটোটা তোলায়। একটা কপি তার ঘরে ছিল, অন্যটা আমার ঘরে আমি বাঁধিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু—

কি?

পুলিসের লোক খানা-তল্লাসী করতে এলে ফটোটা কিন্তু তার ঘরে পায় না। মনে হয় বাড়ি ছেড়ে সে-রাত্রে যাবার আগে ফটোটা সে সঙ্গেই নিয়ে গিয়েছে।

পুলিস সেদিন তোমার ঘর খানা-তল্লাসী করেনি?

করেছিল।

ওই ফটো সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেনি?

না।

মৃণালের সঙ্গে মনে হচ্ছে তোমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল, তাই না?

ঠিক ধরেছেন, পুলিশকেও বলেছি—আপনাকেও বলছি, মৃণাল অত্যন্ত লক্ষ্মী ও শান্ত স্বভাবের ছিল। এ বাড়িতে একমাত্র আমার সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে মিশতো না, কথাও বলতো না বড় একটা।

মৃণাল তো তোমার পাশের ঘরেই থাকত?

হ্যাঁ।

ওই ঘরে এখন কে আছে?

কেউ নেই, ঘরটা আজও খালিই পড়ে আছে মৃণাল চলে যাবার পর থেকে।

কেন?

কেউ ও-ঘরে থাকতে চায়নি। মৃণাল খুব ভাল গান গাইতে পারত—নাচতেও পারত। আজও মধ্যে মধ্যে রাত্রে নাকি ওর ঘর থেকে ঘুঙুরের শব্দ শোনা যায়।

তুমি শুনেছো?

না। সত্যি বলবো, আমি কোনদিন কিছু শুনিনি। কিন্তু মৃণালের কথা এত শুনতে চাইছেন কেন?

কথাটা তাহলে তোমাকে খুলেই বলি, কিরীটী বলল—তপন ঘোষের হত্যাকারীকে আজও পুলিস সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু বাবু, বিশ্বাস করুন, মৃণাল তপনবাবুকে হত্যা করেনি।

আমিও সে-কথাটা বিশ্বাস করি—কিরীটী বলল।

বিশ্বাস করেন?

করি, আর তাই তো মৃণালের সন্ধান আমিও করছি।

আপনি—

সোমনাথ ভাদুড়ী ওই সময় বললেন, এই ভদ্রলোকের পরিচয় তুমি জান না। কিরীটী রায়ের নাম শুনেছ?

না তো!

উনি সত্যসন্ধানী। সে-রাত্রে পাশের ঘরে সত্যই কি ঘটেছিল উনি সেটাই জানবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু বাবু, আমি তো মৃণালের কোন সন্ধানই জানি না। বিশ্বাস করুন।

হয়তো জানো না, কিরীটী বললে, কিন্তু তুমি মৃণালের কথা যতটা জানো—অন্য কেউ হয়ত সেটা জানে না।

মিনতি বললে, পাশের ঘরে ছিল মৃণাল। দিনের বেলাটা প্রায়ই তার আমার ঘরেই কেটে যেত—তবে—

কি?

বড় চাপা মেয়ে ছিল মৃণাল। তাছাড়া নিজের কথা বড় একটা বলতো না কখনও। বিশেষ করে এখানে আসার আগে তার সব কথা জানায়নি।

তুমি জিজ্ঞাসা করোনি কখনো সে-সব কথা তাকে? কিরীটীর প্রশ্ন।

না। আর জিজ্ঞাসা করেই বা কি করবো বলুন।

কেন?

এ লাইনে যারা আসে তাদের ইতিহাস তো প্রায় সকলেরই এক—অন্যরকম আর কি হবে।

আচ্ছা তোমার কি মনে হয়? হঠাৎ সে পালাল কেন?

আমার মনে হয় বাবু, খুনখারাপি দেখে হঠাৎ ভয় পেয়ে হয়ত সে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে।

আচ্ছা মিনতি, কিরীটী বলল, এমন তো হতে পারে তপন ঘোষের খুনের ব্যাপারে সে-রাত্রে ওই মৃণালও জড়িত ছিল বা তার পরোক্ষ হাত ছিল?

না, না বাবু, না। কখনো তা হতে পারে না। মৃণালকে তো আমি জানি।

সে-রাত্রে কি ঘটেছিল বা না ঘটেছিল তুমি তো আর কিছু দেখনি!

তা হলেও আমি জোর গলায় বলতে পারি—মৃণাল সম্পূর্ণ নির্দোষ, সে ওই ধরনের মেয়েই নয়, অমন শান্ত স্বভাবের মেয়েকে—না বাবু, না।

তুমি তো একটু আগে বললে, তোমাদের মধ্যে খুব ভাব ছিল!

হ্যাঁ। পাশাপাশি ঘরে থাকতাম। দিনের বেলা বেশীর ভাগ সময় তো সে আমার ঘরেই

থাকত, আমার সঙ্গে খেতো—এক বিছানায় দুজনে শুয়ে থাকতাম।

মৃণালের ঘরে কে আসতো নিশ্চয় তুমি জানতে?

জানতাম বৈকি, তপনবাবুরই যাতায়াত ছিল তার ঘরে।

আর কেউ আসতো না? বিজিতবাবু?

আসতো। তবে মধ্যে মধ্যে।

তপন ঘোষ তখন থাকত?

না। তপন ঘোষ থাকলে বিজিতবাবু আসতো না। তবে একটা কথা। আমার মনে হয় বিজিতবাবুর উপরে মৃণালের বোধ হয় একটা দুর্বলতা ছিল।

হুঁ। আচ্ছা মিনতি—সুদীপবাবুকে কখনো মৃণালের ঘরে আসতে দেখেছো?

দেখেছি।

একা একা?

না—তপন ঘোষের সঙ্গেই বারকয়েক আসতে দেখেছি।

আদালতে সাক্ষী দেবার সময় তো কথাটা তুমি বলোনি!

না, বলিনি।

কেন, কেবল বিজিতবাবুর কথাই বা বলেছিলে কেন?

মিনতি চুপ করে থাকে।

অবিশ্যি তোমার আপত্তি থাকলে আমি শুনতে চাই না।

না, তা নয়—

তবে?

আমার মনে হয় বাবু—বিজিতবাবু কোন চোরাকারবারে লিপ্ত ছিল—তপনবাবুর সঙ্গে তাঁর হয়ত সেই নিয়েই শেষ পর্যন্ত খুনোখুনি হয়েছে। আদালতে সে-কথাটা আমি বলেছিলামও।

আর কেউ কখনো মৃণালের ঘরে আসেনি? আসতে দেখনি?

না।

মৃণালের আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না?

জানি না? বলতে পারবো না।

তার দেশ বা বাড়ি কোথায় ছিল জানো?

না, সেও কোনদিন তার বাড়িঘরের কথা বলেনি, আমিও সে-সব কথা কখনো তাকে শুধাইনি।

কতদিন এখানে মৃণাল ছিল?

তা প্রায় আড়াই বছর তো হবেই।

তার আগে কোথায় ছিল সে?

জানি না।

কথাটা তুমি তাকে কখনো জিজ্ঞাসা করনি?

না।

জানবার কখনো ইচ্ছা করেনি তোমার?

BanglaBook.org

না।

তার অতীত জীবনের কথা তাহলে তুমি কিছুই জানো না?

না।

কিছু না?

কথায় কথায় একদিন সে বলেছিল—

কি?

তার স্বামী তাকে প্রচণ্ড মারধোর করতো প্রতি রাত্রে মাতাল হয়ে ঘরে ফিরে এসে। এক রাত্রে মারধোর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে দরজায় তালা দিয়ে চলে যায়।

তারপর?

দু'দিন বাড়ির দরজার সামনেই সে বসে ছিল। তৃতীয় দিন বিকেলে হঠাৎ তার স্বামীর এক বন্ধু সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং তার স্বামীর কাছে তাকে পৌঁছে দেবে বলে কলকাতায় নিয়ে আসে।

সেই বন্ধুটিকে মৃণালের স্বামী চিনতো?

হ্যাঁ—প্রায়ই সে যেতো ওদের বাড়িতে।

কে সে? কি নাম তার জানো?

না।

তারপর?

তারপর আর কি, এখানে বাড়িউলী মাসীর হাতে তাকে তুলে দিয়ে বন্ধুটি চলে যায়। পরে জেনেছিল মৃণাল, ওই লোকটির নাকি মেয়ে চালান দেবার ব্যবসা ছিল। আর সেই ব্যবসায় তার স্বামীও একজন ভাগীদার ছিল। সম্ভবত ওই লোকটি মৃণালকে চালান দেবার মতলব করেছিল।

কিন্তু এখানে এলো কি করে মৃণাল?

সে আর এক দৈবচক্র—

কি রকম?

স্বামীর সেই বন্ধুর আশ্রয় থেকে পালিয়ে এল রাত্রে মৃণাল। রাস্তায় এসে নামল। হাঁটতে হাঁটতে নিমতলার গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে থাকল। সেখানে আমাদের বাড়িউলী মাসীর সঙ্গে দেখা—

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, ফ্রম ফ্রাইং প্যান টু দ্য ফায়ার!

কি বললেন বাবু?

না, কিছু না, তোমাদের বাড়িউলী মাসী তখন তাকে এখানে এনে তুলল, তাই না?

আজ্ঞে। এ পাপ দেহের ব্যবসায় সে নামতে চায়নি, কিন্তু পালাবার তো আর পথ ছিল না, মাসীর চার-পাঁচজন তাঁবেদার গুণ্ডা আছে—মাসীর পোষ্যও তারা—তারা সর্বক্ষণ চোখ মেলে থাকত। কাজেই বুঝতে পারছেন বাবু—

কিরীটী প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসলো।

আচ্ছা সে-রাত্রে ঠিক কি ঘটেছিল, মানে যতটা তুমি জানো বা জানতে পেরেছিলে আমাকে বলতে পার! কিরীটী প্রশ্নটা করে মিনতির দিকে তাকাল।

BanglaBook.net

বাবু, সে রাত্রে আমার ঘরে কেউ ছিল না রাত দশটার পর। আমার বাবু পৌনে দশটা নাগাদ চলে যান—

কিন্তু আদালতে বলেছো, অবিনাশ সেন নামে এক ভদ্রলোক আর তুমি—

ঠিকই বলেছি—যার কথা বলেছি সে আমার স্বামী।

স্বামী!

হ্যাঁ, আট বছর আগে তার ঘর ছেড়ে আমি চলে আসি—

কেন?

তার জঘন্য চরিত্র ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য। কিন্তু সে আমাকে বছর তিনেক বাদে খুঁজে বের করে এখানে। এবং তারপর থেকে মধ্যে মধ্যে সে আসতো আমার কাছে।

কেন? টাকার জন্য?

না, সোনার বেনে—মস্তবড় জুয়েলারী ফার্ম তার, টাকার অভাব তো নেই। অনেক টাকা তার। টাকার জন্য সে আমার কাছে আসবে কেন!

তবে কি জন্যে আসতো?

আমাকে আবার ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্য।

ফিরে গেলে না কেন?

না। কারণ আমি জানতাম সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে। তাছাড়া—

কি?

এই পাপ নিয়ে আর কি সেখানে ফিরে যেতে পারি।

তোমার কোন সন্তানাদি—

না, হয়নি। তবে তার প্রথম পক্ষের দুটি সন্তান ছিল—আমি তার দ্বিতীয় পক্ষ। আরো অনেক কথা আছে, যা বলতে পারবো না।

থাক, বলতে হবে না। কিন্তু তুমি আদালতে সে সব কথা তো প্রকাশ করনি?

না, করিনি।

কেন?

ওই সব কি প্রকাশ করবার মত কথা দশজনের সামনে আদালতে দাঁড়িয়ে?

এবার বল, সে রাত্রে ঠিক কি ঘটেছিল।

রাত সাড়ে দশটার পর, বোধ হয় এগারোটা হবে তখন—আমার স্বামী এলো।

বললে, সে আমাকে না নিয়ে ফিরবে না। আমিও যাবো না। সেও নাছোড়বান্দা। আমি বললাম আর আমি জীবনে কোনদিন তার ঘরে ফিরে যাবো না, সেও যেন আর না আসে।

॥ পাঁচ ॥

মিনতি বলতে লাগল, রাত বোধ হয় বারোটা। হঠাৎ পর পর দুটো গুলির আওয়াজ—আর একটা আর্ত চিৎকার—

দুটো গুলির আওয়াজ শুনেছিলে? প্রশ্ন করলেন সোমনাথ ভাদুড়ী।

হ্যাঁ।

pathagar.net

কিন্তু আদালতে বলেছ একটা গুলির আওয়াজই তুমি সে রাত্রে শুনেছিলে। আবার প্রশ্ন করলেন সোমনাথ ভাদুড়ী।

হ্যাঁ, তাই বলেছিলাম বটে।

কিরীটী এবার বললে, দুটো গুলির আওয়াজ শুনেছিলে তবে বলেছিলে কেন একটা গুলির আওয়াজ শুনেছো?

মনে ছিল না।

কিরীটী বললে, হুঁ। ঠিক আছে গুলির আওয়াজ শুনে তুমি কি করলে?

ভয়ে প্রথমে আমরা ঘর থেকে বের হইনি। এদিকে বাড়ির অনেকেই সে আওয়াজ শুনেছে তখন, কিন্তু তারাও কেউ ভয়ে ঘর থেকে বের হয়নি। মিনিট পাঁচেক পরে আমি আর আমার স্বামী দরজা খুলে বের হই। মৃণালের ঘরের দরজা বন্ধ। কোন সাড়া-শব্দ নেই। দরজায় ধাক্কা দিয়ে মৃণালকে ডাকি। কিন্তু মৃণালের কোন সাড়া-শব্দ পেলাম না। বাড়ির অনেকেই তখন এসে ঐ ঘরের দরজার সামনে ভিড় করেছে। হঠাৎ এই সময় আমার মনে পড়ল—আমার আর মৃণালের ঘরের মাঝখানে একটা দরজা আছে। আমার ঘরের ভিতর থেকেই আমি বন্ধ করে রাখতাম বরাবর। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সেই মধ্যবর্তী দরজাটা খুলে মৃণালের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি তপন ঘোষ রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে। তার পাশে পড়ে বিজিতবাবু। তার হাতে ধরা একটা পিস্তল। আর—মৃণাল ঘরে নেই?

মৃণাল নেই?

না। বাথরুমের দরজাটা খোলা হাঁ হাঁ করছে। আমি তখন প্রথমে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বাথরুমের আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে বাইরে এলাম। আমার স্বামী দেখি দরজার গায়ে লাথি মারছে—বাড়িউলী মাসীর হুকুমে। দরজা ভেঙে আমি আর আমার স্বামীই প্রথমে ভিতরে ঢুকি—পর পর অন্য সকলে। পরে থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিস আসে।

বাথরুমের ওই দরজা দিয়ে এ বাড়ির বাইরে যাওয়া যায়? কিরীটীর প্রশ্ন।

হ্যাঁ, বাইরে একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি আছে। সিঁড়িটা বরাবর একতলা থেকে দোতলা পর্যন্ত গিয়েছে।

বলতে চাও তাহলে ওই সিঁড়িপথেই মৃণাল পালিয়েছে?

হ্যাঁ, তাছাড়া আর কি হবে। তবে পুলিসের খটকা থেকে গিয়েছে—মৃণাল কোন্ পথে পালাল—বাথরুমের দরজা যখন বন্ধ ছিল। আমিও পুলিসকে কথাটা বলিনি, আদালতেও প্রকাশ করিনি।

কেন করনি?

পুলিস হয়ত আমাকে সন্দেহ করত যে, আমিই তাকে সে-রাত্রে পালানোর সুযোগ দিয়েছি।

এ কথাটা তোমার মনে হলো কেন মিনতি? কিরীটী প্রশ্ন করল।

তারা যে অনুসন্ধানের সময় আমার ও মৃণালের ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটা আবিষ্কার করেছিল এবং আমাকে নানাভাবে জেরা করেছিল।

তা তোমাকে যে তারা শেষ পর্যন্ত সন্দেহ করেনি, তুমি বুঝলে কি করে?

আমি যে একসময় সে-রাত্রে গোলমাল শুনে এক ফাঁকে মৃণালের ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিলাম, সে কথাটাও কাউকে আমি বলিনি। তারাও সেটা অনুমান করতে পারেনি। তাই আমার মনে হয়, আমাকে তারা মৃণালের সে-রাত্রে পালানোর ব্যাপারে কোনভাবে সন্দেহ করতে পারেনি।

কিরীটী মুখে কিছু না বললেও বুঝতে পারে মেয়েটি রীতিমত বুদ্ধিমতী।

মিনতি!

বলুন।

আমার কিন্তু মনে হয়, মৃণাল কোথায় আছে, অন্তত আর কেউ না জানলেও তুমি জানো।

কি বলছেন আপনি!

যা আমার মনে হচ্ছে তাই বললাম।

আপনি বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমি জানি না।

দেখ মৃণালকে আমি খুঁজে বের করবই। সে অন্তত আমার চোখে ধুলো দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না। আচ্ছা আজ আমরা উঠছি আবার কিন্তু আসবো।

নিশ্চয়ই আসবেন। মিনতি বললে, কিন্তু বিশ্বাস করুন বাবু, মৃণালের সন্ধান জানলে নিশ্চয়ই সে-কথা আমি আপনাদের জানাতাম।

কিরীটী মিনতিকে আর কিছু বললে না। উঠে দাঁড়াল এবং সোমনাথ ভাদুড়ীকে বললে, চলুন ভাদুড়ী মশাই, এবার যাওয়া যাক। ভাল কথা, একবার মৃণালের ঘরটা দেখে গেলে হতো।

সোমনাথ ভাদুড়ী উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, বেশ তো চলুন।

মিনতি বাড়িউলী মাসীর কাছ থেকে ঘরের চাবিটা নিয়ে এলো। দরজা খুলে ওরা দুজনে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

রাত তখন প্রায় সোয়া ন'টা হয়ে গিয়েছে।

দুজনে ওই বাড়ি থেকে বের হয়ে বড় রাস্তায় এসে কিরীটীর অপেক্ষমাণ গাড়িতে উঠে বসলো।

সর্দারজী, বাবুকে তাঁর কোঠিতে নামিয়ে দাও আগে—কিরীটী বললে।

কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর সোমনাথ ভাদুড়ীই স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন, কি ভাবছেন রায় মশাই?

ভাবছি ওই মিনতি মেয়েটির কথা।

সত্যিই কি আপনার মনে হয়, মেয়েটি জানে মৃণাল কোথায়?

আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো জানে।

তবে সে কথা মিনতি প্রকাশ করল না কেন? এত কথা বললে, অথচ ওই কথাটা চেপে গেল কেন!

তার দুটি কারণ হতে পারে ভাদুড়ী মশাই।

কি কারণ?

BanglaBook.net

প্রথমত, কথাটা প্রকাশ করলে সে মামলার মধ্যে জড়িয়ে পড়তো, যেটা হয়ত সে কোনক্রমেই চায়নি। দ্বিতীয়ত, হয়ত সে ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখেছিল সেই রাত্রে।

কি রকম?

গোলাগুলির আগে হয়ত একটা গোলমাল হয়েছিল। আর সে তখন ওই ঘরের মধ্যবর্তী দরজা খুলে ব্যাপারটা সবার অলক্ষ্যে দেখেছিল। সে যে পিস্তলের গুলির শব্দেই প্রথমে আকৃষ্ট হয়েছিল কথাটা হয়ত সত্য নয় কিন্তু সে কথাটা প্রকাশ করেনি ওই একই কারণে—পুলিস তার পেটের গোপন কথা হয়ত টেনে বের করত জেরা করে। একটা কথা ভুলে যাবেন না ভাদুড়ী মশাই, ঘটনার সময় মিনতি আর তার স্বামী অবিনাশ ঠিক পাশের ঘরেই ছিল। অকুস্থানের এক কথায় যাকে বলে সন্নিকটে।

তাহলে—

মিনতির উপর কড়া নজর রাখতে হবে। আপনি ভাববেন না, বাড়ি ফেরার পথেই লালবাজারের সি. আই. ডি. অফিসার প্রতুল সেনকে আমি মিনতির উপর কনস্ট্যান্ট একটা ওয়াচ রাখবার জন্য আজ থেকেই নির্দেশ দিয়ে যাবো।

সোমনাথ ভাদুড়ীকে তাঁর গৃহে নামিয়ে দিয়ে কিরীটী সোজা সার্কাস এভিন্যুতে প্রতুল সেনের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলো।

প্রতুল সেন তখন ডিনারে বসেছিলেন।

সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি বের হয়ে এলেন।

কি ব্যাপার মিঃ রায়! এত রাত্রে?

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, এত রাত কোথায়, মাত্র তো সোয়া দশটা।

আমি খেতে বসেছিলাম, আপনার নাম শুনে—

ছিঃ ছিঃ, যান আহার শেষ করে আসুন। আমি বসছি।

না না, আপনি বলুন কি দরকার?

বলবো বলেই তো এসেছি। আগে যান ডিনার শেষ করে আসুন, আমি বসছি।

সে হবে'খন—আপনি বলুন।

না, এমন কিছু একটা জরুরী ব্যাপার নয়, আপনি যান—ফিনিশ ইওর ডিনার ফার্স্ট।

প্রতুল সেন চলে গেলেন এবং মিনিট কুড়ি বাদেই ফিরে এলেন একটা সিগারেট ধরিয়ে। একটা সোফায় বসতে বসতে বললেন, বলুন।

কিরীটী সংক্ষেপে ব্যাপারটা খুলে বলল। তারপর বললে, আমি যে জন্য এসেছি সেটা হচ্ছে ঐ মিনতির সবরকম গতিবিধির উপর আপনাকে নজর রাখার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এখুনি।

বেশ, করছি। প্রতুল সেন উঠে গিয়েই ফোনে যেন কাকে নির্দেশ দিয়ে এলেন।

মিঃ রায়, আপনার ধারণা তাহলে মিনতি জানে মৃণালের হোয়ার অ্যাবাউটস!

হ্যাঁ।

মিনতিকে তাহলে অ্যারেস্ট করলেই তো হয়?

না, এখন নয়।

কিন্তু তার স্বার্থ কি?

BanglaBook.org

স্বার্থ একটা আছে বৈকি কিছু—

কি স্বার্থ থাকতে পারে?

ইফ আই অ্যাম নট রং—আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয়ে থাকে তো, কিরীটী বললে, ঐ বাড়িতে একটা চোরাকারবারের ঘাঁটি ছিল।

চোরাকারবারের ঘাঁটি!

হ্যাঁ। যার মধ্যে জড়িত ছিল তপন ঘোষ, বিজিত মিত্র ও সুদীপ রায় তো বটেই—ঐ মিনতি ও মৃণাল সম্ভবত ছিল।

সত্যি বলছেন?

বললাম তো আমার অনুমান। এবং তপন ঘোষের মৃত্যুর পশ্চাতেও ওই চোরাকারবার।

আর মিনতির স্বামী অবিনাশ সেন?

সেও থাকাটাই সম্ভব। আপনাকে আরো একটা কাজ করতে হবে মিঃ সেন।

কি?

ওই অবিনাশ সেনকে একবার লালবাজারে ডাকিয়ে আনাতে হবে কালই।

বেশ। কখন?

বেলা দশটা বা এগারোটা নাগাদ—আমরা আপনার অফিসে তাকে জেরা করলে হয়ত কোন সূত্রের সন্ধান পেতে পারি।

আমার তো মনে হচ্ছে ওই মিনতি মেয়েটি—

তাকে তো জেরা করবোই—তার আগে তার জানা দরকার, তাকে ও তার স্বামীকে আমরা সন্দেহ করছি। আচ্ছা এখন তাহলে উঠি। কাল দশটা-এগারোটার মধ্যে আপনার অফিসে যাবো।

গৃহে ফিরে এলে কৃষ্ণা বললে, টিকিট পাওয়া গিয়েছে সামনের সোমবারে ডুন এক্সপ্রেসে।

আজ বৃহস্পতিবার—হাতে তাহলে এখনো তিনটে দিন-রাত ও একটা বেলা আছে। ঠিক আছে, তার মধ্যে আশা করছি তপন ঘোষের হত্যার ব্যাপারে একটি হদিস হয়ত পেয়েও যেতে পারি।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি কোন একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের কাছাকাছি এসে গিয়েছো।

তোমাকে সেদিন বলছিলাম না কৃষ্ণা, কিরীটী একটা আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বললে, রক্তের দাগ একেবারে নিশ্চিহ্নভাবে মুছে ফেলা যায় না। যতই চেষ্টা করো মুছে ফেলতে, একটা আবছা দাগ কোথায়ও-না-কোথায়ও থেকে যায়ই। আর সে-রক্তের দাগ যদি হত্যার হয় তো—

হত্যাকারী সনাক্ত হয়ে যায়! কৃষ্ণা মৃদু হেসে বললে।

তাই। কারণ কোন ক্রাইমই আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে একেবারে পারফেক্ট হয় না। হতে পারে না। ছোট একটা কিন্তু কোথাও-না-কোথাও থেকে যাবেই—সেই 'কিন্তু' ধরে যদি এগুতে পারো—ঠিক সত্যে তুমি পৌঁছে যাবেই।

চল, রাত অনেক হয়েছে, এবারে খাবে চল।

হ্যাঁ, চল।

পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ কিরীটী বেরুল।

লালবাজারে প্রতুল সেনের অফিস কামরায় প্রবেশ করে দেখলো প্রতুল সেন তারই অপেক্ষায় বসে আছে।

আসুন আসুন সত্যসন্ধানী।

কোন খবর আছে?

প্রতুল সেন বললেন, অবিনাশ সেনকে এখুনি আমার লোক নিয়ে আসবে।

প্রতুল সেনের কথা শেষ হলো না, সাব-ইন্সপেক্টার রঞ্জিত মল্লিক অবিনাশ সেনকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

অবিনাশবাবু এসেছেন, স্যার।

বসুন অবিনাশবাবু। প্রতুল সেন বললেন।

অবিনাশ সেন বসলেন।

কিরীটী চেয়ে দেখে আগন্তুকের দিকে।

বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে বলেই মনে হয় ভদ্রলোকের। রোগা লম্বা চেহারা। গাল দুটো ভাঙা। মাথার চুলে কলপ দেওয়া! সযত্ন টেড়ি, মাঝখানে সিঁথি। চোখে সোনার চশমা। নিখুঁতভাবে দাড়ি কামানো। সরু গোঁফ ঠোঁটের উপর। পরনে দামী শান্তিপুরী ধুতি ও সাদা সিল্কের পাঞ্জাবি। সোনার বোতাম। দু'হাতের আঙুলে গোটা দুই সোনার আংটি, তার মধ্যে একটা হীরা। হীরাটি বেশ বড় একটা বাদামের সাইজের, অনেক দাম যে হীরাটার বোঝা যায়।

লোকটি কেবল ধনীই নয়—বনেদী ধনী। শৌখিন প্রকৃতির।

কিন্তু সারা মুখে যেন একটা দীর্ঘ অত্যাচার ও অসংযমের ছাপ।

কি ব্যাপার স্যার—এত জরুরী তলব দিয়ে আমাকে এখানে ডেকে আনলেন কেন? অবিনাশ বললেন।

কোন রকমের ভনিতা না করেই প্রতুল সেন বললেন, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে তপন ঘোষ হত্যা-মামলার ব্যাপারটা!

সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশ সেনের চোখের দৃষ্টি যেন সজাগ, তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

মামলায় আপনি তো সাক্ষীও দিয়েছিলেন—

আজ্ঞে।

আপনি ওই বাড়িতে মিনতির ঘরে যেতেন? প্রশ্ন করল এবার কিরীটী।

অবিনাশ সেন চকিতে তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে।

প্রতুল সেন বললেন, উনি যা জিজ্ঞাসা করছেন তার জবাব দিন।

কিন্তু স্যার—সে মামলা তো চুকে-বুকে গিয়েছে।

না, যায়নি।

যায়নি! অবিনাশ সেনের কণ্ঠে বিস্ময়।

না, তপন ঘোষের হত্যাকারী এখনো সনাক্ত হয়নি। কিরীটী আবার বললে, কিন্তু আপনি আমার প্রশ্নের এখনো জবাব দেননি।

হ্যাঁ, তা মধ্যে মধ্যে যেতাম।

আপনার সঙ্গে তার পূর্ব-পরিচয় ছিল, তাই না?

পূর্ব-পরিচয় আর কি স্যার—একজন বারবনিতা—

কিন্তু তা তো নয়—

কি বলতে চান স্যার?

মিনতির সঙ্গে আপনার সত্যিকারের কি সম্পর্ক ছিল?

সম্পর্ক আবার কি থাকবে?

আপনি সত্য গোপন করছেন অবিনাশবাবু—

সত্য!

হ্যাঁ, তিনি ঐ লাইনে আসার আগে আপনার স্ত্রী—বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন, দ্বিতীয় পক্ষের—

অবিনাশ সেনের চোয়ালটা ঝুলে পড়লো সহসা। দু'চোখে বোবা দৃষ্টি।

কি, তাই না?

বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিল কুলত্যাগিনী—

কথাটা আপনি আদালতে চেপে গেলেন কেন?

প্রয়োজন হয়নি—অবান্তর—

না, অনেক সত্য কথা বের হয়ে পড়ার ভয়ে কথাটা চেপে গিয়েছিলেন।

না, না—

তা সেই কুলত্যাগিনী স্ত্রীর কাছে আবার কেন আসতেন মধ্যে মধ্যে? নিশ্চয়ই ভালবাসার টানে নয়!

সত্যিই তাই স্যার। বিশ্বাস করুন ওকে আমি ভুলতে পারিনি।

তা মিনতি যে ওইখানে আছে খবর পেলেন কি করে?

হঠাৎ-ই—মানে অ্যাকসিডেন্টালি!

মানে ওই সব পাড়ায়—ওই ধরনের মেয়েদের কাছে যেতে যেতে!

অবিনাশ সেন চুপ করে থাকেন।

অবিনাশবাবু!

আজ্ঞে—

আমরা কিন্তু খবর পেয়েছি—

কি—কি খবর পেয়েছেন?

ওই বাড়িতে একটা চোরাই কারবারের আড্ডা ছিল।

চোরাই কারবার!

সেই কারবারের সঙ্গে আপনি ও মিনতি যুক্ত ছিলেন।

না, না—বিশ্বাস করুন, ওসব ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই।

কিরীটী মৃদু হাসলো।

অবিনাশবাবু, আপনি জানেন মৃণাল কোথায়?

না, কেমন করে জানবো!

জানেন না?

না।

কিন্তু আমি যদি বলি আপনি জানেন!

মৃণাল পাশের ঘরে থাকত। মিনতির মুখেই আমি শুনেছিলাম, কিন্তু তার সঙ্গে কোন আলাপ-পরিচয় ছিল না, এমন কি আগে তার নামও জানতাম না।

তপন ঘোষের সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল না?

না।

বিজিতবাবুর সঙ্গে?

না।

সুদীপবাবুর সঙ্গে?

না।

তাহলে ওদের কাউকেই আপনি চিনতেন না বলতে চান অবিনাশবাবু? কথাটা বলে কিরীটী অবিনাশ সেনের মুখের দিকে তাকাল।

না। বিশ্বাস করুন, ওদের কাউকেই আমি চিনতাম না।

পল্টুকে আপনি চিনতেন?

পল্টু!

হ্যাঁ, সে তো মধ্যে মধ্যে আপনার দোকানে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করত। কথাটা কি অস্বীকার করতে পারেন?

ওই নামই জীবনে কখনো শুনিনি।

কিন্তু মিনতি বলেছে—

কি বলেছে মিনতি?

মধ্যে মধ্যে আপনি ঐ তপনবাবুর সঙ্গে বিশেষ করে দেখা করবার জন্য তার ঘরে রাত্রের দিকে যেতেন।

মিনতি বলেছে?

হ্যাঁ, আরো বলেছে তপন পাশের ঘর থেকে মিনতির ঘরে আসতো মাঝখানের দরজা-পথে—আবার কথাবার্তা হয়ে চলে যেতো ওই দরজা দিয়েই পাশের ঘরে।

মিনতি বলেছে ওই কথা আপনাকে! হারামজাদী! শেষেব শব্দটা কাঁপা আক্রোশভরা গলায় অবিনাশ সেন যেন অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন।

ঠিক আছে অবিনাশবাবু—আপনি যেতে পারেন।

ধন্যবাদ। অস্ফুট কণ্ঠে কথাটা বলে অবিনাশ সেন বের হয়ে গেলেন ঘর থেকে।

অবিনাশ ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর প্রতুল সেন কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

কিরীটী অন্যমনস্ক ভাবে পাইপটায় নতুন তামাক ভরছে তখন।

কি বুঝলেন মিঃ রায়! প্রতুল সেন প্রশ্ন করলেন।

গভীর জলের কাতলা। কিরীটী বললে।

PATHAGAR.NET

সে তো বোঝাই গেল। নচেৎ সব স্রেফ অস্বীকার করে যেতে পারে!

তবে কাতলা টোপ গিলেছে।

টোপ!

হ্যাঁ, দেখলেন না—বঁড়শী টাকরায় গিয়ে বিঁধেছে!

মিনতি কি সত্যিই ওইসব কথা বলেছে মিঃ রায়?

না।

তবে যে বললেন—

টোপ ফেলেছিলাম একটা স্রেফ অনুমানের ওপরে নির্ভর করে—দেখলেন তো, অনুমানটা মিথ্যে হয়নি। এবারে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে মিঃ সেন।

কি বলুন?

মৃণালের ঘরটা এখনো খালি পড়ে আছে—সেই ঘরটার আমাদের প্রয়োজন।

সে আর এমন কঠিন কি!

এখুনি লোক পাঠান—আর একটা টেপ-রেকর্ডার।

পাবেন।

ওই বাড়ির খিড়কির দরজাটা—

তাও খোলা থাকবে। তার আশেপাশে আমাদের একজন প্লেন ড্রেসে ওয়াচারও থাকবে। কিন্তু এত আয়োজন কিসের?

কিরীটী তখন তার প্ল্যানটা বুঝিয়ে দিল প্রতুল সেনকে। তারপর বললে, সন্ধ্যার পরই যেন সব প্রস্তুত থাকে।

কিন্তু আপনি কি মনে করেন মিঃ রায়—

কি?

টোপ গিলবে লোকটা!

গিলবে বলেই আমার ধারণা। আজ না হয় কাল।

বেশ।

এবার আমি উঠবো।

তা কখন দেখা হচ্ছে?

ঠিক রাত সোয়া আটটায়।

অতঃপর কিরীটী বিদায় নিল।

॥ ছয় ॥

সেদিনটা ছিল রবিবার। অফিস আদালত সব বন্ধ।

লালবাজার থেকে বের হয়ে সোজা কিরীটী সোমনাথ ভাদুড়ীর গৃহের দিকে গাড়ি চালাতে বলল সর্দারজীকে।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। সোমনাথ ভাদুড়ীর ঘর প্রায় খালিই ছিল। একজন মাত্র মক্কেল ছিল ঘরে। সোমনাথ ভাদুড়ী তার সঙ্গেই কথা বলছিলেন।

BanglaBook.org

কিরীটীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সাদর আহ্বান জানালেন সোমনাথ ভাদুড়ী, আসুন রায়মশাই, বসুন—

কিরীটী উপবেশন করবার পর সোমনাথ ভাদুড়ী তাড়াতাড়ি শেষ মক্কেলটিকে বিদায় করলেন।

আপনাকে ফোন করেছিলাম বাড়িতে—আপনার স্ত্রী বললেন আপনি সকালেই বের হয়েছেন। ভাদুড়ী বললেন।

হ্যাঁ, লালবাজারে গিয়েছিলাম।

আজকের সকালবেলার কাগজ পড়েছেন রায় মশাই?

না, সময় পাইনি। তাছাড়া আমি সাধারণত কাগজ দুপুরে বিশ্রামের সময় পড়ি।

সুদীপ রায়—

কি হয়েছে সুদীপের?

সে খুন হয়েছে—

খুন! কে বললে?

সংবাদপত্রে বের হয়েছে। তার গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত মৃতদেহটা রেল লাইনের ধারে গতকাল সকালে পাওয়া গিয়েছে।

তার মানে যেদিন সন্ধ্যায় সে আপনার এখানে এসেছিল, সেইদিনই রাত্রে সে খুন হয়েছে!

হিসাবমত তাই দাঁড়াচ্ছে। সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন।

কিন্তু প্রতুলবাবু তো কিছু বললেন না!

বোধ হয় ব্যাপারটা এখনো তিনি শোনেননি।

হয়ত তাই, কিন্তু লোকটা যে ওই সুদীপ রায়ই—সেটা জানলেন কি করে?

কাগজে অবিশ্যি বের হয়েছে এক ব্যক্তির মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং মৃতের মুখটা কোন ধারানো অস্ত্রের সাহায্যে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে। আইডেনটিফাই নাকি করেছে আজই তার স্ত্রী রমা।

খবরের কাগজে কি সংবাদ বের হয়েছে?

না। আসলে আমিও সংবাদপত্রে নিউজটা পড়িনি রায়মশাই—আজ সকালে একটা ফোন পাই—

ফোন!

হ্যাঁ, অজ্ঞাতনামা এক নারীর কাছ থেকে। সে-ই সংবাদটা দেয়। সংবাদটা দিয়েই সে ফোনের কানেকশন কেটে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ফোন করি সংবাদটা দেবার জন্য।

ফোনে ঠিক কি বলেছিল আপনাকে সেই মহিলা?

বলেছিল রেল লাইনের ধারে যে মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছে সেটা সুদীপ রায়ের।

যিনি ফোন করেছিলেন তাঁর কণ্ঠস্বর আপনি চিনতে পারেননি।

না।

ঠিক আছে—বলতে বলতে সামনেই টেবিলের উপর রক্ষিত ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে কিরীটী ডায়েল করল লালবাজারে।

কিন্তু প্রতুল সেনকে তার অফিসে পেল না।

BanglaBook.org

কাকে ফোন করছিলেন? সোমনাথ ভাদুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রতুল সেনকে, পাওয়া গেল না—অফিসে নেই।

আচ্ছা রায়মশাই, কে আপনাকে ফোন করেছিল বলুন তো?

মনে হয় হত্যাকারীর সহকারিণী এবং হত্যাকারীরই নির্দেশে?

কিন্তু আমাকে সংবাদটা দেবার কি প্রয়োজন ছিল?

ভাদুড়ী মশাই, হত্যাকারী বরাবরই সজাগ ছিল। সুদীপবাবু যে আপনার কাছে এসেছিলেন তাও সে জানত। তাই সে আপনাকে জানিয়ে দিল—ভবিষ্যতের কথা ভেবেই সুদীপবাবুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো।

তার মানে—যাতে সে ভবিষ্যতে আরো কিছু প্রকাশ করতে না পারে!

হ্যাঁ—সেই সন্দেহেই তাকে এ পৃথিবী থেকে সরানো হয়েছে। তবে একটা ব্যাপার সুদীপবাবুর মৃত্যুতে পরিষ্কার হয়ে গেল—

কোন্ ব্যাপারের কথা বলছেন?

তপন ঘোষের হত্যার ষড়যন্ত্রের মধ্যে সুদীপবাবু না থাকলেও তিনি ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছিলেন।

আমি কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না রায়মশাই।

সুদীপবাবু এগিয়ে এসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেন সাক্ষী দিলেন তাই বোধ হয়!

হ্যাঁ। সে যদি ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলই—

সুদীপবাবুর মনের মধ্যে একটা ভয় ঢুকেছিল।

ভয়! কিসের ভয়?

তার নিজের প্রাণের ভয়।

প্রাণের ভয়!

হ্যাঁ। তার মনে ভয় ঢুকেছিল, বিজিত মিত্র যদি প্রাণের ভয়ে শেষ পর্যন্ত অ্যাপ্রুভার হয়ে সব কিছু প্রকাশ করে দেয়—

তাই সে সাক্ষী দিয়ে বিজিত মিত্রকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল বলতে চান?

হ্যাঁ—বিজিত মিত্রকে আইন-আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

কেমন যেন সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার রায়মশাই। সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন দু' আঙুলের মাঝখানে মোটা পেনসিলটা নাচাতে নাচাতে।

একটা ব্যাপার কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেল ভাদুড়ী মশাই। কিরীটী বললে।

কি বলুন তো? সোমনাথ ভাদুড়ী তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে।

তপন ঘোষ, বিজিত মিত্র ও সুদীপ রায় সব একদলের এবং সত্যিই ওরা পরস্পর কোন দুষ্কর্মের সঙ্গী ছিল পরস্পরের।

চোরাকারবার!

হতে পারে। আমি কিন্তু ব্যাপারটা পূর্বাহ্নেই অনুমান করেছিলাম—তাই আজ ফাঁদ পাতার ব্যবস্থা করে এসেছি।

ফাঁদ।

হ্যাঁ—আর আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো আজই রাত্রে ফাঁদে নাটের গুরুকে আটকা পড়তে হবে।

কার কথা বলছেন?

রহস্যের মেঘনাদ যিনি—তারই কথা বলছি। ব্যাপারটা সত্যি কথা বলতে কি, আমি কিন্তু এত সহজে নিষ্পত্তি হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। ভাবতে পারিনি হত্যাকারী এত বড় একটা ভুল তড়িঘড়ির মাথায় করে বসবে বা করে বসতে পারে।

তাহলে সুদীপবাবুর নিহত হওয়াটা এ ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ বলুন রায়মশাই, সোমনাথ বললেন।

তাই।

কিরীটীর অনুমান যে মিথ্যা নয় সেটা ওই রাত্রেই প্রমাণিত হয়ে গেল।

ব্যবস্থামত রাত্রি এগারোটা নাগাদ কিরীটী ও প্রতুল সেন এসে খিড়কির দরজাপথে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে খোলা বাথরুমের দরজা দিয়ে মৃণালের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

ঘরের মধ্যে পূর্ব হতেই অন্ধকারে ঘাপটি মেরে ছিল প্রতুল সেনের এক বিশ্বস্ত অনুচর।

ফিসফিস করে প্রতুল সেন শুধালেন, কেউ এসেছে মৃণালের পাশের ঘরে?

না, স্যার।

মিনতি আছে তো ঘরে?

আছে।

প্রার্থিত আগন্তুক ঠিক এল রাত বারোটায়।

টুক টুক করে পাশের ঘরের দরজায় নক করলো।

দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল।

তাদের মধ্যে সেরাত্রে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল, পরে টেপ থেকেই তা শোনা যায়।

কে? মিনতির প্রশ্ন।

আমি।

তুমি? আবার কেন তুমি এসেছো?

তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে, চল আমার সঙ্গে—

না।

চল।

না, কিন্তু এখানে আর তুমি থেকো না—চলে যাও, আমি টের পেয়েছি পুলিস ছদ্মবেশে এ বাড়ির আশেপাশে ওৎ পেতে রয়েছে।

পুলিসের সাধ্যও নেই আমাকে ধরে।

বিশ্বাস করো, আমি সত্যি বলছি, আর তুমি হয়ত একটা কথা জানো না—

কিরীটী রায়—

সেই ছুঁচোর ব্যাটা চামচিকে—তার সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়েছে। চল—আর দেরি করো না।

তুমি আমার কথা শোন। আমি বলছি তুমি চলে যাও।

একা চলে যাবো—তাই কি হয়, তোমাকে একা ফেলে তো যেতে পারি না।

pathagar.net

ওগো—

তারপরই একটা গোঁ গোঁ শব্দ।

কিরীটী পাশের ঘরে প্রস্তুতই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে পরদা তুলে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ে, তার পশ্চাতে প্রতুল সেন, তাঁর হাতে ধরা পিস্তল।

বলাই বাহুল্য, আততায়ী পালাবার পথ পায় না। যে দুটো হাত তার মিনতির গলায় ফাঁস পরিয়েছিল—তার সেই হাতের মুষ্টি আপনা থেকেই শিথিল হয়ে আসে। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকায় প্রতুল সেনের হাতে ধরা উদ্যত পিস্তলটার দিকে। লোকটার পরনে পাজামা ও গায়ে কালো শার্ট। মুখে চাপদাড়ি।

কিরীটী কঠিন কণ্ঠে বললে, মিঃ সেন, ওই তপন ঘোষ ও সুদীপের হত্যাকারী—অ্যারেস্ট করুন।

প্রতুল সেন ডাকলেন, বীরবল, ওর হাতে হ্যান্ডকাপ লাগাও।

বীরবল পশ্চাতেই ছিল, হাতকড়া নিয়ে এগিয়ে এলো। লোকটার হাতে হাতকড়া পরাল।

মিনতিকেও ছাড়বেন না। ওর হাতেও হ্যান্ডকাপ পরান। আর এক জোড়া আনেননি?

বীরবলের কাছে আর এক জোড়া হাতকড়া ছিল; সে সেটার সদ্ব্যবহার করল।

ইতিমধ্যে গোলমাল শুনে বাড়ির অনেকে সেখানে এসে ভিড় করে।

তারা ব্যাপার দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত।

কিরীটী এবার বললে প্রতুল সেনের দিকে তাকিয়ে, মহাপুরুষটিকে চিনতে পারলেন মিঃ সেন?

না তো।

অবিনাশ—

অবিনাশ সেন!

হ্যাঁ, দাড়িটা উৎপাটন করুন—বেশি লাগবে না—কারণ স্পিরিট গামের সাহায্য নেওয়া হয়েছে—উৎপাটন করলেই আসল চেহারাটা প্রকাশ পাবে।

কিরীটীর কথা মিথ্যে নয় দেখা গেল।

অবিনাশ সেনই।

সেইদিন রাত্রিশেষে লালবাজারে প্রতুল সেনের অফিস-কক্ষে—

কিরীটীকে ফিরে যেতে দেননি প্রতুল সেন। টেনে এনেছিলেন সঙ্গে করে।

প্রতুল সেন বলছিলেন, ব্যাপারটা কি আপনি বুঝতে পেরেছিলেন আগেই—মানে আসল হত্যাকারী কে?

বুঝতে পেরেছিলাম প্রথমেই বললে ভুল হবে—তবে কিছুটা অনুমান করেছিলাম।

কি?

বুঝতে পেরেছিলাম তপন ঘোষ, বিজিত মিত্র ও সুদীপ রায়—আপনার কাহিনীগুলির একঝাঁকের পাখী—বার্ডস অফ দি সেম ফেদার। আর এও বুঝেছিলাম ওরা যন্ত্র মাত্র, আসল যন্ত্রী ওদের পশ্চাতে কেউ ছিল। কিন্তু কে সে? একটা ধাঁধা থেকে গিয়েছিল। তারপর মিনতির সঙ্গে দেখা করতেই ব্যাপারটাকে ঘিরে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হলো।

BanglaBook.org

কি রকম?

বিজিত মিত্রের স্ত্রী দেবিকার পরিচয় দিয়ে ভাদুড়ী মশাইয়ের পায়ে যে গিয়ে পড়েছিল সে আসলে দেবিকা নয়। বিজিত মিত্রের স্ত্রী নেই।

প্রতুল সেন বললেন, কি বলছেন আপনি?

ঠিকই বলছি। বিজিত মিত্রের কোন স্ত্রীই ছিল না।

তবে কে সে?

সে ওই মিনতি।

মিনতি!

হ্যাঁ। মনে আছে আপনার, অমিয়বাবুর সঙ্গে একটি মেয়ে ঘোমটা মাথায় এসে দেখা করেছিল?

মনে আছে।

সেই মেয়েটি ও দেবিকা নাম ধরে যে মেয়েটি ভাদুড়ী মশাইয়ের কাছে গিয়েছিল তারা এক ও অকৃত্রিম।

ও-ই মিনতি কি করে বুঝলেন?

ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেইদিনই, যেদিন আমি আর ভাদুড়ী মশাই মিনতির সঙ্গে দেখা করতে যাই। মিনতির হাতে উল্কিতে লেখা 'এম' অক্ষরটা দেখে। একবার ঘোমটা খুলে, একবার ঘোমটা দিয়ে গিয়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুমান করছিলাম—মিনতিও ওই দলে আছে। আর তাই আজ রাত্রে ফাঁদটা পেতেছিলাম আপনার সক্রিয় সাহায্যে।

আচ্ছা সেদিন রাত্রে কি ঘটেছিল বলে আপনার মনে হয় মিঃ রায়?

অনুমানে মনে হয়—ওই অবিনাশ সেনই সে-রাত্রে পাশের ঘর থেকে মাঝের দরজা খুলে ওই ঘরে ঢুকে তপন ঘোষকে হত্যা করে। তারপর এক ঢিলে দুই পাখী মারার প্ল্যান করে বিজিত মিত্রের মাথায় আঘাত করে এবং তার হাতে পিস্তলটা গুঁজে দিয়ে পালিয়ে যায়।

আচ্ছা মিনতি যদি ওই দলেরই, তবে সে অত কথা আপনাকে বললে কেন?

তার উপর থেকে সন্দেহটা দূর করবার জন্য। কারণ সে আমাকে দেখে আমার কথাবার্তা শুনে বুঝতে পেরেছিল, আদালতে যে মামলা শেষ হয়ে গিয়েছে সেটা আমার বিচারে শেষ নিষ্পত্তি নয়। এবারে হয়ত কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরুবে। তাই অত কথা সে বলে আমাদের। কিন্তু সে বুঝতে পারেনি তখন তার ওই সব কথা তার বিরুদ্ধে আমার মনে সন্দেহ জাগাবে।

বিজিত মিত্রর কি হলো?

সম্ভবত মৃত্যুভয়ে সে আত্মগোপন করে আছে।

আর মৃণাল?

মনে হয় মৃণালকে আর কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু এরপর আমি—

নিরস্ত হবেন না, এই তো, তা খুঁজুন—যদি কখনো খুঁজে পান তাকে। কথাটা বলে কিরীটী মৃদু হাসলো।

ব্লু-প্রিন্ট

PATHAGAR.NET

॥ এক ॥

নীল রুমাল হত্যা-রহস্যের উপর যবনিকাপাত করবার পর দুটো দিনও কিরীটী একটু হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিতে পারে না। আবার দিল্লীর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ সিংয়ের কাছ থেকে জরুরী ট্রাঙ্ক-কল এলো।

মিঃ রায়—

স্পিকিং।

মিঃ রামস্বামীর সেক্রেটারী আমি—সিং।

নমস্তে, নমস্তে—বলিয়ে সিং সাব্—

আমাদের সেই ব্যাপারটার—মিঃ রামস্বামী আপনাকে তাগিদ দিতে বললেন—কবে আসছেন বলুন—কাল-পরশু—প্লেনেই চলে আসুন।

কিরীটী বললে, আপনাদের তো এখন পার্লামেন্টের সেসন চলছে। সেবারেই প্লেনের টিকিট পেতে আমায় গলদঘর্ম হতে হয়েছিল; তাছাড়া—

বলিয়ে?

এবারে আর প্লেনে যাবো না ভাবছি।

কেন, প্লেনেই তো আসা ভাল—

না, পরে বলবো—আমি ট্রেনেই যাবো।

কিন্তু—

ভয় নেই আপনার মিঃ সিং, আমি দু'তিন দিনের মধ্যেই ওখানে হাজির হবো বলবেন আপনার মিনিস্টার সাহেবকে—হয়ত অন্য নামে—অন্য পরিচয়েও যেতে পারি—

বাট হোয়াই।

কিরীটী হেসে বললে, পরে জানতে পারবেন। আচ্ছা তাহলে ঐ কথাই রইলো।

কিরীটী ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

কৃষ্ণা পাশের সোফায় বসে একটা বই পড়ছিল, শুধাল, কার ফোন গো?

দিল্লীর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ সিংয়ের। দিল্লী যাবার জন্য জরুরী পরোয়ানা।

সেই দলিলের ব্যাপারটা?

কিরীটীর সিগার কেস থেকে একটা সিগার তুলে নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করতে করতে বললে, মন্ত্রীমশাই খুব বেকায়দায় পড়েছেন।

কিন্তু মন্ত্রীমশাইয়ের অফিসের প্রাইভেট নিজস্ব চেম্বারের আয়রন সেফ থেকে গোপনীয় ডকুমেন্টস-এর ব্লু-প্রিন্ট চুরি যায়ই বা কি করে?

শুধু কি চুরি—একেবারে বিদেশে পাচার!

সত্যি সত্যিই পাচার হয়েছে নাকি?

নিঃসন্দেহে।

যায়ই বা কি করে?

বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা থাকলেই হয়। মীরজাফর—জগৎ শেঠ—উমিচাঁদদের বংশধরেরা তো একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি! তারা এখনো বহাল তবিয়তে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে।

কি জঘন্য মনোবৃত্তি—নিজের দেশের এত বড় শত্রুতা—

বিবেক বা দেশপ্রেম বলে কোন কিছুর বালাই ওদের আছে নাকি?

কবে যাবে?

দেখি কাল না হয় পরশু যেদিন টিকিট পাওয়া যায়।

তা ট্রেনে যাচ্ছো কেন, প্লেনেই তো—

না। প্লেনে যাওয়া মানে সকলের নজরে পড়া।

বাইরে শীতের রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছে। দিনকয়েক আগে দু'দিন ধরে বৃষ্টি হওয়ায় শীতটা যেন বেশ জাঁকিয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে কনকনে হাড়-কাঁপানো হাওয়া সর্বক্ষণ।

কৃষ্ণা বই থেকে মুখ তুলে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বলে, এখানেই এত শীত, দিল্লীতে যে কি শীত পড়েছে, সেটা বেশ ভাল ভাবে বুঝতে পারছি। কতদিন থাকবে দিল্লীতে?

কেন বল তো? কিরীটী কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকাল।

ভাল লাগে না তুমি না থাকলে।

বেশ তো চল না তুমি—ক'টা দিনের জন্য আমার সঙ্গে ঘুরে আসবে।

না।

না কেন? ভাবছি এবারে দেবেশের ওখানে গিয়েই উঠবো।

সরকারী গেস্ট হয়ে যাচ্ছো, হয়ত তারা তোমার থাকবার অন্য ব্যবস্থা করবে—কোন হোটেলে বা কোন এম. পি. পাড়ার কোন কোয়ার্টারে—তাছাড়া তুমি ব্যস্ত থাকবে।

তা করলেই বা। আমি যদি দেবেশের ওখানে থাকি, ওদের কি আপত্তি থাকতে পারে। চল, যাবে?

না, এবার থাক—তুমি বরং সুব্রতকে নিয়ে যাও।

তাকে তো নিয়ে যাবোই—একা যাচ্ছে কে? কে জানে কতদিন থাকতে হবে সেখানে। কারণ জালটা বহুদূর বিস্তৃত বলেই আমার মনে হচ্ছে।

কি করে বুঝলে?

সেবারে মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সেই রকমই মনে হয়েছিল।

দিন-দুই পরেই একটা ফোর বার্থ কম্পার্টমেন্টে দুটো বার্থ পাওয়া গেল দিল্লী কালকা মেলে।

কৃষ্ণা হাওড়া স্টেশনে এসে ওদের ট্রেনে তুলে দিল। ট্রেন ছাড়ার আগে সুব্রত বললে, তুমিও আমাদের সঙ্গে গেলে পারতে কৃষ্ণা।

হ্যাঁ—হয়ত দিবারাত্র এখানে ওখানে ছোটাছুটি করবে, না হয় মুখ গোমড়া করে পাইপ টানবে আর ঘরের মধ্যে পায়চারি করবে—ওকে তো জানি।

কিরীটী হেসে ফেলে।

হাসছো কি, মাথায় যখন তোমার রহস্যের ভূত চাপে, আয়নায় নিজের মুখের

চেহারাটা তো আর কখনো দেখনি। দেখলে বুঝতে—কৃষ্ণা বলে।

কিরীটী হাসতে হাসতে বলে, কি রকম দেখায় বল তো! সুকুমার রায়ের হুঁকোমুখো হ্যাংলার মত?

সাবধান কৃষ্ণা, সুব্রত বলে ওঠে, কথাটা ওর অগণিত ভক্তদের কানে গেলে তুমি ওর অর্ধাঙ্গিনী বলেও রেয়াৎ করবে না।

কৃষ্ণা হাসতে হাসতে বলে, না করে করুক, তাই বলে যা সত্যি তা বলবো না?

বুঝলি সুব্রত, একেই বলে গেঁয়ো যোগীর ভিখ্ মেলে না।

থাক থাক—হয়েছে, আমাকে কিন্তু রোজ একবার করে ট্রাঙ্ক-কল করবে।

যথা আজ্ঞা দেবী!

গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা পড়লো।

সুব্রত বলে, কি ব্যাপার—আমাদের কামরায় আর দু'জন সহযাত্রীর এখনো দেখা নেই!

কিরীটী বললে, বোধ হয় ক্যানসেল করেছে তাদের প্রোগ্রাম।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়লো ঐ সময়—

কৃষ্ণা নেমে পড়—সুব্রত বললে।

কৃষ্ণা নেমে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে কিরীটীর দিকে তাকাল।

কিরীটী বলে ওঠে, কি হলো, চোখ ছলছল করছে কেন?

ইয়ার্কি করতে হবে না—কিরীটীর দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে কৃষ্ণা কামরা থেকে বের হয়ে যায়—ওরাও উঠে করিডোর দিয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে এগোয়।

কৃষ্ণা নেমে গেল।

ওরা দুজনে জানালা-পথে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে থাকে।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে তখন—

ক্রমে জনকোলাহল মুখরিত আলোকিত প্ল্যাটফর্মটা একটু একটু করে মিলিয়ে গেল। নানা কণ্ঠের নানা ভাষার মিশ্র একটানা গুঞ্জনটা এতক্ষণ যা কানের উপর এসে আছড়ে পড়ছিল, তাও ধীরে ধীরে শ্রুতির চৌকাঠটা পার হয়ে গেল।

এখন কেবল বিসর্পিল ইস্পাতের লাইনগুলো ইয়ার্ডের উজ্জ্বল আলোয় চিক চিক করছে—এক-আধটা ট্রেন এদিক ওদিক যাতায়াত করছে—চাকার শব্দ—ইঞ্জিনের শব্দ।

দূরে দূরে ইয়ার্ডের লাইটগুলো আলো ছড়াচ্ছে।

ওরা আবার একসময় করিডোর দিয়ে নিজের কামরার দিকে অগ্রসর হলো। দরজাটা টেনে দিয়ে গিয়েছিল সুব্রত; এখন দেখলে দরজাটা খোলা আর নীচের একটা বার্থে বসে আছে দুজন।

অতি আধুনিকা একটি তরুণী। রূপ যত না থাক, রূপের জৌলুসকে বাড়িয়ে তোলার প্রচেষ্টায় প্রসাধন ও পোশাকের পারিপাট্যটা সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

পরনে দামী সিল্কের শাড়ি—ডিম মেরুন কালারের অনুরূপ জামা গায়ে—বগল পর্যন্ত কাটা হাতা। হাতে ছ'গাছি করে সোনার চুড়ি আর রিস্টওয়াচ। বয়স তিরিশের নীচে নয় বলেই মনে হয়। কপালে একটা সিঁদুরের বা কুমকুমের টিপ থাকলেও সিঁথিতে

এয়োতির কোন চিহ্ন নেই অথচ দেখলে বাঙালি বলে মনে হয়। হাতে ধরা একটা ইংরাজী ফিল্ম ম্যাগাজিনে দৃষ্টিপাতে নিবদ্ধ। পাশে একটা হ্যান্ডব্যাগ পড়ে আছে। ম্যানিকিওর করা আঙুলের দীর্ঘ নখগুলো। পাশে সামান্য ব্যবধানে বসে যে ভদ্রলোকটি —পরনে তার দামী গরম স্যুট। দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। বেশ হৃষ্টপুষ্ট লম্বা চেহারা। চোখে চশমা।

মুখটা গোলগাল। হাতে জ্বলন্ত একটা সিগারেট। বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যেই বলে মনে হয়। পায়ের নীচে গোটা-দুই সুটকেস। একটা বড় ফ্লাস্ক ও ছোট একটা বাস্কেট।

ওদের ভিতরে প্রবেশ করতে দেখে মহিলাটি তাকালেনও না—কিন্তু পাশের ভদ্রলোকটি চোখ তুলে ওদের দিকে তাকালেন এবং হিন্দিতেই বললেন, আপলোগ এহি কামরামে যা রহে হেঁ?

সুব্রত বললে, জী!

আমার নাম রঞ্জিৎ কাপুর—কানপুর যাচ্ছি—আপনারা কতদূর? পুনরায় প্রশ্ন করলো।

কিরীটী এবারেও কোন কথা বললে না—পাশে একটা বই ছিল, সেটা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করেছে ততক্ষণ।

সুব্রতই আবার বললে, জী দিল্লী—

রঞ্জিৎ কাপুর আবার বললেন, আমার কানপুরে ট্যানারীর বিজনেস আছে—তা আপনারা দিল্লীতে কি বেড়াতে যাচ্ছেন নাকি?

সুব্রত বললে, হ্যাঁ।

রঞ্জিৎ কাপুর বললেন, কিন্তু এখন তো ওদিকে ভীষণ ঠাণ্ডা।

তা তো হবেই—

তা দিল্লীই যাবেন—না আরো দূরে?

দেখি—এখনো কিছু ঠিক নেই। বেড়াতে বের হয়েছি।

আর উনি? কিরীটীর দিকে ইঙ্গিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন রঞ্জিৎ কাপুর।

উনিও আমার সঙ্গে চলেছেন।

পার্শ্বে উপবিষ্টা মহিলা কিন্তু একবারও তাকালেন না ওদের দিকে। আপনমনে বই পড়েই চলেছেন, যেন ওদের কথাবার্তা তাঁর কানে প্রবেশই করছে না।

সুব্রতই আবার জিজ্ঞাসা করে, উনি?

উনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন না—তবে আমার পরমাত্মীয়া অর্থাৎ আমার স্ত্রীর বহিন।

কিরীটী ঐ সময় সুব্রতর আলাপে বাধা দিয়ে মৃদুকণ্ঠে ডাকল, এই সু—

কি রে?

একটু চলে আয় না।

এই যে—

সুব্রত উঠে দাঁড়িয়ে উপরের বাঙ্ক থেকে বাস্কেটটা নামিয়ে তার থেকে দুটো গ্লাস, সোডার বোতল ও ওল্ড স্মাগলারের শিশিটা বের করল।

দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে সোডা মিশিয়ে একটা গ্লাস কিরীটীকে দিল, অন্যটা নিজে নিল! তারপর হঠাৎ কি ভেবে কাপুরের দিকে তাকিয়ে বললে, মিঃ কাপুর—লাইক টু

হ্যাভ সাম ড্রিঙ্ক!

অফ কোর্স।

সুব্রত আর একটা গ্লাস বের করছিল কিন্তু মিঃ কাপুর নিজেই তার বাস্কেটটা টেনে খুলে একটা গ্লাস ও ভ্যাট ৬৯-এর বোতল বের করলেন, তারপর গ্লাসটা সুব্রতর দিকে এগিয়ে দিলেন।

সুব্রত কাপুরের হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে গ্লাসটা কাপুরের দিকে তুলে শুধালে, দিস্ মাচ!

ইয়েস।

হাউ মাচ সোডা?

একটু বেশী দেবেন।

সুব্রত গ্লাসে সোডা মিশিয়ে গ্লাসটা এগিয়ে কাপুরের দিকে।

॥ দুই ॥

কাপুর বুকপকেট থেকে একটা সিগারেট কেস বের করলেন, তারপর নিজে একটা সিগারেট নিয়ে কেসটা সুব্রতর দিকে এগিয়ে ধরলেন, সিগ্রেট—

নো, থ্যাংকস।

হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? কাপুর কেসটা এবারে কিরীটীর দিকে এগিয়ে ধরলেন।

নো, থ্যাংকস।

আপনার চলে না?

চলে, তবে সিগার—বলে কিরীটী পকেট থেকে একটা চামড়ার সিগার কেস বের করে তা থেকে একটা সিগার নিয়ে অগ্নিসংযোগ করতে উদ্যত হলো। তখনো সে তার গ্লাসে ওষ্ঠ স্পর্শ করেনি।

ভদ্রমহিলা কিন্তু একই ভাবে তার হাতের ম্যাগাজিনটা পড়ে চলেছিলেন। এতক্ষণ ওদের দিকে তাকানওনি।

হঠাৎ কিরীটী ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বললে, আমরা আপনার কোন অসুবিধা করছি না তো?

ভদ্রমহিলা চোখ তুললেন—চোখে-মুখে একটা চাপা হাসির বিদ্যুৎ যেন। না, না—ক্যারি অন!

পরিষ্কার শুদ্ধ ইংরাজী ও বাংলা উচ্চারণ।

বাংলা শুনেই কিরীটীর মনে হলো ভদ্রমহিলা বাঙালী।

তাছাড়া ওসবে আমি খুবই অভ্যস্ত—আবার হাসলেন ভদ্রমহিলা।

হঠাৎ সুব্রতর কি হলো, বললে, কিন্তু কেমন যেন বিশ্রী লাগছে—

না, না তাতে কি হয়েছে? আপনাদের কিন্তুর কোন প্রয়োজন নেই—আমাদের ঐ কাপুর সাহেবটির জন্য আমরা ও-ব্যাপারে রীতিমত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি—স্মিতকণ্ঠে কথাগুলো বললেন ভদ্রমহিলা; কিন্তু চোখে-মুখে তাঁর সেই চাপা হাসির বিদ্যুৎ খেলছিল।

ইয়েস—শকুন্তলা ইজ কোয়ায়েট হ্যাভিচুয়েটেড! কোন উন্নাসিকতা নেই—হাজার হলেও এ যুগের তরুণী তো। হাসতে হাসতে বললেন মিঃ কাপুর।

একটু কটাক্ষ হেনে শকুন্তলা বললেন, এ যুগের তরুণীদের যেন একেবারে সব আদি-অন্ত জেনে ফেলেছেন মশাই—

পরিষ্কার বাংলা—পরিষ্কার উচ্চারণ শকুন্তলার।

কিরীটী বললে সকৌতুকে, আপনি তো চমৎকার বাংলা বলেন।

মানে! বাংলা বলবো না কেন? আমি তো বাঙালী—

হ্যাঁ মশাই—মিঃ কাপুর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, একেবারে সেন্ট পারসেন্ট বাঙালী—আপনি—

হ্যাঁ, ওর ভগ্নীটিও তাই—বাঙালী মেয়েই বিয়ে করেছি।

তাই বলুন! কিরীটী বলে।

কিরীটী মৃদুহেসে বলে, তাহলেও খারাপ লাগছে মিঃ কাপুর, আমরা ড্রিঙ্ক করছি আর উনি চুপচাপ বসে আছেন—মিস—

আমার নাম শকুন্তলা চ্যাটার্জী। শকুন্তলা বললেন, আমার ফ্লাস্কে গরম কফি আছে, আমি বরং কফি খাচ্ছি—বলতে বলতে শকুন্তলা ফ্লাস্কটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন।

ক্রমশ চারজনের মধ্যে বেশ গল্প জমে ওঠে।

হঠাৎ একসময় শকুন্তলা কথার মধ্যে বলে উঠলেন, আচ্ছা ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড মিঃ রায়—আপনি কি এসময় সত্যি সত্যিই স্রেফ বেড়াতেই যাচ্ছেন দিল্লীতে?

কেন বলুন তো? একটু কৌতুকের দৃষ্টিতেই যেন তাকাল প্রশ্নটা করে কিরীটী শকুন্তলার মুখের দিকে।

কারণটা ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।

কেন? বিশ্বাস করতে পারছেন না কেন?

আপনার মত লোক বিনা প্রয়োজনে এই প্রচণ্ড শীতে দিল্লীতে চলেছেন—

আমার মত লোক? আপনি আমাকে চেনেন নাকি? কিরীটী তাকাল কথাটা বলে শকুন্তলার মুখের দিকে। তার দু'চোখে শাণিত দৃষ্টি—

আপনাকে কে চেনে না বলুন—কিরীটী রায়কে চেনে না—তারপরই একটু থেমে মৃদু হেসে শকুন্তলা বললেন, দেখেই আপনাকে আমি চিনেছিলাম—

কিরীটী প্রত্যুত্তরে নিঃশব্দে মৃদু হাসলো!

কিন্তু সত্যি বলুন না—কেন এসময় দিল্লী যাচ্ছেন?

অনুমান করুন না।

কেমন করে অনুমান করবো?

কেন, পারেন না?

হঠাৎ যেন একটু থতমত খেয়েই শকুন্তলা কিরীটীর মুখের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকালেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন, পারছি না।

থট-রিডিং করুন।

ও বিদ্যে আমার জানা নেই, আপনার আছে নাকি? সকৌতুকে তাকালেন শকুন্তলা

কিরীটীর মুখের দিকে। তাঁর দুই চোখে সেই চাপা হাসির বিদ্যুৎ যেন ঝিলিক হানছে। বলুন তো আমি এই মুহূর্তে কি ভাবছি? শকুন্তলা প্রশ্ন করেন।

আপনি ভাবছেন—

বলুন! বলুন না? গলায় শকুন্তলার আবদারের সুর যেন একটা।

সুব্রত ও রঞ্জিত কাপুর কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে আছে তাদের আলোচনা ভুলে। কাপুর না বুঝতে পারলেও সুব্রত যেন স্পষ্ট দেখতে পায় কিরীটীর দু'চোখের তারায় কেবল কৌতুকই নেই—সেই কৌতুকের পিছনে ঝিলিক দিচ্ছে আরো একটা কিছু।

আপনি ঠিক এই মুহূর্তে ভাবছেন—

ইয়েস! বলুন!

যে কাজের জন্য আপনি চলেছেন তা খুব সহজ হবে না—তাই নয় কি?

খিলখিল করে হেসে উঠলেন শকুন্তলা—কামরার মধ্যে যেন হাসিটা মিষ্টি জলতরঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়ল। শকুন্তলা বললেন, ভুল—

ভুল!

হ্যাঁ, কারণ কোন কাজের জন্যই আমি—

তবে এ সময় আপনি দিল্লী চলেছেন কেন?

দিল্লী? কে বললে? আমি তো কানপুর চলেছি।

যাচ্ছিলেন দিল্লী, তবে আপাতত ভাবছেন কানপুরেই ব্রেক-জার্নি করবেন।

ব্রেক-জার্নী করবো কানপুরে?

হ্যাঁ।

শকুন্তলা আবার পূর্বের মত হেসে উঠলেন। বললেন, কানপুরেই যাচ্ছি—আমার দিল্লী যাবার আপাতত কোন প্রোগ্রামই নেই।

মোস্ট ডিপ্লোমেটিক—

কি বললেন?

কিছু না—তবে এটা জানি—

কি জানেন?

দিল্লীতে আবার আমাদের দেখা হবে।

তা যদি হয় মিঃ রায় সত্যিই খুব খুশী হবো।

আমিও। কিরীটী হাসতে হাসতে বললে।

ট্রেনের গতি বাইরে মন্দীভূত হয়ে আসছিল ইতিমধ্যে।

সহসা কিরীটী প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল। বললে, সুব্রত, বোধ হয় বর্ধমানে এসে গেল গাড়ি!

সত্যি বর্ধমান।

স্টেশন ইয়ার্ডের আলো চলমান গাড়ির জানলা-পথে সকলের চোখে পড়ে। গাড়ির গতি আরো মন্দীভূত হয়ে আসছে।

কিরীটী উঠে দাঁড়াল। চল্ সুব্রত—

কাপুর জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় চললেন মিঃ রায়?

BanglaBook.net

ডাইনিং সেলুনে যাচ্ছি—যাবেন নাকি?

হ্যাঁ, যাবো বৈকি—আপনারা এগোন আমরা আসছি।

গাড়ি ধীরে ধীরে আলোকিত প্ল্যাটফরমে ইন করছে।

কিরীটী আর সুব্রত কামরা থেকে বের হয়ে গেল।

ডাইনিং সেলুনে বেজায় ভিড়।

টেবিলে টেবিলে যাত্রীরা সব বসে কেউ খাচ্ছে, কারো খাওয়া শেষ, এবারে উঠবে। কাঁটা-চামচের ঠুংঠাং শব্দ—বহু কণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন আর সিগারেটের ধোঁয়া। অনেকেই হাওড়া থেকে ডাইনিং সেলুনে উঠেছিল—তারা উঠে পড়ে।

কোণের একটা টেবিলে দুজনে গিয়ে বসল।

বসতে বসতে সুব্রত বলে, কৃষ্ণাও টিফিন-ক্যারিয়ারে প্রচুর খাবার দিয়ে দিয়েছে। তবে আবার এখানে এলি কেন?

কিরীটী যেন কি ভাবছিল, সুব্রতর প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না।

খাবারগুলো—

নষ্ট হবে না, কাল খাওয়া যাবে। কিরীটী বললে।

বেয়ারা এসে দাঁড়াল অর্ডার নেবার জন্য।

সুব্রত বললে, কি অর্ডার দেবো বল্?

যা খুশি দে না—

সুব্রতই তখন মেনু দেখে খানার অর্ডার দিল। বেয়ারা চলে গেল। কিরীটী কাঁচের জানলাপথে বাইরের আলোকিত প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে থাকে।

তুই যেন কিছু ভাবছিস মনে হচ্ছে কিরীটী।

তোকে একটা কাজ করতে হবে সুব্রত—

কি, বল্।

কানপুরে তোকে ব্রেক-জার্নি করতে হবে।

সুব্রত চমকে যেন কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

ওরা কোথায় যায়, কোথায় ওঠে তোকে জানতে হবে, তারপর আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয়—পরের ট্রেনেই হয়ত ওরা দিল্লী যাবে—ওদের তুই ফলো করবি।

করবো—কিন্তু—

দিল্লীতে গিয়েও তুই ওদের ফলো করে ওরা কোথায় ওঠে জানবি, তারপর—

তোর সঙ্গে কোথায় কনটাক্ট করবো?

দেবেশের ওখানে—ওকে আমি বলে রাখবো।

ঠিক আছে।

কিন্তু খুব সাবধান, মীনাক্ষী অত্যন্ত ধূর্ত ও সজাগ।

মীনাক্ষী!

ওর আসল নাম শকুন্তলা নয়, মীনাক্ষী—

কি করে জানলি?

ওর হাতের মীনা করা আংটিটা বাঁ হাতের অনামিকায় লক্ষ্য করলে দেখতে পেতিস।

সুব্রত কোন কথা বলে না।

কিরীটী একটু হেসে বলে, ও বুঝতে পারেনি কিন্তু আমি ওকে গাড়ির কামরায় দেখেই চিনেছিলাম—আই মেট হার বিফোর।

কোথায়?

দিল্লীতে।

দিল্লীতে!

হ্যাঁ, মিঃ সিংয়ের সঙ্গে গতবার যখন দিল্লীতে যাই—আমেরিকান কনসুলেটে একটা ককটেইল পার্টিতে ওকে দেখেছি?

সত্যি?

হ্যাঁ, তাছাড়া—

কিন্তু কিরীটীর আর কথা বলা হলো না। বেয়ারা ঐ সময় খানা নিয়ে এলো।

ট্রেন ততক্ষণে আবার চলতে শুরু করেছে।

॥ তিন ॥

রাত প্রায় পৌনে দশটা।

ডাইনিং সেলুন প্রায় খালি হয়ে এসেছে তখন। কয়েকটা টেবিলে সামান্য কয়জন যাত্রী এদিক ওদিক ছড়িয়ে তাদের রাতের খানা শেষ করে কফির পেয়ালা নিয়ে বসেছে। কারো কারো সেই সঙ্গে চলেছে ধূমপান।

দ্রুত ধাবমান মেল ট্রেনের কাঁচের জানালা-পথে শীতের স্তব্ধ রাত্রির চতুর্দশীর চাঁদের আলো যেন অলসভাবে গা এলিয়ে পড়ে আছে।

মধ্যে মধ্যে এক-একটা স্টেশন মেল গাড়িটা অতিক্রম করে চলেছে। স্টেশনের আলো চকিতে যেন দেখা দিয়ে আবার দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

ওরা দুজনেও ইতিমধ্যে খানা শেষ করে কফি নিয়ে বসেছিল। বেয়ারারা একে একে টেবিল পরিষ্কার করে ডিশ-প্লেট, কাঁটা-চামচ তুলে নিয়ে যাচ্ছে—কেবল তারই মৃদু শব্দ মধ্যে মধ্যে শোনা যায়।

যে সময়ের কথা বলছি তখনো করিডোর ট্রেনের প্রচলন হয়নি।

কাজেই খানা শেষ হয়ে গেলেও গাড়ি আসানসোল না পৌঁছানো পর্যন্ত ওদের ডাইনিং-কারেই থাকতে হবে।

কিরীটী!

উঁ—

ঐ রঞ্জিত কাপুর লোকটা—ওকে দেখেছিস আগে? মীনাক্ষীর ভগ্নীপতি?

না। তবে যে সম্পর্কটার কথা ওদের পরস্পরের বললে সেটাও আমার সত্য বলে মনে হয় না।

আমারও তাই মনে হচ্ছে।

কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।

কি? তোর ব্যাপারটা ওদের জানা?

নিঃসন্দেহে। যেভাবেই হোক, প্রতিপক্ষ টের পেয়েছে যে আমি দিল্লী কেন যাচ্ছি এবং কবে, কখন যাচ্ছি।

তোর অনুমান যদি সত্য হয় তো তাই দেখতে পাচ্ছি।

যে কারণে প্লেনে না গিয়ে ট্রেনে চলেছি, সেটা দেখছি মাঠেই মারা গেল।

আমার মনে হয় গতবার যখন তুই দিল্লী গিয়েছিলি তখনই ওরা জানতে পেরেছিল কোনমতে—

কিরীটী কোন জবাব দিল না।

সে যেন কি ভাবছিল।

সুব্রত আবার বললে, ওদের অজ্ঞাতে ব্যাপারটা থাকলে তুই হয়ত কাজের কিছুটা সুবিধা পেতিস।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, এখনো কোন অসুবিধা হবে না। যতটা সতর্ক থাকতাম তার চাইতে বেশীই থাকব—কিন্তু গাড়ি বোধ হয় আসানসোল এলো—ইয়ার্ডের আলো দেখা যাচ্ছে।

একজন বেয়ারা কফির শূন্য কাপগুলো তুলে নিতে এসেছিল, তাকেই সুব্রত জিজ্ঞাসা করে, আসানসোল আর কেতনা দূর?

আসানসোল গাড়ি আগয়ি সাব—

মিনিট দশেকের মধ্যে সত্যিই গাড়ির গতি হ্রাস পায়—বাইরের আলো আরো উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়।

বিল মিটিয়ে দিয়ে ওরা উঠে পড়ল।

গাড়ি থামতেই ওরা ডাইনিং-কার থেকে নামল।

কনকনে শীত বাইরে।

তবু তারই মধ্যে দেখা যায় প্ল্যাটফর্মে যাত্রীর ভিড়, ভেন্ডারদের চিৎকার—গরম চায়—গরম পুরি—পান সিগ্রেট—

ওরা এসে যখন কামরায় ঢুকলো—কাপুর উপরের একটা বার্থে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। বোধ হয় ঘুমিয়েও পড়েছে। শকুন্তলা কিন্তু তখনো শোয়নি, নীচের বার্থে একটা কালো রংয়ের গরম রাত্রিবাস গায়ে—বার্থের উপর বিস্তৃত শয্যায় বসে একটা কি বই পড়ছে।

ওদের ঢুকতে দেখে বললে, খাওয়া হলো রায় সাহেব!

হ্যাঁ। কাপুর সাহেব দেখছি শুয়ে পড়েছেন।

হ্যাঁ। ওর নেশাটা বোধ হয় একটু বেশীই হয়েছিল, খানা খেয়েই শুয়ে পড়েছে। ওর তো এতক্ষণে মধ্যরাত্রি।

সুব্রত বললে, আপনি যে শোননি?

ট্রেনে চট করে আমার ঘুম আসে না।

সুব্রত তার সুটকেস খুলে রাত্রিবাসটা বের করে কামরা থেকে বের হয়ে গেল।

ল্যাভেটরিতে গিয়ে রাত্রিবাস গায়ে চাপিয়ে সুব্রত মিনিট পনেরো বাদে যখন কামরায়

ফিরে এলো, কিরীটী উঠে দাঁড়াল হাতে রাত্রিবাসটা নিয়ে।

কিরীটীর রাত্রে স্নান করা অভ্যাস, তা সে কি গ্রীষ্ম কি শীত। স্নান না করলে রাত্রে তার ঘুমই হয় না।

ফিরে এসে দেখলো কিরীটী, সুব্রত শুয়ে পড়েছে আগাগোড়া কম্বলটা মুড়ি দিয়ে। শকুন্তলাও শুয়ে পড়েছে।

রাতও অনেক হয়েছে।

কিরীটী বার্থে উঠে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে গায়ে কম্বলটা টেনে দিল।

চলন্ত ট্রেনে কিরীটীরও তেমন বড় একটা ভাল ঘুম কোনদিনই হয় না। তবু সে চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল কিরীটী।

যখন ঘুম ভাঙল চারিদিকে বেশ আলো ফুটে উঠেছে।

কামরার বন্ধ কাঁচের শার্সি ভেদ করে কামরার মধ্যে আলো এসে পড়েছে—তবে সেটা খুব স্পষ্ট নয়। ঝাপসা ঝাপসা।

বালিশের উপর থেকে মাথাটা সামান্য তুলে নীচের দিকে তাকাল। ট্রেনের গতি তখন ক্রমশ হ্রাস হয়ে আসছে।

ট্রেন বোধ করি মোগলসরাই এলো।

গরম ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে কিরীটী উপরের বার্থ থেকে নীচে নামল। নীচের দুটো বার্থে শকুন্তলা আর সুব্রত ঘুমোচ্ছে।

উপরের বার্থে ঘুমোচ্ছে কাপুর।

স্টেশন ইয়ার্ডে অনেক আলো দেখা যাচ্ছে।

কিরীটী চায়ের পিপাসা বোধ করে। বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে কামরার মধ্যে যখন কিরীটী ফিরে এলো—দেখলো কামরার মধ্যে একমাত্র সুব্রত ছাড়া অন্য দুজন নেই।

মোগলসরাই স্টেশনে ট্রেন থেমেছে।

কিরীটী বাইরে গিয়ে দুজনের মতো চায়ের অর্ডার দিয়ে যখন কামরার মধ্যে ফিরে এলো—দেখলো কাপুর আর শকুন্তলা বসে চা পান করছে।

সুব্রত তখনো ঘুমোচ্ছে।

শকুন্তলা আর রঞ্জিত কাপুর দুজনাই বললে, গুডমর্নিং, মিঃ রায়।

গুড মর্নিং।

চা চলবে নাকি? শকুন্তলা শুধায়।

আপনারা খান—আমি চায়ের কথা বলে এসেছি।

সুব্রত কম্বলের তলা থেকেই কথা বলে ওঠে, বলেছিস?

হুঁ। তোর ঘুম ভাঙল? কিরীটী প্রশ্ন করে।

সুব্রত বললে, অনেকক্ষণ!

বেলা দুটো নাগাদ ট্রেন কানপুরে এসে পৌঁছায়।

কথা ছিল শকুন্তলা একাই কানপুরে নেমে যাবে—কিন্তু রঞ্জিত কাপুরও নেমে গেল।

সুব্রত প্রস্তুত হয়েই ছিল। ওরা গাড়ি থেকে নামার কিছু পরেই সুব্রতও সুটকেসটা নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল।

কিরীটী একাই গাড়ির কামরায়—আর কোন যাত্রী ছিল না।

ট্রেন ছাড়ার পর কিছুক্ষণ কিরীটী চলন্ত গাড়ির জানালা-পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে—তারপর সকালে এলাহবাদে স্টেশনে কেনা সংবাদপত্রটা টেনে নেয় আবার—নতুন করে চোখ বুলাবার জন্য।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা ওল্টাতেই হঠাৎ একটা ভাঁজ-করা কাগজ বের হয়ে পড়লো। একটু কৌতূহলের বশেই ভাঁজ করা কাগজটা খুলে ধরতেই কিরীটী যেন একটা চমক অনুভব করে।

ভাঁজ করা কাগজ মাত্র নয়, একটা চিঠি।

সংক্ষিপ্ত ইংরাজীতে লেখা। বেশ পরিষ্কার করে গোটা গোটা ইংরাজীতে লেখা। লেখাগুলো সামান্য যেন কেঁপে কেঁপে গিয়েছে।

মিঃ রায়,

যাঁরা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁরা যেমন আলেয়ার পিছনে ছুটছেন—আপনাকেও ঠিক তেমনি ছুটে মরতে হবে। আপনার ক্ষমতা আছে আমরা জানি, কিন্তু 'পেনিট্রেশন' করার চেষ্টা করলে বিপদকেই ডেকে আনা হবে জানবেন। আর তাছাড়া যে কাজের জন্য আপনি যাচ্ছেন সেটা এখন সকলেরই নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে।

—'এক্স'

কিরীটী বার দু-তিন আগাগোড়া চিঠিটা পড়লো।

হাতের লেখা থেকে ঠিক স্পষ্ট বোঝা যায় না—হাতের লেখাটা মেয়ের না পুরুষের; খানিকটা মেয়েলী ধাঁচের লেখা বটে আবার পুরোপুরি মেয়েলীও নয়—পুরুষের হাতের লেখা হওয়াও আশ্চর্য নয়।

বেশ তাড়াতাড়ি লেখা হয়েছে।

কিন্তু লেখাটা কখন কাগজের মধ্যে এলো?

চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল কিরীটী।

এখন আরো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা সত্যিই খুব সহজ নয়। দপ্তর থেকে যে গোপনীয় দলিলটা চুরি গিয়েছে সেটার মূল্য বা গুরুত্ব সম্পর্কে এখনো বিশেষ কিছু জানে না কিরীটী। তবে দলিলটার যে বিশেষ একটা মূল্য আছে সেটা সে বুঝেছিল, নচেৎ অন্তত সে-ব্যাপারে দিল্লীতে তার ডাক পড়তো না এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরও অতখানি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতো না।

বিশেষ কোন আলোচনারই সুযোগ পায়নি গতবারে কিরীটী।

এবং এটাও সে বুঝতে পারছে, দলিলটা চুরি যাওয়ার ব্যাপারে সরকার-পক্ষ যে তার সাহায্যের জন্য তাকে আহ্বান জানিয়েছেন সেটা অন্তত প্রতিপক্ষের অজানা নেই আর।

অতএব তাকে এবার খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হবে।

সকালের দিকে কিরীটী দিল্লী স্টেশনে অবতরণ করল।

BanglaNet

তাকে নিয়ে যাবার জন্য হয়ত গাড়ি এবং লোক এসেছিল, কিন্তু কিরীটী সে সম্পর্কে কোন খোঁজখবরই নিল না—স্টেশন থেকে বের হয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলল, সোজা রায়সিনহা রোডে যেতে।

মনে মনে স্থির করেছিল সে, সোজা গিয়ে আপাতত তার বন্ধু দেবেশের ওখানেই উঠবে।

তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

॥ চার ॥

কিরীটী যখন গিয়ে দেবেশের ওখানে পৌঁছাল দেবেশ তখনো অফিসে বের হয়নি। নিজের বাংলোতে তার অফিস-ঘরে বসে কাজ করছিল।

গেটের ভিতর দিয়ে ট্যাক্সি ঢোকার শব্দে দেবেশ বের হয়ে আসে।

কিরীটীকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে দেবেশ রীতিমত বিস্মিতই হয়।

কিরীটী তুই!

এলাম বেড়াতে, কটা দিনের জন্য। চল্ ভিতরে যাওয়া যাক।

বলতে বলতে দুজন এসে দেবেশের অফিস-ঘরে ঢুকল।

তারপর কি ব্যাপার? এই শীতের সময় হঠাৎ রাজধানীতে!

চেয়ারে বসতে বসতে কিরীটী বললে, কেন, শীতের সময় তোদের রাজধানীতে আসা বারণ নাকি!

তা নয়—তবে—

কি?

সত্যি বল্ তো ব্যাপারটা কি? তুই সত্যি সত্যি বেড়াতে এসেছিস?

বিশ্বাস করতে পারছিস না?

ঠিক তাই।

এসেছি কেন নিশ্চয়ই তুই জানবি—তার আগে একটু চায়ের ব্যবস্থা কর—তোর গিন্নী কোথায়?

সে তো এখানে নেই।

নেই!

না, মাসখানেকের জন্য কলকাতা গিয়েছে। বলতে বলতে দেবেশ কলিংবেল বাজাল।

বেয়ারা রামলাল এসে ঘরে ঢুকল।

রামলাল!

জী সাব—

চা নিয়ে আয়—

রামলাল চলে গেল।

দু-একদিন থাকবি, না আজই চলে যাবি? দেবেশ শুধায়।

দিন দশ-বারো হয়ত থাকবো।

BanglaBook.org

সঙ্গে মালপত্র কিছু নেই?

একটা সুটকেস আর একটা হোলডল।

একটু পরে রামলাল চা নিয়ে এলো।

দুই বন্ধুতে চা-পান করতে করতে আবার কথা কয়। এবং তখুনি কিরীটী সংক্ষেপে তার দিল্লী আগমনের কারণটা দেবেশকে খুলে বলে।

কিন্তু ব্যাপারটা টপ সিক্রেট—

ভয় নেই তোর, এখান থেকে তোর সিক্রেট বের হবে না। হাসতে হাসতে দেবেশ বললে।

জানি। শোন্ তোকে একটা কাজ করতে হবে।

কি বল্?

প্রতাপ সিংকে তুই জানিস নিশ্চয়ই!

একজন প্রতাপ সিংকে জানি, প্রতিরক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী—কিন্তু কেন্ বল্ তো? লোকটা কিন্তু বিশেষ সুবিধার নয়।

আর কোন প্রতাপ সিং কেউ কোন দপ্তরে সেক্রেটারী আছে নাকি!

আর একজন সিং আছে তবে সে প্রতাপ সিং নয়।

প্রতাপ সিং রামস্বামীর সেক্রেটারী তো?

হ্যাঁ, তিনিই বটে।

তাকে একবার এখন ফোনে পাওয়া যাবে?

তা হয়ত যেতে পারে।

দেখ্ তো, কানেকশন পাস কিনা।

প্রতাপ সিংকে বাড়িতে নয়, তার দপ্তরেই পাওয়া গেল।

ফোনটা দেবেশ কিরীটীর হাতে তুলে দিল।

মিঃ সিং—গুড মর্নিং—আমি রায়!

মিঃ রায়? কখন এলেন—কোন্ ট্রেনে, না প্লেনে এলেন?

সকালের ট্রেনেই এসেছি।

আমার লোক আর গাড়ি ফিরে এলো—তারা বললে আপনাকে খুঁজে পেলো না।

ইচ্ছে করেই ধরা দিইনি।

বুঝেছি—তা এখন কোথা থেকে কথা বলছেন? কোথায় উঠেছেন?

সাক্ষাতে সব জানাব—আপনার সঙ্গে কখন কোথায় দেখা হতে পারে বলুন, মিঃ সিং।

বলেন তো এই মুহূর্তেই হতে পারে, গাড়ি পাঠাতে পারি—আপনি তো জানেন, হাউ উই আর অ্যাঙসাস টু মিট ইউ!

ঠিক আছে, এখন বেলা পৌনে দশটা; এগারোটায় আপনার অফিসে মিঃ গুলজার সিং নামে একজন যাবে—

হু ইজ গুলজার সিং?

সাক্ষাতেই তার পরিচয় পাবেন। কিরীটী ফোনটা রেখে দিল।

বেলা ঠিক এগারোটায় মিঃ সিংয়ের বেয়ারা এসে সেলাম দিল, তার হাতে একটা চিরকুট—চিরকুটে লেখা ইংরেজীতে গুলজার সিং।

প্রতাপ সিং সেকেলে একজন দুঁদে আই. সি. এস. অফিসার—বয়েস পঞ্চাশের কিছু ঊর্ধ্বেই হবে। তবে চেহারা থেকে বয়েসটা ঠিক ধরা যায় না।

বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা—ছয় ফুটের কাছাকাছি প্রায় লম্বা। পাঞ্জাবী শিখ হলেও দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। পরনে দামী গরম সুট। মাথার চুল ব্যাক-ব্রাশ করা—রগের দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে।

প্রতাপ সিং টেবিলের উপর একটা ফাইল খুলে কি সব দেখছিলেন, বেয়ারাকে বললেন, গুলজার সিংকে ঘরে পাঠিয়ে দিতে।

মে আই কাম ইন?

ইয়েস, কাম ইন।

কিরীটী এসে ঘরে ঢুকল। ডোর-ক্লোজার লাগানো দরজা নিঃশব্দে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে এক কোণে ইলেকট্রিক হিটার বসানো! ঘরের বাতাস বেশ উষ্ণ—আরামপ্রদ।

কিরীটীর পরনে দামী স্যুট। মুখে চাপদাড়ি, মাথায় পাগড়ি, চোখে কালো কাঁচের চশমা।

প্রতাপ সিং কিন্তু চিনতে পারেন না কিরীটীকে, কারণ গতবারের বেশভূষা ছিল অন্যরকম কিরীটীর।

বৈঠিয়ে সাব।

কিরীটী বসলো মুখোমুখি একটি চেয়ারে।

আপনি মিঃ রায়ের কাছ থেকে আসছেন?

হ্যাঁ, মিঃ সিং—

ইয়েস—

আমিই রায়—

গুড হেভেনস।

হাশ্! আস্তে—এখানে যে কদিন থাকবো এইটাই হবে আমার পরিচয়।

বাট হোয়াই?

প্রয়োজন আছে—যাক এখন কাজের কথায় আসা যাক—কেউ এখন এখানে আসবে না তো?

না।

তাহলে কাজের কথাতেই আসা যাক। সে দলিলটা সম্পর্কে আর কোন সংবাদ পাননি?

দলিলটা পাওয়া গিয়েছে।

গিয়েছে? হাউ? কোথায় পেলেন?

যে আয়রন সেফ থেকে খোয়া গিয়েছিল তার মধ্যে পাওয়া গিয়েছে।

বলেন কি? কবে পেলেন?

pathagar.net

দিন দুই হলো।

কিন্তু আপনি তো আমাকে ফোনে সেকথা জানাননি।

না, জানাইনি—তার কারণ—

কি বলুন তো?

কারণ যারা সেটা চুরি করেছিল তারা সম্ভবত তার একটা ব্লু-প্রিন্ট করে নিয়েছে।

সত্যি?

হ্যাঁ, তবে—

তবে কি?

সেবারে আপনাকে বলেছিলাম সেটা হয়ত বিদেশে পাচার হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমরা ভাল করে সংবাদ পেয়েছি এখনো সেটা পাচার করতে পারেনি।

আর ইউ শিয়োর?

নচেৎ বলবো কেন?

মন্ত্রীমশাই আছেন এখন অফিসে?

আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, তাঁকে আপনার কথা জানিয়েছি।

তাহলে একবার চলুন তাঁর ঘরে যাওয়া যাক।

এখুনি যাবেন?

হ্যাঁ, চলুন—

দুজনে অতঃপর সিংয়ের ঘর থেকে বের হয়ে একটা লম্বা করিডোর অতিক্রম করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দপ্তরের সামনে এসে দাঁড়াল।

দরজার গায়ে লাল বাতি জ্বলছে ঃ এনগেজড।

দরজার সামনে টুলের উপরে যে বেয়ারা বসেছিল সে সিংকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম দেয়।

ঘরে কে আছে ব্রিজনাথ?

সাহেবের পার্সোন্যাল স্টেনো—সাহেব কি সব যেন ডিকটেশন দিচ্ছেন।

আপনি একটু দাঁড়ান, আমি দেখি—প্রতাপ সিং দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে গেল। মিনিট দুয়েক বাদে একটি অতি-আধুনিকা তরুণী হাতে কতকগুলো কাগজপত্র নিয়ে বের হয়ে কিরীটীর পাশ দিয়ে।

কিরীটী যেন তরুণীটিকে দেখেও দেখে না—সে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।

প্রতাপ সিং দরজা খুলে কিরীটীকে ভিতরে আসতে আহ্বান জানাল।

কিরীটী ভেতরে প্রবেশ করল।

চমৎকার ভাবে সাজানো-গোছানো ঘরটি। ঘরটি কিরীটীর অপরিচিত নয়—ইতিপূর্বে দিল্লীতে এলে, ওই ঘরের মধ্যে মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনা হয়েছিল।

প্রতাপ সিং বোধ হয় আগেই কিরীটীর ব্যাপারটা রামস্বামীকে জানিয়ে দিয়েছিল ঃ রামস্বামী তাকে সাদর আহ্বান জানালেন, বি সিটেড প্লিজ মিঃ রায়।

কিরীটী সামনের চেয়ারটায় বসে।

আচ্ছা মিঃ সিং, তুমি তাহলে সেই জরুরী ফাইলটা আজই যাতে আমাদের প্রধান

মন্ত্রীর দপ্তরে পৌঁছায় তার ব্যবস্থা করো—আমি ততক্ষণে ওঁর সঙ্গে কথাটা সেরে নিই।

ও, কে—স্যার।

প্রতাপ সিং ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আপনি এসে গেছেন মিঃ রায়, আমি যেন বেঁচেছি। কি অসহ্য উদ্বেগের মধ্য দিয়ে যে দিনরাত কাটছে।

॥ পাঁচ ॥

আপনার সেক্রেটারীর মুখে শুনলাম আসল ডকুমেন্টটা পেয়ে গিয়েছেন—কিরীটী বললে।

তাতেই তো আরো আমার মাথা ঘুরতে শুরু করেছে, রামস্বামী বললেন।

ঠিক যেখানে ছিল আয়নার সেফ্-এ, ঠিক সেখানেই পেয়েছেন কি ডকুমেন্টটা?

অ্যাঁ, হ্যাঁ তাই—একজাক্টলি হোয়ার ইট ওয়াজ! আরো নূতন করে গোলমাল দেখা দিয়েছে ঐ দলিলটা আবার ফিরে পাওয়াতেই।

কেন?

প্রধান মন্ত্রীর ধারণা—

কি?

বুঝতে পারছেন না, যদিও রাদার ফ্যান্টাস্টিক—তাহলেও তাঁর ধারণা, যারা হাত-সাফাই করেছিল তারা নিশ্চয়ই তার একটা ব্লু-প্রিন্ট করে নিয়েছে।

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বললে, তাঁর ধারণা মিথ্যা নাও হতে পারে। হয়ত সত্যিই সেটার একটা ব্লু-প্রিন্ট করে নিয়ে দলিলটা আবার যথাস্থানে রেখে গিয়েছে—কথাটা বলতে বলতে হঠাৎ যেন কিরীটী থেমে গেল।

মনে হলো তার মাথার মধ্যে হঠাৎ যেন কোন একটা চিন্তা এসে উঁকি দিয়েছে।

কি ভাবছেন মিঃ রায়?

কিছু না—আচ্ছা মিঃ রামস্বামী—

বলুন।

দলিলটা যে চুরি গিয়েছিল, ব্যাপারটা কে কে জেনেছিল বলুন তো?

ব্যাপারটা প্রথম থেকেই, বুঝতেই তো পারছেন, সিক্রেট ও কনফিডেনশিয়াল রাখা হয়েছে—

তবু কে কে জানত?

প্রধানমন্ত্রী, আমি আর আমার চীফ সেক্রেটারী প্রতাপ সিং ছাড়া কেউ জানে না।

প্রতাপ সিংকে নিশ্চয়ই আপনি খুব বিশ্বাস করেন?

ওঃ, শিয়োর! হি ইজ অ্যাবভ অল সাসপিসান।

হুঁ। তা বলছিলাম—

বলুন।

দলিলটা যখন পেয়ে গিয়েছেন, তখন কি আর আমার কোন প্রয়োজন আছে?

কি বলছেন মিঃ রায়, দলিলের কপি যখন করে নিয়েছে—সেটা পাচার হবেই

আর একটা কথা—

বলুন!

আমি যাবো আপনার পার্টিতে কিন্তু আমার পরিচয়টা যেন যথাসাধ্য গোপন থাকে।

আপনি যেমন বলবেন মিঃ রায় তেমনিই হবে—তারপরেই একটু থেমে মন্ত্রী মশাই বললেন, আপনার ব্যক্তিগত সিকিউরিটির জন্য যদি কোন প্রহরার প্রয়োজন বোধ করেন তো আমাকে জানাতে কোনরকম দ্বিধাবোধ করবেন না মিঃ রায়।

না, সেরকম কিছু আপাতত আমার প্রয়োজন নেই।

গাড়ি চাই না আপনার?

না।

কোথায় উঠেছেন।

রায়সিনহা রোডে।

আপনার থাকার তো আমি ভাল ব্যবস্থা করেছিলাম।

তার প্রয়োজন নেই।

ঠিক আছে, কিছু দরকার হলে সিংকে বলবেন।

জানাবো। এখন তাহলে আমি উঠবো—

কিরীটী মন্ত্রীমশাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

বিকেলের দিকে সুব্রত এলো।

দেবেশ তখনো অফিস থেকে ফেরেনি। শীতের বেলা ইতিমধ্যেই ম্লান হয়ে এসেছিল। দেবেশের বসবার ঘরে চা-পান করতে করতে দুজনার মধ্যে কথাবার্তা হয়।

তারপর তোর কি খবর বল্ সুব্রত?

খবর বিশেষ কিছু নেই—স্টেশন থেকে বেরুনো পর্যন্ত ওদের আমি ফলো করেছিলাম।

তারপর?

কিন্তু স্টেশনের বাইরে একটা গাড়ি ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল—সে গাড়িতে চেপে হাওয়া হয়ে গেল।

ওদের অনুসরণ করতে পারলি না?

বিরাট সুপার লাকসারী কার—গাড়িটার নম্বর ছিল দিল্লীর।

হুঁ। তাহলে তারা সোজা দিল্লীতেই এসেছে—কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই কথাটা বললে কিরীটী।

ঐ সময় বেয়ারা রামলাল এসে বললে, সাহেব অফিস থেকে ফোন করছেন।

কাকে?

রায় সাহেবকে ডাকছেন।

কিরীটী উঠে গিয়ে ফোনটা ধরল।

কে, কিরীটী?

হ্যাঁ, কি ব্যাপার?

গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, চলে আয়।

কোথায়?

আয় না।

কিরীটীর মনে হলো দেবেশ যেন কোনমতে কথা ক'টা বলেই ফোনের কানেকশনটা কেটে দিল।

॥ ছয় ॥

ঘরে ফিরে আসতে সুব্রত শুধায়, দেবেশবাবু ফোন করেছিলেন কেন?

বুঝলাম না ঠিক। বললে গাড়ি পাঠাচ্ছে, কোথায় যেন যেতে হবে।

কোথায়?

তা তো কিছু বললো না।

দেবেশবাবু জানেন কেন তুই এখানে এসেছিস?

হ্যাঁ, বলেছি।

কিরীটীর পরনে একটা গরম পায়জামা, পাঞ্জাবি ও গায়ে শাল ছিল; সে তাড়াতাড়ি জামাকাপড় বদলে প্রস্তুত হয়ে নিল।

একটু পরেই গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকছে হেড-লাইট জ্বালিয়ে দেখা গেল। গাড়ির আলোটা জানালার বদ্ধ কাঁচের শার্সির উপর দিয়ে ঘুরে গেল।

ঐ, গাড়ি বোধ হয় এসে গেল। চলি।

একজন নেপালী ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছিল। কালো রঙের ঝকঝকে একটা নিউ মডেলের মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি।

কিরীটী গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দিল। গাড়িটা দেবেশের নয়, একবার মনেও হয়েছিল কথাটা; দেবেশ তার নিজের গাড়ি না পাঠিয়ে অন্য গাড়ি পাঠাল কেন? এ কার গাড়ি?

কিরীটী তখন অপরিচিত বাঁধানো মেটাল পথ ধরে নিঃশব্দ গতিতে এগিয়ে চলেছে।

কিরীটী মনে হয় একবার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে কোথায় সে যাচ্ছে? কিন্তু কি ভেবে কোন প্রশ্নই করল না।

প্রায় মিনিট পনেরো-কুড়ি বাদে কুতুবের কাছাকাছি নতুন যে পল্লী গড়ে উঠেছে, এখানে ওখানে সব নতুন বাড়ি হচ্ছে, সেই পল্লীর মধ্যে একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা দাঁড়াল।

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে দরজাটা খুলে দিল।

কিরীটী গাড়ি থেকে নামল।

নীচের তলায় আলো জ্বলছে।

এই কোঠি?

জী সাব—অন্দর যাইয়ে—

কিরীটী দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার কাছাকাছি যেতেই দরজাটা খুলে গেল। খোলা দরজার সামনে দামী সুট পরিহিত চব্বিশ-পঁচিশ বছরের এক যুবক দাঁড়িয়ে।

যুবক তাকে অভ্যর্থনা জানাল ঃ মিঃ রায়?

হ্যাঁ।

আসুন ভিতরে।

ঘরের মধ্যে পা দিল কিরীটী। আলোকিত কক্ষ—মূল্যবান রুচিসম্মত সোফা কাউচে ঘরটি চমৎকার করে সাজানো।

বোঝা যায় কোন ধনীর গৃহ।

মিঃ দাশ কোথায়?

উপরে চলুন।

কিরীটী যুবককে অনুসরণ করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গিয়ে একটা ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল।

ভিতরে যান মিঃ রায়, মিঃ দাশ ভিতরেই আছেন।

একটু যেন কেমন ইতস্তত করে কিরীটী, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। কেন যেন মনে হয় কিরীটীর, হঠাৎ এভাবে দেবেশের একটা ফোন কল পেয়ে সোজা না এলেই ভাল হতো। কিন্তু চিন্তা করবারও আর তখন সময় নেই। কিরীটী দরজা ঠেলে ভিতরে পা দিল।

আলোকিত ঘরটা।

মাঝারি সাইজের এবং সে ঘরের মধ্যেও সব মূল্যবান আসবাবপত্র। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করে কিরীটী কাউকে দেখতে পেল না।

ঘরটা খালি।

একটু যেন বিস্মিত হয়েই কিরীটী ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে।

আসুন মিঃ রায়—গুড ইভনিং।

ঘরের দক্ষিণ কোণ থেকে একটা ভারী পুরুষ-কণ্ঠ ভেসে এলো। এবং কিরীটীর মনে হলো কণ্ঠস্বরটা যেন তার পরিচিত। কিন্তু বক্তাকে ঘরের মধ্যে কোথাও দেখতে পেল না।

কিরীটী এদিক ওদিক তাকায়।

দক্ষিণ কোণে কেবল একটা ভারী পর্দা ঝুলছে। সেই পর্দা ঠেলেই এবারে যে লোকটি কক্ষের মধ্যে আবির্ভূত হলো তাকে দেখেই কিরীটী চিনতে পারে।

ট্রেনের সেই পরিচিত রঞ্জিৎ কাপুর।

গুড ইভনিং মিঃ রায়—চিনতে পারছেন?

কিরীটী প্রথমটায়—একটু হকচকিয়ে গেলেও ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে পরিস্থিতির সঙ্গে। মৃদু হেসে বললে, পারছি বৈকি!

নিশ্চয়ই, চিনতে পারবেন বৈকি। আপনি গুণী লোক। কিন্তু বসুন—দাঁড়িয়ে কেন?

বসতে হবে না—

সে কি! বসবেন না?

না। যে জন্য এভাবে ধরে নিয়ে এলেন আমাকে সেটা বরং তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।

বলবো বলেই তো ডেকেছি। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো আর কথাবার্তা হতে পারে না। আর সেটা শোভনও হবে না।

ইউ নীড নট ওরি, মিঃ কাপুর। আপনার কি বক্তব্য আছে বলে ফেলুন।

BanglaBook.org

শুনবেন বৈকি এসেছেন যখন—আপনাকে কৌশলে এখানে আমরা নিয়ে এসেছি বলবার জন্যেই তো—যা আমাদের—

কথা বলে কি খুব কিছু একটা লাভ হবে মিঃ কাপুর, আপনাদের নেটওয়ার্কটা যখন আমি জানতে পেরেছি!

জেনে ফেলেছেন?

জেনেছি বৈকি। তাই বলছিলাম আপনার মত একজন কাট আউট অর্থাৎ দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে কি আমার কিছু লাভ হবে। আপনি বরং আপনার বড় কর্তা স্টেশন চীফকে ডাকুন।

স্টেশন চীফকে ডাকবো?

হ্যাঁ, তাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না কি! যদি কিছু ডিল-এ আসতে হয় তা হলে স্বয়ং খোদ কর্তা বা স্টেশন চীফের সঙ্গেই কথাবার্তা বলা ভাল। তার সামান্য একজন এজেন্ট বা ইনফরমারের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ কি? আমারও সময়ের মূল্য আছে।

আপনি আমার সঙ্গেই কথা বলতে পারেন।

রঞ্জিৎ কাপুরের গলার স্বরটা বেশ যেন গম্ভীর শোনাল।

বলতে পারি বলছেন?

হ্যাঁ।

বেশ, তবে বলুন আপনিই, আপনার কি বক্তব্য আছে?

আমার বক্তব্যটা তো আপনার অজানা নয়, মিঃ রায়।

আমাকে ভয় দেখিয়ে যে খুব একটা সুবিধা হবে না আশা করি সেটা অন্তত মিঃ কাপুর বুঝতে পেরেছেন?

রঞ্জিৎ কাপুর স্থিরদৃষ্টিতে কয়েকটা মুহূর্ত চেয়ে রইল কিরীটীর মুখের দিকে, তারপর বললে, বেশ, তাহলে ডিলেই আসা যাক। কত টাকা পেলে আপনি এ রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াবেন?

আপনাদের অফারটা শুনি?

দশ হাজার।

মাত্র!

পনেরো হাজার।

পনেরো হাজার!

বেশ, পঁচিশ হাজার। কেমন, ডিল ক্লোজড্!

তার আগে আমি জানতে চাই, আমার বন্ধু দেবেশ দাশ কোথায়?

যে গাড়িতে আপনি এসেছেন এখানে সেই গাড়িতেই তাঁকে তাঁর বাংলোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতক্ষণে হয়ত তিনি বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছেন।

কেমন করে বিশ্বাস করবো আপনার কথা?

ঘরের কোণে ঐ যে ফোন আছে, ফোন করে দেখুন।

দ্যাট ইজ নট এ ব্যাড আইডিয়া! কিরীটী ফোনটার সামনে দাঁড়াল এবং দেবেশের নাম্বারের ডায়েল করল।

হ্যালো, কে।

দেবেশের বেয়ারা রামলালের গলা।

রামলাল, আমি কিরীটী—সাহেব বাড়িতে পৌঁছেছে?

এইমাত্র এলো একটা গাড়ি, দেখি বোধ হয় সাহেবেরই—

রঞ্জিৎ কাপুর ইতিমধ্যে যে কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে কিরীটী তা বুঝতে পারেনি—সহসা রঞ্জিৎ কাপুর হাত দিয়ে টিপে ফোন কনেকশনটা অফ করে দিল এবং শান্তগলায় বললে, উঁহুঁ, নো মোর মিঃ রায়—বাজে কথা বাড়িতে ফিরে বলবেন। নাউ লেট আস ফিনিশ আওয়ার ডিল! টাকাটা আপনার একশত টাকার নোটে হলে চলবে তো?

টাকা তো আমি এখানে নেবো না মিঃ কাপুর—কিরীটী শান্তগলায় বললে।

এখানে নেবেন না! তবে কোথায়?

বুঝতেই পারছেন অতগুলো নগদ টাকা—

তবে কিভাবে কোথায় পেমেন্টটা করতে হবে বলুন?

কলকাতায়।

কিন্তু তা তো সম্ভব নয়—সহসা ঘরের মধ্যে এক নারী-কণ্ঠস্বর কিরীটীর কানে প্রবেশ করতেই কিরীটী ফিরে তাকাল—

একজন ভদ্রমহিলা।

বয়স চল্লিশের নীচে নয়।

দামী জর্জেটের শাড়ি পরিধানে—চোখে-মুখে উগ্র প্রসাধনের চিহ্ন। হাতে একটা কালো রংয়ের অ্যাট্যাচি কেস।

মিসেস খান্না?

রঞ্জিৎ কাপুরের প্রশ্নে মিসেস খান্না ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কাপুর, ইফ হি ইজ এগ্রিড টু আওয়ার টার্মস্, এই কেসে টাকা আছে, ওঁকে গুনে নিতে বলো—আর কাল ভোরের প্লেনে ওঁর টিকিটও রেডি আছে কাশ্মীরে যাবার—

কাশ্মীর! কথাটা বললে কিরীটীই।

হ্যাঁ, কাশ্মীরে এখন সোজা যাবেন। দশদিন পর সেখান থেকে ফিরবেন। হোটেলে আপনার ঘর ঠিক করা আছে।

নট ব্যাড! কিন্তু এই ঠাণ্ডায় কাশ্মীর—অন্য কোথাও গেলে হতো না ম্যাডাম?

কিরীটীর ঐভাবে হঠাৎ ফোন-কল পেয়ে চলে যাওয়াটা সুব্রতর ঠিক ভাল লাগেনি। কিন্তু কিরীটীকে সেকথা বললে সে শুনবে না তাই তাকে বাধা দেয়নি। কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গে সেও বাইরে এসেছিল।

কিন্তু পোর্টিকোর আলোতে যখন দেখলো অপরিচিত ড্রাইভার ও অপরিচিত গাড়ি, সে কিরীটীকে বাধা দেবে ঠিক করেছিল কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই ড্রাইভার দরজা খুলে দিতে কিরীটী গাড়িতে উঠে বসে, ড্রাইভার গাড়িটা ছেড়ে দেয়।

সুব্রতর মনের মধ্যে একটা সন্দেহ জাগে—কেমন যেন অস্থির হয়ে ওঠে—সে আর

কালবিলম্ব না করে ঘরে ঢুকে সুটকেস থেকে লোডেড পিস্তলটা পকেটে পুরে সোজা গেট দিয়ে বের হয়ে পড়ে।

ভাগ্য ভাল বলতে হবে, বেরুতেই একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে গেল।

সুবতর ট্যাক্সিতে উঠে সামনের দিকে চালাতে বলে ড্রাইভারকে। কিরীটীর গাড়ির নম্বরটা আগেই সে দেখে নিয়েছিল।

কিছুদূর যেতেই অগ্রবর্তী গাড়িটা সুব্রতর নজরে পড়ল।

ড্রাইভারকে সুব্রত অগ্রবর্তী গাড়িটাকে ফলো করতে বললে।

॥ সাত ॥

অগ্রবর্তী গাড়িটা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। হাত পনেরো-কুড়ির ব্যবধানে ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে সুব্রতও ট্যাক্সি থেকে নামল।

ইধার ঠারিয়ে, আভি হাম আতে হে—

সুব্রত ইতিমধ্যে ড্রাইভারকে বলেছিল সে পুলিসের একজন অফিসার।

ড্রাইভার সুব্রতর প্রস্তাবে কোন আপত্তি জানায় না।

দূর থেকেই দেখতে পেল সুব্রত—বাড়ির দরজা খুলে গেল, একজন সুটপরা লোক কিরীটীকে ভিতরে ডেকে নিল, দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল। গাড়িটা পিছনের দিকে চলে গেল।

সুব্রত আবার এগিয়ে যায়। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়—কিন্তু দরজার গায়ে ঠেলা দিয়ে বুঝতে পারে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

যেমন করে হোক সুব্রতকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই হবে কিন্তু কেমন করে ঢুকবে বুঝতে পারে না। বাড়িটার চারপাশে একবার ঘুরে দেখা যাক—অন্য কোন প্রবেশপথ পাওয়া যায় কিনা। সুব্রত বাড়ির পিছনদিকে এগুলো।

বাড়িটা বোধ হয় মাত্র কিছুদিন হলো শেষ হয়েছে। চারিদিকে এখনো রাবিশ, ভাঙা ইঁটের টুকরো, লোহার রড, স্টোন-চিপস ছড়ানো। অন্ধকার রাত, ভাল কিছু দেখাও যায় না।

সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে এগোয় সুব্রত।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

হাত-দশেক দূরে সেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে—খোলা একটা দরজা-পথে বাইরে আলো এসে পড়ছে খানিকটা।

গাড়ির সামনে বোধ হয় ড্রাইভারটা দাঁড়িয়ে। কি এখন করা যায় ভাবছে সুব্রত, এমন সময় হঠাৎ ওর নজরে পড়লো দুজন লোক দু'পাশ থেকে একজন সুট পরিহিত ভদ্রলোককে ধরে গাড়ির সামনে নিয়ে এলো।

লোকটি মনে হয় ঠিক সুস্থ নয়, কেমন যেন টলছে!

পাশেই গ্যারেজ-মত একটা ঘর—সুব্রত এগিয়ে গেল—নিঃশব্দে গ্যারেজের পিছনে।

ড্রাইভার ও অন্য দুজন লোক সেই লোকটিকে গাড়ির মধ্যে তুলতে ব্যস্ত—এই

সুযোগে সুব্রত চকিতে এগিয়ে গিয়ে খোলা দরজা-পথে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। সামনে সরু একটা প্যাসেজ-মত—তারপরই পাশাপাশি দুটো ঘর—দুটো ঘরের দরজাই বন্ধ।

আরো একটু এগিয়ে দোতলায় উঠবার সিঁড়িটা ওর নজরে পড়ল। সিঁড়ির নীচে জমাট অন্ধকার।

কাদের যেন পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

ওরা হয়ত ফিরে এলো। সুব্রত চট করে সিঁড়ির নীচে আত্মগোপন করল।

দুজনের পায়ের শব্দ।

সুব্রত বুঝতে পারে কাজ শেষ করে ওরা ফিরে এলো। ক্রমে পায়ের শব্দ সরু প্যাসেজের অন্য প্রান্তে মিলিয়ে গেল।

শব্দ মিলিয়ে যাবার পরও মিনিট পাঁচ-সাত সুব্রত সিঁড়ির নীচে অন্ধকারের মধ্যে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কোনদিকে কোন আর শব্দ নেই।

সুব্রত সিঁড়ির নীচ থেকে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে উপরে উঠে যায়। শেষ ধাপে সবে পা ফেলেছে—নজরে পড়ল ওর, একটা ঘরের ভেজানো দ্বারপথে ঈষৎ আলোর আভাস।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে সুব্রত এগিয়ে যায়।

কিরীটীর গলা ওর কানে আসে—আপনাদের অফারটাই শুনি।

কে যেন বললে, দশ হাজার—

কিরীটীর জবাব—মাত্র!

সুব্রতর বুঝতে আর বাকী থাকে না, কিরীটী শত্রুর ফাঁদে পা দিয়েছে।

দরজার গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ায় সুব্রত—প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে লোডেড পিস্তলটার ট্রিগারটা চেপে ধরে। ভাগ্যে সে পিস্তলটা সঙ্গে এনেছিল!

কিরীটীর গলার স্বরটা কানে আসে, নট ব্যাড, কিন্তু এই ঠাণ্ডায় কাশ্মীরে, অন্য কোথাও গেলে হতো না ম্যাডাম?

রঞ্জিৎ কাপুরের গলার স্বর, শুনুন মিঃ রায়, আপনার সঙ্গে জোক করবার মত প্রচুর সময় আমাদের হাতে নেই। আমরা আমাদের অফার আপনাকে দিয়েছি—নাউ ইউ ডিসাইড—

দড়াম করে ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলে গেল।

চকিতে সেই শব্দে রঞ্জিৎ কাপুর, সেই ভদ্রমহিলা ও কিরীটী ফিরে তাকাল দরজার দিকে।

দরজার উপরে দাঁড়িয়ে সুব্রত—হাতে ধরা তার পিস্তল।

ডোন্ট ট্রাই টু মুভ মিঃ কাপুর—এটার ছ'টা চেম্বারই ভর্তি!

ঘটনার আকস্মিকতায় সেই মহিলা ও রঞ্জিৎ কাপুর দুজনাই বিমূঢ় বিহ্বল—বোবা যেন।

কিরীটী ওদের বডি সার্চ করে দেখ, কোন আগ্নেয়াস্ত্র আছে কিনা।

রঞ্জিৎ কাপুরের পকেটে পিস্তল পাওয়া গেল।

আগে সুব্রত বের হয়ে এলো, পশ্চাতে কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে চকিতে ঘরের দরজা বাইরে থেকে টেনে লক করে দেয়—ইয়েল লক সিস্টেম, চাবিটা পকেটে ফেলে দেয় দরজা থেকে খুলে।

তারপর দুজনে ছুটে নীচে এসে ট্যাক্সিতে চেপে বসতে পাঁচ মিনিটও লাগালো না।

রায়সিনহা রোডে যখন ওরা ফিরে এলো রাত তখন পৌনে এগারোটা।

দেবেশকে বাইরের ঘরেই পাওয়া গেল।

একটা সোফার উপরে সে শুয়ে—পাশে একজন ডাক্তার। রামলালও সেখানে উপস্থিত।

আপনারা? ডাক্তার প্রশ্ন করেন।

রামলাল বলে, সাহেবের দোস্ত—

আই সী!

কি ব্যাপার, ডাক্তার?

মিঃ দাশকে কোন ঔষধ খাওয়ানো হয়েছিল বা ইনজেক্ট করা হয়েছিল—রামলালের টেলিফোন পেয়ে যখন এলাম দেখি হি ওয়াজ ইন এ সেমিকনসাস স্টেজ। পাল্‌স খুব ফিবল।

এখন কেমন আছেন?

এখন অনেকটা ভাল—আপাতত এখানেই থাকুন, আরো কিছুক্ষণ পরে নিয়ে গিয়ে বেডরুমে শুইয়ে দেবেন। আর এক কাপ গরম দুধ দেবেন।

পরের দিন দেবেশের মুখ থেকেই ওরা সব শুনলো।

অফিস থেকে সোয়া পাঁচটা নাগাদ সে বেরুতে যাবে, এমন সময় মিনিস্টারের জরুরী ফোন আসে তার বাড়ি থেকে।

তারপর?

বাইরে থেকে দেখি আমার গাড়িটা নেই। কি করি, জরুরী কল, তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ঐ দিকে আসতে দেখি, আসতে দেখে তাতেই উঠে বসি।

অ্যান্ড ইউ অয়ার ইন দি ট্র্যাপ দেবেশ, কিরীটী বললে।

একজাক্টলি! ট্যাক্সিতে উঠতেই একজন অ্যাট দি পয়েন্ট অফ এ গান আমাকে চুপচাপ থাকতে বলে। এবং আমাকে নিয়ে একটা বাড়িতে গিয়ে তোলে। সেখানে আবার দুজন লোক ছিল, তারা অ্যাট দি পয়েন্ট অফ এ গান আমাকে দিয়ে তোকে ফোন করায়। কিন্তু তুই গেলে যে সেখানে বিপদে পড়বি, কথাটা বলতে পারলাম না—বুঝতেই পারছিস আমার তখন কি অবস্থা! তুই গিয়েছিলি নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ। ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথাবার্তাও হয়েছে।

ভদ্রমহিলা!

হ্যাঁ, ম্যাডাম—

তারপর?

pathagar.net

তারপর আর কি মোটা টাকার অফার—

বলিস কি?

ডকুমেন্টটা যে রীতিমত মূল্যবান ছিল, সেটা ভুলে যাস কেন? পঁচিশ পর্যন্ত উঠেছিল, হয়ত পঞ্চাশেও রাজী হতো—তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি।

কি?

ডকুমেন্টটার ব্লুপ্রিন্টটা এখনো পাচার করতে পারেনি ওরা ভারতবর্ষ থেকে!

কি করে বুঝলি?

নচেৎ অত টাকা কি অফার করে, না আমাকেই ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতো?

কিরীটী?

কি?

আমার একটা কথা শুনবি?

কি কথা!

এ কেসটা ছেড়ে দে।

পাগল নাকি!

ওসব গ্যাঙ বড় সাংঘাতিক।

হতে পারে, তবে ওরাও জানে কিরীটীকে। ভয় নেই বন্ধু, চল্ আজ একবার তোর গাড়ি নিয়ে গতরাত্রের পাড়াটা ঘুরে আসি।

॥ আট ॥

দুপুরে কিরীটী, সুব্রত ও দেবেশ বের হলো গাড়ি নিয়ে—কিন্তু সেই পাড়ায় গিয়ে গতরাত্রের বাড়িটা ওরা কিছুতেই স্পট-আউট করতে পারল না। অনেক বাড়ি হচ্ছে, অনেকগুলো তৈরীও হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সবই প্রায় এক প্যাটার্নের যেন।

অনেকক্ষণ ধরে ঐ তল্লাটে গাড়িতে ঘুরে ঘুরে আবার ওরা ফিরে এলো।

সন্ধ্যায় মন্ত্রীর গৃহে ককটেল-পার্টি।

দুপুরে একবার কিরীটী বের হয়েছিল রামস্বামীর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর অফিস চেম্বারে বসেই অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হলো।

মন্ত্রীর ওখান থেকে ফিরতে কিরীটীর বিকেল প্রায় সাড়ে তিনটে হয়ে গেল। দেবেশ ঐদিন অফিস যায়নি।

ক্রমে দিনের আলো নিভে এলো। ছোট শীতের বেলা ফুরিয়ে এলো।

মন্ত্রী মশাই বলেছিলেন, তিনি তাঁর গাড়ি পাঠাবেন কিন্তু কিরীটী বলেছিল তার কোন প্রয়োজন নেই।

কটায় আসছেন মিঃ রায়?

ঠিক সময়েই যাবো।

রাত ন'টা নাগাদ কিরীটী আর সুব্রত বের হলো বেশভূষা করে।

দুজনারই মুখে চাপদাড়ি, মাথায় পাগড়ি, পরনে দামী সুট।

গুলজার সিং—হরবন্স সিং।

দেবেশের গাড়িতে করে বের হয়ে গেল। কনট প্লেসে এসে ওরা গাড়ি ছেড়ে দিল। ড্রাইভারকে বলে দিল, রাত দশটার পর যেন সে গাড়ি নিয়ে রামস্বামীর গৃহের সামনে গিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করে!

ওখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিল ওরা।

মন্ত্রী মশাইয়ের গৃহের সামনে যখন ওরা এসে পৌঁছাল রাত তখন প্রায় সাড়ে ন'টা।

বাংলোর সামনে প্রচুর গাড়ি দাঁড়িয়ে।

দোতলার হলঘরে পার্টির ব্যবস্থা হয়েছিল।

ওরা যখন ঘরে গিয়ে ঢুকল, মদের তখন যেন ফোয়ারা বয়ে চলেছে। প্রায় জনাত্রিশেক নানা বয়েসী পুরুষ ও নারী।

সব দেশের ডিপ্লোম্যাটরাই সেখানে ভিড় করেছে। ইউ. কে., আমেরিকা, ফরাসী, জার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া, কানাডা, জাপান সব ফরেন অফিসের ডিপ্লোম্যাটরা এসেছে এবং সস্ত্রীক।

গুনগুন একটা গুঞ্জন চলেছে ঘরের মধ্যে।

সিগারেটের ধোঁয়ায় যেন একটা কুয়াশা জমেছে।

পূর্ব-পরিকল্পনা মত কিরীটী ও সুব্রত হলঘরের মধ্যে ঢুকে দুজনে দুদিকে ছড়িয়ে যায়।

রামস্বামীর দৃষ্টি সজাগ ছিল।

কিরীটীকে দেখতে পেয়ে রামস্বামী এগিয়ে এলেন, গুড ইভনিং মিঃ সিং!

গুড ইভনিং।

একজন বেয়ারা ট্রেতে করে হুইস্কি নিয়ে এলো।

কিরীটী একটা গ্লাস তুলে নিল!

আমার দিকে আপনি নজর দেবেন না মিঃ রামস্বামী—ইউ লুক আফটার ইয়োর গেস্ট!

রামস্বামী সরে গেলেন।

কিরীটী চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। এবং সে চমকে উঠলো ভিড়ের মধ্যে শকুন্তলা অর্থাৎ মীনাক্ষীকে দেখে। শকুন্তলার পরিধানে আজ দামী সিফন, চোখে-মুখে উগ্র প্রসাধনের প্রলেপ।

সারা দেহে যৌবন যেন উপচে পড়ছে। রঞ্জিৎ কাপুরকে কিন্তু তাদের মধ্যে কোথাও দেখতে পেল না কিরীটী।

কিরীটী শকুন্তলার উপরে দৃষ্টি রাখে।

এক হাতে মদের গ্লাস, অন্য হাতে সিগারেট। বেশ স্বচ্ছন্দেই যেন ধূমপান করছে শকুন্তলা।

হঠাৎ শকুন্তলার পাশে এসে দাঁড়াল রামস্বামীর সেক্রেটারী মিঃ সিং।

দুজনে কথা বলতে বলতে ঘরের এক কোণে এগুতে থাকে।

কিরীটী ওদের কাছাকাছি থাকবার চেষ্টা করে।

pathagar.net

হঠাৎ কিরীটীর কানে এলো মিঃ সিং বলছেন শকুন্তলাকে, মিস খাতুন, কালই তাহলে আপনি চললেন হংকং?

ও ইয়েস!

মিস খাতুন!

মিস খাতুন! তাহলে ভদ্রমহিলা হিন্দু নন—মুসলিম!

কিরীটী কান খাড়া করে রাখে।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ হলে এসে ঢুকলো রঞ্জিৎ কাপুর ও গতরাত্রের সেই মহিলা অর্থাৎ ম্যাডাম।

রামস্বামীর সেক্রেটারী মিঃ সিং ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানায়।

ভদ্রমহিলার এক হাতে একটা বড় ঘড়ি।

ঘড়িটা যেন সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

একটু পরে কিরীটী দেখে সেই মহিলা ও শকুন্তলা ভিড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে পরস্পরের সঙ্গে ফিসফিস করে কি যেন কথা বলছে।

পার্টি ভাঙলো প্রায় রাত দুটো নাগাদ।

একে একে গেস্টরা বিদায় নিতে থাকে।

কিরীটী একসময় রামস্বামীর সামনে এসে ফিসফিস করে বললে, একবার পাশের ঘরে চলুন মিঃ রামস্বামী, কয়েকটা কথা আছে।

রামস্বামী কিরীটীকে নিয়ে তাঁর বেডরুমে গিয়ে ঢুকলেন।

কি কথা বলুন তো?

মিস খাতুনকে আপনি চেনেন?

ঐ মীনাক্ষী খাতুন! হ্যাঁ চিনি। কেন বলুন তো?

কতদিন থেকে ওঁকে চেনেন?

তা বছর দুই হবে।

কোথায় থাকেন উনি—কি করেন?

কি করেন ঠিক জানি না, তবে সব এমব্যাসিতেই ওঁর যাতায়াত আছে।

উনি কাল হংকং যাচ্ছেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আপনাকে একটা সংবাদ নিতে হবে। কাল সকালে যেসব ইন্টারন্যাশানাল প্লেন ছাড়ছে তার মধ্যে কোন্-কোন্‌টা হংকং টাচ করবে!

ঠিক আছে।

যদি পারেন তো আজ রাত্রে সংবাদটা আমাকে জানাবেন!

জানাবো।

ভোর চারটে নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠলো।

কিরীটী জেগেই ছিল। উঠে গিয়ে ফোনটা ধরলো।

রামস্বামী স্পিকিং। মিঃ রায়!

হ্যাঁ আমিই—বলুন।

একটা থাই প্লেন কাল সকাল সাড়ে নটায় ছাড়ছে, সেট হংকং টাচ করবে।

আর কোন প্লেন?

না।

ঠিক আছে। আপনার ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিসারকে বলবেন, তিনি যেন প্রস্তুত হয়ে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ পালাম এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকেন।

চতুর্বেদীকে তো আপনি চেনেন।

হ্যাঁ।

তাঁকেই বলবো থাকতে।

॥ নয় ॥

পালাম এয়ারপোর্ট।

বেলা আটটার আগেই কিরীটী এসে এয়ারপোর্টে উপস্থিত হলো সুব্রতকে নিয়ে। তার বেশভূষা আজ সম্পূর্ণ অন্যরকম।

মরক্কো দেশীয় এক সুলতানের মত। চোগা চাপকান, মাথায় হ্যাট, তার উপরে কালো মোটা কর্ড প্যাঁচানো—চোখে কালো চশমা।

চতুর্বেদীকে দেখা গেল সে ইন্টারন্যাশানাল কাউন্টারের কাছেই রয়েছে।

আটটা পঁচিশ।

দেখা গেল শকুন্তলাকে এয়ারপোর্টে এসে একটা দামী গাড়ি থেকে নামতে। তার হাতে একটা হ্যান্ডব্যাগ।

টিকিট চেকিংয়ের পর শকুন্তলাকে দেখা গেল ঘন ঘন এদিক ওদিক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। হয়তো কারো জন্য অপেক্ষা করছে শকুন্তলা।

কিরীটী দূর থেকে লক্ষ্য রাখে।

নটা বাজতে মিনিট দশেক আগে একটি বিশিষ্ট এমব্যাসীর গাড়ি এসে দাঁড়াল এয়ারপোর্টের সামনে। সেই গাড়ি থেকে নামল একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। পরনে দামী সুট।

ভদ্রলোক লাউঞ্জে এসে ঢুকতেই শকুন্তলা এগিয়ে গেল তার কাছে।

চতুর্বেদীর সঙ্গে কিরীটীর চোখে চোখে কথা হয়ে যায়। চতুর্বেদী প্লেন ড্রেসেই ছিল। ওদের কাছাকাছি এগিয়ে যায়।

মিঃ আলাম, আমার ঘড়িটা এনেছেন?

হ্যাঁ, এই যে—

মিঃ আলাম পকেট থেকে একটা হাতঘড়ি বের করে দিল শকুন্তলাকে।

থ্যাংকস।

তাহলে আমি চলি!

pathagar.net

আসুন।

আলাম দু'পা এগিয়েছে, চতুর্বেদী এসে শকুন্তলার সামনে দাঁড়াল—কিরীটীও এগিয়ে আসে।

গুড মর্নিং মিস খাতুন।

কে?

চমকে ফিরে তাকায় শকুন্তলা।

আমি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের লোক। আপনাকে একবার আমার সঙ্গে আমাদের হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে।

বাট হাউ দ্যাট ইজ পসিবল অফিসার, আমার প্লেন এখুনি ছাড়বে!

সে তো আমি জানি না—আমার ওপর যা অর্ডার আছে—

বাট হোয়াই? কেন?

এবারে কিরীটী এগিয়ে এলো, চোখের কালো চশমাটা খুলে ফেলল, চিনতে পারছেন আমাকে মিস মীনাক্ষী খাতুন?

কে আপনি?

সে কি! এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন—সারারাত ট্রেনে একসঙ্গে মাত্র দুদিন আগে এলাম—

মিঃ রায়!

হ্যাঁ, কিরীটী রায়। বুঝতেই পারছেন আপত্তি জানিয়ে লাভ হবে না—অফিসারের সঙ্গে ওদের হেডকোয়ার্টারে চলুন—ইফ ইউ ডোন্ট লাইক টু ক্রিয়েট এ সিন হিয়ার, অ্যাট দিস এয়ারপোর্ট! ইয়োর গেম ইজ আপ!

কি বলছেন যা-তা পাগলের মত?

চলুন হেডকোয়ার্টারে, সেখানেই সব জানতে পারবেন—চলুন—

শকুন্তলা আর আপত্তি জানায় না।

মাইকে তখন অ্যানাউন্স শুরু হয়েছে—প্যাসেঞ্জার প্রসিডিং টুওয়ার্ডস হংকং ম্যানিলা আর রিকোয়েস্টেড—

ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের হেডকোয়ার্টারে মীনাক্ষী খাতুনকে নিয়ে ওরা এলো।

মীনাক্ষী বলে, নাউ টেল—অফিসার, এসবের মানে কি—আমাকে ধরে নিয়ে এলেন কেন এয়ারপোর্ট থেকে?

কথা বললে কিরীটীই, মিস খাতুন, এবারে ডকুমেন্টটা বের করে দিন—

ডকুমেন্ট! কিসের ডকুমেন্ট? কি বলছেন পাগলের মত?

পাগল যে আমি নই, আপনি তা ভাল করেই জানেন। এখন বের করুন সেই ডকুমেন্ট—যেটা ভায়া হংকং একটি পররাষ্ট্রে পাচার করছিলেন—প্রতিরক্ষা দপ্তরের একটা জরুরী ডকুমেন্টের ব্লু-প্রিন্ট।

আমি একটা ইমপরটেন্ট ডকুমেন্টের ব্লু-প্রিন্ট নিয়ে যাচ্ছিলাম পাচার করতে, কে বললে আপনাকে?

অস্বীকার করার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না মিস খাতুন।

pathagar.net

বেশ তো, আমার হ্যান্ড-ব্যাগ সার্চ করে দেখুন। তারপর তির্যক দৃষ্টিতে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বললে মীনাক্ষী, চান তো আমার বডিও সার্চ করতে পারেন।

চতুর্বেদী বললেন, একজন মহিলাকে ডাকবো স্যার? ঊর্ধ্বতন অফিসার কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

কিরীটী মৃদু শান্ত গলায় বললে, তার আর প্রয়োজন হবে না, মিস খাতুন, আপনার হাতঘড়িটা খুলে দিন।

হাতঘড়িটা! হেসে ফেললে মীনাক্ষী খাতুন, তাহলে এতক্ষণে আপনার ধারণা হলো মিঃ রায়, আপনাদের বহু মূল্যবান ব্লু-প্রিন্টটা আমার হাতঘড়ির মধ্যেই আছে।

ঘড়িটা খুলে দিন—

এবারে কিন্তু মিস খাতুনের মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

কি হলো, দিন।

দিচ্ছি—বলতে বলতে মিস খাতুন তাঁর হ্যান্ডব্যাগটা খুলে কি একটা বের করে চট করে মুখে পুরে দিলো।

এবং ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলে কিছু বুঝবার আগেই মীনাক্ষী খাতুনের দেহটা সশব্দে মেঝেতে পড়ে গেল।

কি হলো?

কিরীটী তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে মীনাক্ষীর পাল্‌স দেখে, তারপর মাথা নেড়ে বলে, শি ইজ ডেড!

ডেড?

বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করেন চতুর্বেদী।

কিরীটী সে কথায় যেন কোন কান দিল না। মৃত মীনাক্ষীর হাত থেকে দামী রিস্টওয়াচটা খুলে নিল।

রিস্টওয়াচটা দেখতে দেখতে বললে, কারো কাছে একটা ছুরি হবে?

চতুর্বেদী একটা ছুরি এনে দিলেন।

সেই ছুরির সাহায্যেই ঘড়ির পিছনের ডালাটা খুলে ফেলতেই একটা মাইক্রো ফিল্ম রোল বের হলো।

হিয়ার ইউ আর মিঃ চতুর্বেদী—এই ফিল্মের মধ্যেই ব্লু-প্রিন্টের ফটো আছে।

কিরীটী বলতে বলতে ফিল্মটা চতুর্বেদীর হাতে তুলে দিল।

ম্যাগনিফাইং প্রজেক্টারের সাহায্যে বোঝা গেল কিরীটীর অনুমান ভুল নয়—ফিল্মের মধ্যেই ব্লু-প্রিন্ট রয়েছে।

ঐদিনই দুপুরের দিকে মন্ত্রীমশাইয়ের ঘরে।

রামস্বামী জিজ্ঞাসা করেন, ধরলেন কি করে মিঃ রায়?

আপনাদের দলিলটা আবার যথাস্থানে ফিরে আসতেই বুঝেছিলাম, দলিলটার একটা ব্লু-প্রিন্ট ওরা সংগ্রহ করে নিয়েছে—এবং সেটাই পাচার করবে।

তারপর?

BanglaBook.org

আসুন।

আলাম দু'পা এগিয়েছে, চতুর্বেদী এসে শকুন্তলার সামনে দাঁড়াল—কিরীটীও এগিয়ে আসে।

গুড মর্নিং মিস খাতুন।

কে?

চমকে ফিরে তাকায় শকুন্তলা।

আমি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের লোক। আপনাকে একবার আমার সঙ্গে আমাদের হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে।

বাট হাউ দ্যাট ইজ পসিবল অফিসার, আমার প্লেন এখুনি ছাড়বে!

সে তো আমি জানি না—আমার ওপর যা অর্ডার আছে—

বাট হোয়াই? কেন?

এবারে কিরীটী এগিয়ে এলো, চোখের কালো চশমাটা খুলে ফেলল, চিনতে পারছেন আমাকে মিস মীনাক্ষী খাতুন?

কে আপনি?

সে কি! এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন—সারারাত ট্রেনে একসঙ্গে মাত্র দুদিন আগে এলাম—

মিঃ রায়!

হ্যাঁ, কিরীটী রায়। বুঝতেই পারছেন আপত্তি জানিয়ে লাভ হবে না—অফিসারের সঙ্গে ওদের হেডকোয়ার্টারে চলুন—ইফ ইউ ডোন্ট লাইক টু ক্রিয়েট এ সিন হিয়ার, অ্যাট দিস এয়ারপোর্ট! ইয়োর গেম ইজ আপ!

কি বলছেন যা-তা পাগলের মত?

চলুন হেডকোয়ার্টারে, সেখানেই সব জানতে পারবেন—চলুন—

শকুন্তলা আর আপত্তি জানায় না।

মাইকে তখন অ্যানাউন্স শুরু হয়েছে—প্যাসেঞ্জার প্রসিডিং টুওয়ার্ডস হংকং ম্যানিলা আর রিকোয়েস্টেড—

ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের হেডকোয়ার্টারে মীনাক্ষী খাতুনকে নিয়ে ওরা এলো।

মীনাক্ষী বলে, নাউ টেল—অফিসার, এসবের মানে কি—আমাকে ধরে নিয়ে এলেন কেন এয়ারপোর্ট থেকে?

কথা বললে কিরীটীই, মিস খাতুন, এবারে ডকুমেন্টটা বের করে দিন—

ডকুমেন্ট! কিসের ডকুমেন্ট? কি বলছেন পাগলের মত?

পাগল যে আমি নই, আপনি তা ভাল করেই জানেন। এখন বের করুন সেই ডকুমেন্ট—যেটা ভায়া হংকং একটি পররাষ্ট্রে পাচার করছিলেন—প্রতিরক্ষা দপ্তরের একটা জরুরী ডকুমেন্টের ব্লু-প্রিন্ট।

আমি একটা ইমপরটেন্ট ডকুমেন্টের ব্লু-প্রিন্ট নিয়ে যাচ্ছিলাম পাচার করতে, কে বললে আপনাকে?

অস্বীকার করার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না মিস খাতুন।

pathagar.net

বেশ তো, আমার হ্যান্ড-ব্যাগ সার্চ করে দেখুন। তারপর তির্যক দৃষ্টিতে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বললে মীনাক্ষী, চান তো আমার বডিও সার্চ করতে পারেন।

চতুর্বেদী বললেন, একজন মহিলাকে ডাকবো স্যার? ঊর্ধ্বতন অফিসার কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

কিরীটী মৃদু শান্ত গলায় বললে, তার আর প্রয়োজন হবে না, মিস খাতুন, আপনার হাতঘড়িটা খুলে দিন।

হাতঘড়িটা! হেসে ফেললে মীনাক্ষী খাতুন, তাহলে এতক্ষণে আপনার ধারণা হলো মিঃ রায়, আপনাদের বহু মূল্যবান ব্লু-প্রিন্টটা আমার হাতঘড়ির মধ্যেই আছে।

ঘড়িটা খুলে দিন—

এবারে কিন্তু মিস খাতুনের মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

কি হলো, দিন।

দিচ্ছি—বলতে বলতে মিস খাতুন তাঁর হ্যান্ডব্যাগটা খুলে কি একটা বের করে চট করে মুখে পুরে দিলো।

এবং ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলে কিছু বুঝবার আগেই মীনাক্ষী খাতুনের দেহটা সশব্দে মেঝেতে পড়ে গেল।

কি হলো?

কিরীটী তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে মীনাক্ষীর পাল্‌স দেখে, তারপর মাথা নেড়ে বলে, শি ইজ ডেড!

ডেড?

বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করেন চতুর্বেদী।

কিরীটী সে কথায় যেন কোন কান দিল না। মৃত মীনাক্ষীর হাত থেকে দামী রিস্টওয়াচটা খুলে নিল।

রিস্টওয়াচটা দেখতে দেখতে বললে, কারো কাছে একটা ছুরি হবে?

চতুর্বেদী একটা ছুরি এনে দিলেন।

সেই ছুরির সাহায্যেই ঘড়ির পিছনের ডালাটা খুলে ফেলতেই একটা মাইক্রো ফিল্ম রোল বের হলো।

হিয়ার ইউ আর মিঃ চতুর্বেদী—এই ফিল্মের মধ্যেই ব্লু-প্রিন্টের ফটো আছে।

কিরীটী বলতে বলতে ফিল্মটা চতুর্বেদীর হাতে তুলে দিল।

ম্যাগনিফাইং প্রজেক্টারের সাহায্যে বোঝা গেল কিরীটীর অনুমান ভুল নয়—ফিল্মের মধ্যেই ব্লু-প্রিন্ট রয়েছে।

ঐদিনই দুপুরের দিকে মন্ত্রীমশাইয়ের ঘরে।

রামস্বামী জিজ্ঞাসা করেন, ধরলেন কি করে মিঃ রায়?

আপনাদের দলিলটা আবার যথাস্থানে ফিরে আসতেই বুঝেছিলাম, দলিলটার একটা ব্লু-প্রিন্ট ওরা সংগ্রহ করে নিয়েছে—এবং সেটাই পাচার করবে।

তারপর?

pathagar.net

তারপর আমাকে যখন ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে টাকার অফার দিল, বুঝতে পারলাম ব্লু-প্রিন্টটা এখনো পাচার করতে পারেনি—এ দেশেই আছে!

কিন্তু একটা মাইক্রো ফিল্মের মধ্যে—

ভেবে দেখুন সেটাই সবচাইতে সেফ—তাই সেটার সম্ভাবনার কথাই সর্বাগ্রে আমার মনে হয়েছিল।

উঃ, আপনি আমার যে কি উপকার করলেন মিঃ রায়।

আমি তো বেশী কিছু করিনি মিঃ রামস্বামী। একজন নাগরিক হিসাবে আমার জন্মভূমির প্রতি কর্তব্যটুকুই করেছি মাত্র—তবে একটা কথা—

কি?

ওরা যে একটা মাইক্রো ফিল্মই তৈরী করেছিল তা নাও হতে পারে—সেফটির জন্য হয়ত আরো কপি করেছিল—কটা দিন স্পেশাল ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে একটু সাবধানে থাকতে বলবেন—চারিদিকে নজর রাখতে বলবেন। আচ্ছা আজ আমি তাহলে উঠি।

প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন না?

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার তাঁকে জানাবেন—আজই সন্ধ্যার প্লেনে আমাকে ফিরে যেতে হবে কলকাতা।

আজই যাবেন?

হ্যাঁ।

টিকিট পেয়েছেন?

পাওয়া গিয়েছে বোধ হয়। আচ্ছা উঠি, নমস্কার।

কিরীটী রামস্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

BanglaBook.org

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কি রী টী অম্‌নিবাস